প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ ১৩৫২
এপ্রিল ১৯৪৫

[illegible] PUBLIC LIBRARY
SL/R.R R/A.F [illegible]
MR. NO [illegible] F (GEN)

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ :
বিপুল গুহ

মুদ্রাকর :
আর. বি. মণ্ডল
ডি. বি. প্রিন্টার্স
৪ কৈলাস মুখার্জি লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

পঁয়ত্রিশ টাকা
Rupees Thirty five only

শ্রীবিমল মিত্র

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

শান্তিপর্ব
যুদ্ধযাত্রা
ইস্পাতের ফলা
দুই দিগন্ত
জন্মভূমি
আলোছায়াময়
দায়দায়িত্ব
হৃদয়ের ঘ্রাণ
আক্রমণ
অন্ধকারে ফুলের গন্ধ
মানুষের জন্য
আকাশের নীচে মানুষ
দায়বন্ধ
শ্রেষ্ঠ গল্প
স্বনির্বাচিত গল্প
চতুর্দিক
রামচরিত্র
ধর্মান্তর
মাটি আর নেই

মোহানার দিকে
বাঘবন্দী
স্বর্গের ছবি
আমাকে দেখুন (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্ব)
একাকী অরণ্যে
শীর্ষবিন্দু
সুখের পাখি অনেক দূরে
চরিত্র
আমার নাম বকুল
নয়না
নিজের সঙ্গে দেখা
আলোয় ফেরা
পূর্ব পার্বতী
সাধ আহ্লাদ
মহাযুদ্ধের ঘোড়া (১ম ও ২য় পর্ব)
সিন্ধুপারের পাখি
নোনাজল মিঠে মাটি
রৌদ্রঝলক
সত্যমিথ্যা

তিন মূর্তির কীর্তি
সেনাপতি নিরুদ্দেশ
পাগল মামার চার ছেলে

আমার অল্প বয়সের রচনা 'নাগমতী'। দীর্ঘকাল পর উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে মনে হল কিছু কিছু সংস্কার প্রয়োজন। পরিবর্তনের পর বইটি নতুন রূপে যখন প্রকাশের মুখে, তখন মনে হল এর একটি নতুন নাম দেওয়া যেতে পারে। 'নাগমতী' তাই 'শঙ্খিনী' হয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

প্রফুল্ল রায়

একদিকে চন্দন রঙের পদ্মা, আর একদিকে কালীয়নাগের মত মেঘনা। চন্দনা পদ্মা মেঘমতী মেঘনার জলে একটা উচ্ছল গানের কলির মতই ভেঙে পড়ে। মাতলা ঢেউয়ে ঢেউয়ে টলমল করে ডিঙি-ডোঙা, শালতি-মাল্লাই, হাজারমণি মহাজনী নৌকা। ব্যাপারীদের ভাউলে আসে উত্তর দিগন্ত থেকে। খেকরি আখ, রসগুড়, সবরী আম—এমনি নানান জিনিসের চালান নিয়ে। যাযাবর পাখির মত পালের পাখনা মেলে অদৃশ্য হয়ে যায় কেরায়া নৌকার মিছিল, 'গয়নার নাও'-এর সারি।

এই পদ্মা, তারপর দূরের ঐ মেঘনা। তাদের গর্ভকোষ চিরে কচ্ছপের পিঠের মত উঁকি দিয়েছে নতুন চর। অনেক, অজস্র। চরসোহাগী, চরবেহুলা, চরলখিন্দর। পদ্মা-মেঘনার এই সব চরে প্রাণের উৎসব হবে। উদ্বোধন হবে জীবনের। নদীগর্ভের এই সব নির্জন ভূখণ্ডে মানুষের পদপাত হবে। আসবে পাখপাখালি। সরের মত নরম পলি চিরে চিরে ফুটে উঠবে হেউলির ঝোপ, হিজল বন। ফুটবে আটকিরার জঙ্গল। জেগে উঠবে অজানা গাছ-গাছালি। মানুষের কলরবে, বনজ ফুলের সৌরভে, মরসুমী পাখির কাকলিতে আর বাতাসের সোঁ সোঁ বাজনায়, নদীর সোহাগে সোহাগে এই সব নিরালা পৃথিবী মুখর হয়ে উঠবে। নতুন উপনিবেশ রচিত হবে। রচিত হবে নতুন নতুন জনপদ। তাই বিন্দু বিন্দু পলি দিয়ে, নিজেদের চূর্ণ চূর্ণ অস্থিমজ্জা দান করে জীবনের সীমানাকে প্রসারিত করে চলেছে পদ্মা আর মেঘনা।

পদ্মা আর মেঘনা।

পারে পারে কৃষাণ জনপদ। চক্ররেখা পর্যন্ত মেঘরঙা ধানবন। উদ্দাম পাটের অরণ্য। তারই ফাঁকে ফাঁকে উন্মনা ভুঁইচাঁপার মত ফুটে রয়েছে ছোট ছোট গ্রাম। ময়ূরকণ্ঠী টিনের চালে চালে সুখী আর সহজ মানুষের সৌখিন শিল্পবোধ।

নদীর পারে পারে এই গৃহপালিত জীবন, পরিশ্রমী মানুষের এই নীড়-প্রেম, আদিগন্ত ক্ষেতে ক্ষেতে সোনালী ফসলের মঞ্জরীতে কৃষাণের কামনা আর বাসনার প্রতিচ্ছায়া, জীবনের এই স্বচ্ছন্দ প্রকাশ—একদিন এদের অস্তিত্ব ছিল না। স্নিগ্ধ পলিতে আজ যেখানে নধর দূর্বার গালিচা বিছিয়ে রয়েছে, ধানবনের আবডালে, কী খালের ঘাটে, নয়ত হিজলের ছায়াতালে আজ যেখানে যৌবনের যৌবন সৌরভে মন্থর হয়ে উঠেছে, বহু বর্ষ আগে, আমাদের স্মৃতির নেপথ্যে সেই অজানা, সেই দুর্নিরীক্ষ্য কালে সেখানে কি ছিল, তা আমরা জানি না। শুধু সহজ বোধটুকু বলে দেয়, সেদিন এই সব কৃষাণী জনপদে জনপদে পঁচিশের বন্দের ঘরের মায়া রচিত হয় নি। সেদিন ফসলক্ষেতের ফাঁকে ফাঁকে গৃহী মানুষের জীবন এমন নিরঙ্কুশ ছিল না। সেদিন মাথার ওপর ছিল শুধু

নীল আকাশের সামিয়ানা, পায়ের নীচে সমাপ্তিহীন পথরেখা, চোখের সামনে উত্তরঙ্গ নদী, নিবিড় অরণ্য। সেদিন অবিরাম পথচলায় এতটুকু বিশ্রামের আশ্বাস ছিল না, ছিল না কোন ছায়াতরুর নীচে জিরিয়ে নেবার চকিত অবসর। জলবাঙলার সেই অনিশ্চিত জীবনে যে প্রাক্‌পুরুষেরা হিংস্র প্রকৃতির ওপর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিল, এ কাহিনী তাদেরই উত্তর-কালের ইতিহাস।

পদ্মা আর মেঘনা। ইলসা আর কালাবদর। ধলেশ্বরী আর কর্ণফুলী।

যেন কত সোহাগের কুটুম। বেহুলা-লখিন্দরের জলবাসর। ভেলার পালঙ্কে বসে শুভদৃষ্টি হয়েছিল মনসাকথার নায়ক-নায়িকার। বেহুলা-লখাই আজ নেই, গরিমায় অনন্য হয়ে উঠেছে পুঁথির পাতায়। মহিমা পেয়েছে দেবতার। একমাল্লাই নৌকার পাটাতনে বসে সম্মুখে টেমি জ্বেলে মনসামঙ্গল শোনে মাল্লামাঝি। পরের ভাগচাষী, বর্গাদার আর পথচলতি হাটুরে মানুষ এসে আসর জমায় ছোট নৌকায়। পাঠ শেষ হলে ভক্তিমন্ত হয়ে প্রণাম জানায় দেবী বিষহরিকে। নদীর জলে বেহুলার ক' বিন্দু অশ্রু মিশে রয়েছে, তার খতিয়ান কথা আছে এই সব চাষীকৃষাণ আর জেলেমাঝির জীবনের ভাষায়।

পদ্মা-মেঘনা-ইলসা-কালাবদর—

তরঙ্গিত নদীর দিগন্তে দিগন্তে ছলছলিয়ে এগিয়ে যায় বেবাজিয়াদের বহর। জলবাঙলার দিকে দিকে ভাসমান নৌকায় ঘুরে ঘুরে একালের লখিন্দরদের পাহারা দিয়ে চলে এই বেবাজিয়া মানুষগুলি।

এই বেবাজিয়ারা—বিশ শতকের গৃহি পৃথিবীও যাদের নীড়ের আশীর্বাদ দেয় নি, যারা সেই অজানা পূর্বপুরুষের যাযাবর জীবনকে নিজেদের আশায়-ভাষায়, গ্লানি-বেদনায় এখনও নিবিড় ভাবে জড়িয়ে রেখেছে, তাদেরই ভাসন্ত বহর থেকে সুঠামতনু বেদেনী তরিবত করে গান ধরে :

ময়ূরপঙ্খী নাও-ভিড়াইয়া আইলাম
তোমার খালে।
সোতের কোলে, নাওএর দোলে
আমার পরান কেমুন করে !
মেঘবরণ চুল আমার, টানা টানা ভুরু,
রাঙ্গা ডুইর‍্যা শাড়ী দিবা, আয়নাচুড়ি সরু,
আমি ভিনদ্যাশেরই কইন্যা—বন্দু-উ-উ-উ—
ময়ূরপঙ্খী নাও ভিড়াইয়া-আ-আ-আ—

যাযাবরীর ধারালো রঙের কাঁচুলিতে, তুঙ্গ বুকের যুগলকুম্ভে মেঘভাঙা কোমল রোদ ঝিলমিল করে ওঠে। ঘন চুলের ঢেউয়ে ঢেউয়ে, তার সারাটা শরীরের উজানী যৌবনের গর্বে আর গৌরবে, মোলায়েম ঠোঁট দুটির পানের রঙের জেল্লায়, চোখের তারায় বিজুরীর চমকে চমকে এই জলবাঙলার, এই নদী-বন-রোদের স্বাস্থ্য বিচ্ছুরিত হয়ে রয়েছে।

ময়ূরপঙ্খী নৌকা ভিড়িয়ে তারা আসে, কিন্তু মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত।

তারপরেই বালি-হাঁসের ঝাঁকের মত কোন ঠিকানাহীন নিরুদ্দেশে উধাও হয়ে যায়। এই যে ভাসমান বেদে-বহর, এই যে নোঙরহীন অগ্রচলা, প্রাক্‌পুরুষের ক্ষয়িত একটি অংশের মত এই যে বেবাজিয়া মানুষ—এদের জীবনেও ছায়া ফেলে সময়, ছায়া ফেলে মারী-মৃত্যু, বাসনা-কামনা, হতাশা-হাহাশ্বাসের সাতরঙা রামধনু। এই বেবাজিয়ারাই আমাদের গৃহী জীবনে যাযাবর পূর্বপুরুষের রহস্যময় সংবাদ নিয়ে আসে, স্থিতিবাদী মানুষকে অস্থির পথচলার কথা শোনায়।

এ কাহিনী তাদেরই হাসি-অশ্রু, পুলক-বেদনার ইতিহাস। এ কাহিনী এই ভাসন্ত মানুষগুলির আয়নায় আমাদের দুর্নিরীক্ষ্য অতীতকে বিম্বিত করার প্রচেষ্টা।

কাহিনী

শ্রাবণের দিন। আকাশে ময়ূরপাখা-রঙের মেঘ জমেছে। সেই মেঘ ফুলছে, ফুঁসছে, গুরু গুরু ডাকছে। দুরু দুরু কাঁপছে মেঘনা পারের মাটি। আসন্ন একটা প্লাবনের আভাসে দুলে দুলে উঠছে এই মেঘনা, দূরের ঐ ভূখণ্ড, দূরতম ঐ আকাশ।

উপরে শ্রাবণের মেঘ, নীচে তরঙ্গিত মেঘনা। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনার ফুলকি ফুটছে। বর্ষার মেঘনা—দুর্বার, খড়গধার। খাল-বিল আর ধানবন ভাসিয়ে সোঁ সোঁ গর্জনে সেই মেঘনা ছুটেছে জনপদের সীমানায়। রাশি রাশি ঢেউয়ের থাবা প্রসারিত করে দিয়েছে গৃহী পৃথিবীর দিকে। কৃষাণীদের অন্দরমহলের সঙ্গে মিতালি পাতাবার উল্লাসে শ্রাবণের মেঘনা মাতাল হয়ে উঠেছে।

মেঘনার উত্তাল দেহ থেকে একটা সুঠাম বাহু দক্ষিণ দিকে উধাও হয়ে গিয়েছে—রয়নাবিবির খাল।

মাতলা ঢেউগুলোর চূড়ায় দুলতে দুলতে পাঁচখানা নৌকা এসে ঢুকলো রয়নাবিবির খালে। হিজল সারির নরম নরম ছায়ায়, যেখানে কাঁচা সোনার মত মেঘভাঙা রোদ ঝিলমিল করছে, ঠিক সেখানেই 'পারা' ফেলল নেয়ে মাঝিরা। বকের পাখনার মত সাদা সাদা পালগুলো খুলে স্তূপাকার করলো পাটাতনের ওপর।

হিজল সারির কোমর সমান জল উঠেছে। ঢেউগুলো পাকে পাকে ভেঙে পড়ছে তার চারপাশে। রাশি রাশি ফেনা সেই ঘূর্ণিপাকে ফুটে উঠছে মল্লিকা ফুলের মত। কয়েকজন মাল্লা হিজলের ঘনপত্র শাখায় কাছি দিয়ে নৌকা বাঁধলো।

বেদে-বদ্যির বহর। বেবাজিয়া মানুষের ভাসমান সংসার এই পাঁচখানা নৌকার ভূগোলে সাজানো হয়েছে।

একেবারে প্রথম নৌকাটা জলঘাসের বনে আটকে গিয়েছে। ক্যাঁচা বাঁশের ছই থেকে বাইরে এলো শঙ্খিনী। অগুণ্ঠিত পাটাতন। তার ওপর ধপ্ করে বসে পড়লো সে। তারপর অবসন্ন চোখের পাতা বুজে হাই তুললো। ডান হাতখানা নাচের মুদ্রার ভঙ্গিতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তুড়ি বাজালো। কোমর থেকে ইরানী নৌকার বাদামের মত নানারঙের একটা ঘাগরা পায়ের পাতায় এসে লুটিয়ে পড়েছে। সেই ঘাগরার ভাঁজে ভাঁজে একটা দামাল গমক তুলে আড়মোড়া ভাঙে শঙ্খিনী।

সুঠামতনু বেদেনী। মেঘের এত একরাশ উদ্দাম চুল। শ্রাবণ দিনের সোনালী রোদ সেই চুলে ঝিলমিল করছে। পানপাত্রের মত একটি বরদেহ। শঙ্খিনীর সেই দেহের পাত্র ছাপাছাপি করে মদির যৌবন যেন উছলে উছলে

পড়ছে। একটু আগে তিন খিলি সাঁচি পান মুখে পুরেছিল শঙ্খিনী। পানের রসে মোলায়েম ঠোঁট দু'টি টকটক করছে।

শিথিল দৃষ্টিটা দূরের চক্ররেখায় ছড়িয়ে দিল শঙ্খিনী। ময়ূরপাখা-রঙের মেঘ কি এক অবসাদের ছায়া ফেলল সে দৃষ্টিতে!

গলুইর ওপর বসে ছিল রাজাসাহেব। এতক্ষণ শঙ্খিনীর ভাবগতিক সন্ধানী চোখে লক্ষ্য করছিল সে। এবার বলল, "কী ভাবতে আছিস লো শঙ্খিনী? কার কথা?"

দৃষ্টিটাকে দূরের চক্ররেখায় তেমনি স্থির রেখে শঙ্খিনী বলল, "ইট্টু তামুক সাজ না রাজাসাহেব; শরীলে (শরীরে) জুত লাগে না। মনে লয়, খালি ঘুমাই।"

বিচিত্র এক কৌতুকে রাজাসাহেবের গলায় ফুলকি ফোটে, "বড় জবর মোন্দ কথা আছে লো, জবর মোন্দ কথা!"

শঙ্খিনীর গলায় নিরুদ্বেগ জিজ্ঞাসা, "ক্যান? কিসের কথা আবার মোন্দ হইল?"

"স্বোয়াদ পাইছিস না কী পুরুষের মনের? গোন্ধ লাগছে বুঝি যৈবনের?"

উত্তেজনায় শঙ্খিনীর নিঃশ্বাসের সীমানায় ঘন হয়ে এলো রাজাসাহেব।

খিল খিল হাসিতে চকমকি জ্বলল শঙ্খিনীর, "কই পুরুষ মানুষ! সারাটা জনম এই পানির দ্যাশে খালে-বিলে, গাঙ্গে-নদীতে ভাইস্যা ভাইস্যা বেড়াইতে আছি। তেমুন পুরুষ নজরে পড়ল কই! তেমুন পুরুষ মনে ধরলো কই?"

"ক্যান? ক্যান? এই যে তাজা মরদটা তুর সামনে বইস্যা রইছি!"

"তুই আবার পুরুষ না কি! হায় রে খোদা! হায় মা বিষহরি! বান্দাটা কয় কী শোন!" অপরূপ লাস্যে গালে হাত রাখে শঙ্খিনী। ঠমকে ঠমকে হাসি বাজে তার গলায়। ঘাড়খানা সুঠাম ছাঁদে বাঁকিয়ে দু চোখ থেকে গমকে গমকে চমক ছড়ায় বেদেনী, "হায় রে বেকুব! এক ফির হামার গায়ের গোন্ধ পাইলে তো তিন দিন বুড়া শকুনের লাখান (মত) ঝিমাবি। ঠসকের কথা না কইয়্যা এক কল্‌কি তামুক ভইর‍্যা দে রে বান্দা! তামুক ভর।"

কিন্তু বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা জলদ বাজনার মত খরতালে বাজছে যাযাবরীর। দূর আকাশের মেঘ, রয়নাবিবির খালের এই মাতলা ঢেউ, শ্রাবণ দিনের এই মেঘভাঙা রোদ—সব মিলিয়ে একটা নিবিড় বেদনা টলমল করছে। না, না, সে কথা বলা যাবে না রাজাসাহেবকে। অনেকবার বলে বলে মনটা একেবারে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে। আর বললেও, এই মুহূর্তে কিছুতেই বলতে পারবে না শঙ্খিনী।

এর মধ্যে রাজাসাহেব তরিবত করে তামাক সাজিয়েছে কল্‌কিতে। তাওয়া থেকে বাঁশের চিমটে দিয়ে আগুন তুলতে তুলতে খলখল করে উঠলো রাজাসাহেব, "কি লো শঙ্খিনী, এক্কেবারে বোবা হইয়্যা গেলি দেখি! কার কথাখান

ভাবতে আছিস, ক' না লো।"

রাজাসাহেবের গলাটা আশ্চর্য তীক্ষ্ণ; বল্লমের মত ধারালো। দূরাগত গানের রেশের মত মনের পর্দায় পর্দায় ভাবনাটা দুলে দুলে যাচ্ছিল শঙ্খনীর; চেতনার পরতে পরতে কাঁপছিল সেই বেদনাটা। রাজাসাহেবের গলা সেই ভাবনাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে দিল, সেই বেদনাকে ছত্রখান করলো!

শঙ্খনী তাকালো। মদিরাক্ষী বেদেনীর যে চোখে বিজুরী চমকায়, সে চোখে কি এক মধুর স্বপ্নের সুর্মা লেগে রয়েছে!

রাজসাহেব আবারও বলল, "কি লো শঙ্খনী, মুখ দেখি এক্কেবারে বুইজ্যা ফেল্লি। হইল কি তুর?"

কয়েক মুহূর্তের মাত্র বিভ্রান্তি; শরতের মেঘের পরমায়ু। তারপরেই সেই চকিত হাসি বেদেনীর দু'টি পানরঙা ঠোঁটের ফাঁকে ঝিলিক দিয়ে উঠলো, "কি আবার হইল? তুর চোখে ধুলপড়া পড়ছে না কি রে রাজাসাহেব! কি দেখতে যে কি দেখতে আছিস তুই। হিঃ—হিঃ—হিঃ—হিঃ—"

"উঁহু, হামার সন্দ হয়। তুই তো আগে এ্যামন আছিলি না। এই কয়দিন ধইর‍্যা তুর কী হইল ক' দেখি শঙ্খ? সাচা কথাটা কইবি!"

ডোরাকাটা লুঙ্গিটা গোছগাছ করে নিল রাজাসাহেব। তারপর ইন্দ্রিয়গুলোকে উৎকর্ণ করে উবু হয়ে বসল।

"কী আবার হইলাম হামি? যুয়ান মরদের চোখে খালি সন্দ আর সন্দ। অকম্মা বেকুব কুথাকার?" কেমন যেন নিরুত্তাপ শোনালো শঙ্খনীর গলা। আবার আড়মোড়া ভাঙল শঙ্খনী। হাই তুলে তুলে দেহের নদীতে কয়েকটা শিথিল ঢেউ ছড়িয়ে দিল।

আগের রাত্রিতেও বেদেদের বহরটা ছিল ইনামগঞ্জে। মেঘনার ধু-ধু ওপারে একটা নগণ্য কৃষাণ গ্রাম সেটা।

সমস্ত রাত্রি নৌকা বেয়ে বেবাজিয়াদের বহরটা এইমাত্র নাগরপুরের সীমানায় এসে পড়েছে। 'পারা' ফেলেছে রয়নাবিবির খালে। শ্রাবণের উত্তরঙ্গ মেঘনা উজিয়ে আসতে মেয়ে পুরুষে সমানে বৈঠা চালিয়েছে। চোরা ঘূর্ণির ফাঁদ পেতে, রাশি রাশি ঢেউয়ের বাহু দিয়ে, ক্ষ্যাপা বাতাসের অজস্র বাধা দিয়ে চারমাল্লাই পাঁচখানা বেদে নৌকাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিল বর্ষার মেঘনা। কিন্তু বেবাজিয়াদের থাবায় বৈঠার ফলা বড় নির্মম, বড় হিংস্র। সব প্রতিরোধ, শ্রাবণের মেঘনার সব কারসাজি সেই বৈঠা দিয়ে চৌচির করে রাতারাতি এই নাগরপুরে এসেছে বেদেরা।

রাতারাতি শ্রাবণের মেঘনা পাড়ি দেওয়ার পিছনে একটা ইতিহাস আছে —মোটেই সুখকর নয় সে স্মৃতি।

মেঘনার ওপারে সেই ইনামগঞ্জের এক মহাজন বাড়ি থেকে সাফাই করে একটা সোনার বাজু নিয়ে এসেছিল আশমানী। আশমানী এই বেবাজিয়া বহরের দলনায়িকা। চৌকিদার আর জলপুলিসেরা মাতাল হাতির ঝাঁকের

মত তাদের বহরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই এপারের এই রয়নাবিবির খালের দিকে উধাও হয়েছিল বেদেরা।

আউশের ধানবনে কোমর সমান জল ভেঙে শেষ রাত পর্যন্ত গুণ টেনেছে শঙ্খিনী। তাই তার দেহে ধারালো ভঙ্গিগুলো আর রেখায়িত হয়ে নেই। শিথিল পেশীতে পেশীতে, তার কাঁচুলি আর ঘাগরার অসতর্ক গ্রন্থিতে নির্ঘুম রাত্রির ছাপ পড়েছে।

এক সময় বিক্ষুব্ধ গলায় শঙ্খিনী বলল, "হামার আর ভাইস্যা ভাইস্যা থাকতে ভাল লাগে না। এই পলাইয়্যা পলাইয়্যা বেড়াইতে আর পারি না। আইজ চৌকিদার কিল লইয়্যা আসে, কাইল দফাদার লাঠি লইয়্যা আসে। আর পারি না রাজাসাহেব, আর যে পারি না।"

এর মধ্যে দুটি মোটা মোটা ঠোঁটের ফাঁকে তামাকের বাজনা শুরু করে দিয়েছিল রাজাসাহেব। ভুর ভুর করে মৌতাতের ধোঁয়া ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিল বাতাসে। শঙ্খিনীর কথাগুলো শুনতে শুনতে এবার চমকে উঠল সে; তারপর নড়েচড়ে বসল। একটু পরেই শঙ্খিনীর সেই ভয়াল প্রস্তাবটা সমস্ত স্নায়ুগুলোকে আড়ষ্ট করে দেবে তার। একটু একটু করে শঙ্খিনী পর পর কি বলে যাবে, আগে থেকেই সে হুবহু বলে দিতে পারে।

শঙ্খিনী আবারও বলল, "রাজাসাহেব, মনের একটা কথা সাফা কইর‍্যা কইবি?"

"কী কথা?" রাজাসাহেবের গলা আশ্চর্য নিরাসক্ত শোনালো।

"তুর এই ভাইস্যা ভাইস্যা বেড়াইতে ভাল লাগে?"

হুঁকোর ফোকরে মোটা ঠোঁট দুটো আটকে গেল রাজাসাহেবের। ফিস ফিস গলায় সে বলল, "হুঁ। জবর ভাল লাগে। একটা দিনও এক জায়গায় থাকতে ভাল লাগে না।" একটু থামলো রাজাসাহেব, আবার বলতে শুরু করলো, "আইচ্ছা শঙ্খিনী, তোর মনে কী হইছে ক' দেখি?"

অন্য সময় হলে ভ্রূ দুটো বাঁকিয়ে চুরিয়ে তীক্ষ্ণ কৌতুকে কৌতুকে, রসে-রঙ্গে তাকে ঝালাপালা করে ফেলত শঙ্খিনী। কিন্তু এই মুহূর্তের আস্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। বেদেনীর কণ্ঠে কী এক কোমল কান্নার ছায়া নেমেছে যেন।

শঙ্খিনী বলল, "গেরামে গেরামে হামরা দেখছি, কি সোন্দর ঘর তুলছে কিষাণরা। তাগো জরু আছে, ধান আছে, ঘর আছে। পরানে মহব্বত আছে, সোয়াস্তি আছে। আর হামাগো তো কিছুই নাই। হামারা তো খালি জলে জলে ভাইস্যা বেড়াই। তুর ভাল লাগে না কিষাণগো লাখান হইতে। কী রে রাজাসাহেব?"

ইন্দ্রিয়গুলো অতিমাত্রায় সতর্ক। হাড়, মাংস, রক্ত—দেহমনের প্রতিটি স্নায়ু ধনুকের ছিলার মত প্রখর হয়ে রয়েছে রাজাসাহেবের। তবু বোকা বোকা গলায় সে বলল, "লাগে তো! কিন্তুক—" বলতে বলতে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল রাজাসাহেব। ডাবা হুঁকোটা নৌকার ডোরায় নামিয়ে চনমন দৃষ্টিটাকে চারদিকে ঘুরপাক খাওয়াতে লাগল।

"তবে চল যাই, হামরা দুইজনে পলাইয়্যা ঘর বান্ধি। তুই আর হামি। ক্যামুন—"

"না—না—" এবার আর্তনাদ করে উঠল রাজাসাহেব, "উহ সব হামি পারুম না।

আম্মা জানতে পারলে এক্কেবারে তাজাই গোরে পাঠাইব। কত মন্তর জানে আম্মা! এট্টা শঙ্খচূড় যদি চালান করে তো জান নিয়া নিব। বেবাজিয়া হামরা, উই সব বেতরিবত মতলব ছাড়ান দে শঙ্খি—"

"আম্মা মন্তর জানে না, জানে বাসি আখার ছালি (ছাই)। না, না—কতবার তুরে হামি কইছি! এইবার চল যাই রাজাসাহেব। হামরা ঘর বান্ধি, ছানাপোনা হইব।"

শঙ্খিনী একটি সুন্দর বাসনার কথা বলে।

আচমকা, একান্তই আচমকা ময়ূরপাখা-রঙের মেঘ থেকে একটা বাজ নেমে এলো যেন।

কখন যেন ছইয়ের ওপাশে এসে দাঁড়িয়েছিল আসমানী। এই ভাসমান জীবন থেকে পালিয়ে কোন ছায়াতরুর নীচে নোঙর ফেলার স্বপ্ন দিয়ে একটি যাযাবর পুরুষকে মুগ্ধ করতে চেয়েছিল শঙ্খিনী। রাজাসাহেব নামে একটি পুরুষের কামনাকে লুব্ধ করতে করতে শঙ্খিনী নামে এক বেদেনীমন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর শঙ্খিনীর রমণীয় বাসনার কথা শুনতে শুনতে আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল রাজাসাহেব। তাই আসমানীর এই আবির্ভাব কেউ টের পায় নি। শঙ্খিনীও নয়, রাজাসাহেবও নয়।

আসমানী এই বেদেবহরের আম্মা—দলনেত্রী। তার চারপাশে অনেকগুলি যাযাবর জীবন জমা হয়েছে। তাকে ঘিরে একটি ভাসন্ত সংসার রচনা করেছে অনেকগুলি বেবাজিয়া নারীপুরুষ।

পাটের ফেঁসোর মত এক মাথা পিঙ্গল চুলে, কুঞ্চিত চামড়ার রাশি রাশি ভাঁজে, ঘোলাটে চোখ দুটিতে অনেক অভিজ্ঞতার খতিয়ান রয়েছে আসমানীর, অনেক বছরের ইতিহাস চিহ্নিত রয়েছে।

আসমানীর সেই ঘোলাটে চোখ দুটো দু-টুকরো আগুনের মত জ্বলে উঠল। গলার সরু সরু শিরাগুলি উত্তেজনায় জোঁকের মত ফুলল। গর্জন করে উঠল আসমানী, "কি লো শঙ্খিনী, তুর মতলবখান কী? বেবাজিয়া মাগীর ঘর বান্ধনের সাধ হইছে? হায় আল্লা! হায়! হায় মা বিষহরি! হায় মা জাঙ্গুলি—গুণাহ্ মাপ কর তুরা—"

দুটি সরু সরু কঙ্কালের মত হাত যুক্ত হয়ে কপালে উঠে গেল আসমানীর। তারপরেই তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠল সে, "কী লো মাগী, কথা কইস না ক্যান্? তুরে হামি মুরগির লাখান জবাই করুম। হারামজাদী, কাছিমের ছাও শুওর। পরানে ঘরের ভাবন লাগছে! অমুন পরান বল্লম ম্যাইর্যা সিধা করুম। ছেন্দা দিয়া কোপাইয়্যা ঘরের ভাবন শ্যাস কইর্যা দিমু। কী লো নটী মাগী জবাব দে—"

দুর্বিনীত ভঙ্গিতে শঙ্খিনী বলল, "কী আবার কমু ? হামি মাইয়া মানুষ—গেরামে গেরামে হামি কিষাণ বউগো দেখছি, হামার ঘর বান্ধনের সাধ হয় না !"

আসমানীর দুটি ঘোলাটে চোখের মণিতে এক অশুভ ছায়াপাত হয়েছে। শঙ্খিনীর কথাগুলো শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে জীর্ণ হৃৎপিণ্ডটা ধক্ করে শিউরে উঠেছে তার। বেবাজিয়ার খরস্রোত জীবনে এ কোন্ বন্দরের অভিশাপ ? বিষহরির কাছে এ কোন্ ভয়ঙ্কর গুণাহ্ ? কোন্ গৃহী সাপুড়ের বাঁশি নাগমতী বেদের মেয়েকে কুহকিত করল ? না, না, এ ভাল নয়। একটা ভয়াল আতঙ্কে চেতনাটা ছমছম করতে লাগল আসমানীর।

কয়েকটা মাস ধরে মেয়েটার যেন কি হয়েছে ! না, না, একে কোন ক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। এর জন্য বিন্দুমাত্র মমতা নেই, নেই কণামাত্র করুণা। একে প্রশ্রয় দিলে কারুর রেহাই থাকবে না।

গ্রামে-গঞ্জে, পদ্মা-মেঘনার পারে পারে, শহরে-বন্দরে চুরি ডাকাতি হলে জলপুলিসের ঝাঁক অপযোনির মত তাদের বহরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু জল-পুলিসের চেয়েও শঙ্খিনীর এই নীড়প্রেম, এই ঘর বাঁধার স্বপ্ন অনেক—অনেক বেশী সর্বনাশা।

বিষহরির ক্রোধ বড় ভীষণ। নির্মম। নিষ্ঠুর। বেদেনীর এই গৃহী জীবনের স্বপ্নের জন্য এতটুকু স্নেহ নেই নাগভূষণা দেবীর। তাঁর রোষের আগুনে তা হলে ছারখার হয়ে যাবে জলবাঙলার সমস্ত বেদে-সংসার। যাযাবর জীবনের ইতিহাস জানে বৈকি আসমানী।

আর একবার নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল আসমানী ; হিসাবহীন বয়সের এই জীর্ণ ধমনীতে একটা হিমধারা বয়ে গেল সহসা। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলল, "উই সব মতলব ছাড় লো শঙ্খ। গুণাহ্ করছিস—আইজ তুর উপাস। সন্ধ্যার সময় বিষহরির কাছে ধুপতি (ধুনুচি) নিয়া নাচবি। আর কইবি, 'হে বিষহরি, এইবারের লাখান হামার গুণাহে মাপ চাই। আর ঘর বান্ধনের মতলব করুম না। কখনই না।' বুঝলি বান্দীর (বাঁদীর) বাচ্চা বান্দী ?"

শঙ্খিনীর ঠোঁট চিরে একটি শব্দও বেরুল না। নির্বাক, এক্কেবারেই নিঝুম হয়ে সে বসে রইল।

আসমানী আবারও প্রখর গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "এই হারামজাদা জিন, এই বখিল, এই রাজাসাহেব—তুই যদি আবার শঙ্খিনীর কাছে ছোক ছোক করবি তো, এক্কেবারে জানে খাইয়্যা ফেলামু তুরে। কাচা মাগীটারে খালি ফুসমন্তর দিতে আহিঁস ! যা, যা শয়তানের ছাও, উই নৌকায় যা।"

"না, না হামি—"

বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল রাজাসাহেব।

"আয় হামার লগে—" আসমানী খেঁকিয়ে উঠল।

একটু পরেই পাশের নৌকার পাটাতনে চলে গেল রাজাসাহেব আর আসমানী।

চক্ররেখার ওপারে ময়ূরপাখা-রঙের মেঘ আরো নিবিড় হয়ে জমেছে। ছৈতান সারিটা আশ্চর্য রহস্যময় মনে হচ্ছে এখান থেকে। সেদিকে দুটি ভাবলেশহীন চোখের দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল শঙ্খিনী।

দুই

রয়নাবিবির খাল। দু'পারে অবারিত ধান আর পাটের অরণ্য। একটা সবুজ সমুদ্র যেন নিথর হয়ে রয়েছে রয়নাবিবির খালের দু'পাশে। আর সেই ধানপাটের পাতায় পাতায় মেঘভাঙা মোহন রোদ দোল খেয়ে চলেছে।

খালের দূর বাঁকটা ঘুরে, হেউলি ফুলের সুরভিত ঝোপটা পেছনে রেখে একটা কোষডিঙি স্পষ্ট হয়ে ফুটে বেরুল। ধারালো একটা টেঁটা (মাছমারার অস্ত্র) নিয়ে মহব্বত বেরিয়েছে বর্ষার মাছের সন্ধানে।

মহব্বতের কোষডিঙিটা ঢেউয়ের সোহাগে তির তির করে কাঁপছে। টেঁটাটা হাতের থাবায় নিয়ে ডোরার ওপর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রয়েছে মহব্বত।

সামনের ধানবনের ফাঁক দিয়ে একঝাঁক শোলের পোনা খালের জলে এসে নামল। সেদিকে কণামাত্র নজর নেই মহব্বতের। শোল মাছের চেয়েও অনেক, অনেক লোভনীয়, অনেক মনোরম একটি ছবি তার চোখে পড়েছে।

মহব্বতের রক্তের কণায় কণায় রয়নাবিবির খালটা কলশব্দে বেজে উঠল। দু'টি চোখ যেন কুহকিত হয়ে গিয়েছে তার; আর সেই কুহকিত দৃষ্টিটা অপলক হয়ে আটক রয়েছে বেদে নৌকার অনাবৃত পাটাতনের একটি বিন্দুতে। সে বিন্দুটি একটি অপরূপ বেদেনীতনু। তার নাম শঙ্খিনী। তুঙ্গ বুকের যুগল-কুম্ভকে শিথিল বাঁধনে জড়িয়ে রেখেছে একটি রক্তাভ কাঁচুলি। দু'টি ঠোঁটের ফাঁকে একটি মদির হাসি যেন ক্লান্ত হয়ে রয়েছে।

অনেকটা সময় বিচিত্র একটা অনুভূতির মধ্য দিয়ে দোল খেয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শঙ্খিনী তীক্ষ্ণ অথচ মধুর গলায় আবিষ্ট নেশার গান ধরেছে:

'তুমারে দেখলাম বন্দু
হিজলতলীর খালে।
হামারে বান্ধিলা তুমি
তুমার মায়ার জালে।
হামার মনের সাক্ষী উই যে আসমানেরই তারা,
সাক্ষী হইল চন্দর সুরুয, ডউয়া গাছের চারা।
আমি বাইদ্যা কইন্যা বন্দু, আইলাম-মু-মু—'

রয়নাবিবির খাল। ঢেউয়ের বাজনায় নাগকন্যার কণ্ঠ মধুরতর হয়ে উঠতে থাকে; নেশার মত ছলছলিয়ে যায় দিকে দিকে।

এখন নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহব্বত। হাতের মুঠোতে রুপার মত ঝকঝকে টেঁটার ফলায় শ্রাবণের সোনালী রোদ চমকে চমকে উঠছে।

শঙ্খিনী তখনও গাইছে :

কালনাগিনী বন্দু তুমি
হামার বুকের জ্বালা।
তুমার গলায় দিমু বন্দু
ডুম্বুর ফুলের মালা।
চিকন চুমা আইক্যা (এঁকে) দিমু
তুমার রাঙ্গা মুখে।
হামার মনের মধু দিমু
তুমার ঐছন বুকে।

মহব্বত ধীরে ধীরে কোষডিঙিটা এনে ভিড়াল বেবাজিয়াদের বহরটার পাশে।

গানের রেশ মিহি তন্দ্রার মত তখনও শঙ্খিনীর মুখেচোখে জড়িয়ে ছিল। ঘাড়খানা বাঁকিয়ে কোষডিঙিটার দিকে দৃষ্টিটা ছুঁড়ে দিল সে। সেই দৃষ্টিতে কৌতুক আর কৌতূহলের আলো ঝিকমিক করছে তার।

মুগ্ধ গলায় মহব্বত বলল, "তোমার গলাখান তো জবর মিঠা কইন্যা, ভারী মিঠা। এক্কেবারে খেজুর রসের লাখান (মত)।"

খিল খিল শব্দ কবে হাসিতে শান দিল শঙ্খিনী।

একটু আগেই পাশের নৌকায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল রাজাসাহেব। খুশী খুশী গলায় শঙ্খিনী ডাকল, "রাজাসাহেব, এই রাজাসাহেব ; গেলি কুথায় ? মরলি না কী ?"

একটি বিবর্ণ কণ্ঠ ভেসে এলো, "ক্যান ? হইছে কী ?"

"এই নায়ে আয়। কামের কথা আছে। আয়, আয় তরাতরি (শীঘ্র) আয়।"

একটু পরেই পাশের নৌকার গলুই ডিঙিয়ে এ নৌকার পাটাতনে চলে এলো রাজাসাহেব। তার চোখ দু'টি সন্ত্রস্ত। সারা দেহের ভঙ্গিতে আশঙ্কা ফুটে বেরিয়েছে।

রাজাসাহেব বলল, "কী কইবি, তরাতরি ক'। তুর নায়ে আইছি, একবার জানতে পারলে আম্মা এক্কেবারে শ্যাষ করবো।"

"তুর পরানে খালি শালিক পংখীর লাখান ডরই রইছে। তুই মরদ না আর কী ? ইদিকে খুন-খারাপি, রাহাজানি করতে ডরাইস না, কিন্তুক আম্মা শয়তানীরে খালি ডর আর ডর ! দ্যাখ, উই যে হামার বাদশাজাদা আসছে। আসেন, আসেন বাদশাজাদা, পাটাতনে উইঠ্যা আসেন।" মহব্বতের দিকে চোখদুটো চরকিবাজীর মত ঘুরিয়ে শঙ্খিনী বলল, "দেখছিস রে শয়তান, হামার বাদশাজাদারে দেখলি ?"

বিরস একটা জিজ্ঞাসা ফুটে বেরুল রাজাসাহেবের গলায়, "দেখলাম তো হইছে কী ?"

"কী হইছে !" খিল খিল হাসির ক্ষ্যাপামিতে ভেঙে ভেঙে পড়ল শঙ্খিনী,

"কী আবার হইব ? হামার গান বাদশাজাদার মনে ধরছে, হামারে ধরে নাই রে শয়তানের ছাও ! হামি এলা (এবার) কী করুম ?"

"কি করবি ?" রাজাসাহেবের কণ্ঠ থেকে উদ্বেগ উছলে পড়ল।

"কী আবার করুম ? কান্দুম (কাঁদব)।"

ইতিমধ্যে পাটাতনের ওপর উঠে এসেছে মহব্বত। সমস্ত মুখেচোখে বিব্রত ভঙ্গি ফুটে বেরিয়েছে তার, "কি যে কও কইন্যা ; তোমার গানের থিকা তুমি আরও সোন্দর। ঠিক যেন এট্টা ডানাকাটা জলপৈরী। হে-হে—বুঝলা কি না—এট্টা জলপৈরী ; না না, এট্টা হুরী—"

"মন রাখা কথা ক'ন ক্যান বাদশাজাদা ? হামি তো এট্টা পেত্নী। দ্যাখেন না, পোড়া আঙ্গারের লাখান (মত) হামার গায়ের চামড়া। হিঃ-হিঃ-" প্রথমে দু'টি ঠোঁটের ওপর একটি কপট অভিমানের ঢেউ দুলে উঠেছিল ; তারপরেই প্রখর রেশ ছড়িয়ে ছড়িয়ে হেসে উঠল যাযাবরী।

নাগমতী বেদের মেয়ে। পদ্মা-মেঘনা-ইলসার দেশের জলকন্যা। তার সুঠাম বরতনুতে, তার তীক্ষ্ণ কৌতুকে কৌতুকে খরশান বন্যা বয়ে যায়। যে কোন মুহূর্তে বিজুরীর মত চমকে চমকে চকিত হয়ে ওঠে সে। তার হাসি, তার কথা, তার রঙ্গ—সবই যেন কি এক মধুর রহস্য দিয়ে, কি এক কুহক দিয়ে ঘেরা।

দিশাহারা গলায় মহব্বত অন্য প্রসঙ্গে এলো, "কোনখান থিকা আসলা কইন্যা ?"

"আসমান থিকা।" শঙ্খিনীর গলায় আবারও সেই খরধার হাসি বাজলো, "আসমানের ম্যাঘেরে জিগান (জিজ্ঞাসা করুন) বাদশাজাদা।"

বিশৃঙ্খল গলায় মহব্বত বলল, "নাম কী তোমার কইন্যা ?"

"হায় রে বেকুব যুয়ান ! হায় রে হামার বাদশাজাদা ! ক্যামুন পুরুষ আপনে ! মাইয়া মানুষের নাম জিগান (জিজ্ঞাসা করেন) !" বলতে বলতে নিটোল গালে হাত রাখে শঙ্খিনী। নিবিড় কালো দু'টি চোখ। সে চোখ থেকে যেন ভ্রমর উড়ে উড়ে যেতে চায়। আয়নার মত স্বচ্ছ দু'টি আঁখিতারা মহব্বতের মুখের ওপর স্থির করলো শঙ্খিনী।

পাকা মাঝি মহব্বত। প্রত্যেক দিন বিশ-পঁচিশ বাঁক জল উজিয়ে দূরের গ্রাম-গঞ্জে যেতে হয়, যেতে হয় মেঘনাপারের ধু-ধু বন্দরগুলোতে। একান্ত অবলীলায় পার হয়ে যায় বর্ষার মেঘনা, তারপর ভরা কোটালের কালাবদর, কী পাড়ি জমায় শ্রাবণের মাতলা পদ্মায়। কিন্তু তার লাগ থৈ পায় না বেদেনীর রঙ্গরসের সমুদ্রে। সে সমুদ্র বর্ষার মেঘনার চেয়ে, ভরা কোটালের কালাবদর কী শ্রাবণের পদ্মা থেকে অনেক, অনেক বেশী গহীন, অনেক গভীর। সে সমুদ্রে একটি স্নিগ্ধ দ্বীপের প্রত্যাশা যেন নেই। নির্বোধ দৃষ্টিতে শঙ্খিনীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মহব্বত।

ইতিমধ্যে রাজাসাহেব এক কলকি তামাক সেজেছে। অতিকায় ডাবা হুঁকোটা সে শঙ্খিনীর দিকে বাড়িয়ে দিল।

CENTRAL LIBRARY
14236

শঙ্খিনী বলল, "খান, তামুক টানেন বাদশাজাদা। মন আর মেজাজ দুই-ই তাজা হইব।"

"আমি তো বাদশাজাদা না ; আমি হইলাম ভুঁইয়া বাড়ির বান্দা। অখন তামুক থাউক ; তামুক খাইতে জুত পাই না।"

"খান, খান বাদশাজাদা। কলকিতে হামার হাতের গোন্ধ আছে। সেই গোন্ধে আমার পরানের খুশবু আছে।" কটাক্ষকে আরো মদির করে তুলল শঙ্খিনী. "আপনে কার বান্দা তা তো হামি জানি না বাদশাজাদা ; কিন্তুক আপনে হামার বাদশাজাদাই আছেন গো বেকুব মরদ।"

শঙ্খিনীর হাত থেকে কলকিটা নিজের মুঠিতে তুলে নিল মহব্বত।

রয়নাবিবির খালে নিতল হয়ে নামছে শ্রাবণ দিনের ছায়া। হিজলসারির ফাঁক দিয়ে সোনালী রোদ ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় দোল খাচ্ছে। কোন এক ছৈতানের শাখায় বৃষ্টি-ভীরু ঘুঘু ডেকে উঠল। নৈঋ্ঁত আকাশে ময়ূর-পাখা রঙের মেঘ আরো নিবিড় হয়েছে। আরো কুটিল হয়েছে।

মহব্বত বলল. "দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) করলাম কইন্যা, আমাগো বাড়ি যাইও।"

"আপনের ঘর আছে? জরু আছে? পোলা আছে?" বেদেনীর কণ্ঠ থেকে সহসা সকল কৌতুক, সকল রঙ্গরস মুছে গেল। তার বদলে কেমন এক গভীরতার স্পর্শ এসে লাগল।

"আমার ঘর নাই। ভুঁইয়া বাড়িতে বান্দার কাম করি আমি। শাদিই করি নাই—জরু-পোলা পামু কই? ঘর নাই, সোংসার নাই—আমিও তোমাগো লাখান বেবাজিয়া। তফাতের মধ্যে, তোমরা বহর ভাসাইয়্যা ঘুইর‍্যা বেড়াও, আর আমি আটকা থাকি।"

"আপনের তবে ঘর নাই বাদশাজাদা!" শঙ্খিনীর গলায় কেমন একটা হতাশার ছায়া নেমে এলো।

মতিহারী তামাকের মৌতাতে রাজাসাহেবের চোখদুটো লাল হয়ে গিয়েছে। রক্তাভ দৃষ্টি মেলে শঙ্খিনীর দিকে তাকাল সে। উচ্ছলা বেদেনীর গলায় এই স্বর বদল একটা দুর্যোগের আভাস দিচ্ছে। নির্মম গলায় রাজাসাহেব ডাকল, "শঙ্খ—"

"কী কইস তুই রাজাসাহেব?" শঙ্খিনীর কালো চোখের মণি থেকে উদয়নাগের ফণা বেরিয়ে এলো যেন।

"আম্মার কথা তুর মনে নাই? আবার ঘরের কথা কইতে আছিস? হামি কিন্তুক আম্মারে ডাকুম—"

"ডাক না তুই! হামি কারোরে ডরাই না।"

"দ্যাখ শঙ্খ, হামরা বেবাজিয়া মানুষ। হামরা ঘর বানতে (বাঁধতে) চাইলে বিষহরির গোসা আইস্যা পড়ব। তুই ঘরের কথা ছাড়ান দে।" আশ্চর্য মোলায়েম শোনালো রাজাসাহেবের কণ্ঠ।

"যা, যা জিন। ভাগ্-ভাগ্—বিষহরি আর উই আম্মা শয়তানীর ডর

তুই হামারে দেখাইস না রে বখিল।" দু'সারি ঝকঝকে দাঁত কড়কড় বেজে উঠল শঙ্খিনীর।

"আইচ্ছা ; দেখা যাইব।" ক্রুর চোখে একবার তাকাল রাজাসাহেব। তারপরেই পাটাতন ডিঙিয়ে ওপাশের নৌকায় চলে গেল।

নির্বোধ গলায় মহব্বত বলল, "ও যে চইল্যা গেল !"

"যাউক, উর গায়ে জবর বেবাজিয়া গোন্ধ !" শঙ্খিনীর ভ্রমরচোখ থেকে উদয়নাগের ফণা সরে গেল। কেমন এক আবেশে দৃষ্টি কোমল হল। শঙ্খিনী আবারও বলল, "নিজের ঘরে তুলতে পারেন না বাদশাজাদা ? ঘর নাই তো ক্যামুন সোংসারী মানুষ আপনে ? ঘর জরু না হইলে সুখ পান ? যুয়ান মরদ, ঘর-বউর সাধ নাই আপনের ? পরান উথল-পাথল হয় না ?"

স্নায়ুগুলো কি এক বেদনায় বিবশ হয়ে গিয়েছে মহব্বতের। সারা দেহের তরঙ্গিত পেশীতে পেশীতে, উদ্দাম রক্তে রক্তে, বুকের মধ্যে উত্তাল হৃৎপিন্ডটিতে পঁচিশ বছরের তরুণ কামনা আর বাসনা জলদ বাজনার মত খরতালে বেজে বেজে ওঠে। একটি প্রিয়মুখ যুবতী ; তার শ্যামল আর দীঘল একটি বরতনু, সেই তনু ঘিরে রাঙা ডুরে শাড়ি সিঞ্জিনা লতার মত বেয়ে বেয়ে উঠেছে ; তার সরস পরিহাস, তার সুখসঙ্গ, তার মাথাভরা একরাশ তেল-জবজবে চুল, তার বেসর-বনফুল-পৈছা-খাড়ুর ছন্দ, তার কোলে সুন্দর নাদুস নুদুস ছেলে—সব মিলিয়ে একটি ভীরু স্বপ্ন পঁচিশ বছরের চেতনায় কাঞ্চনফুলের মত ফুটে ওঠে ; মধুর সৌরভ ছড়ায়। সেই স্বপ্ন তার নিঃসঙ্গ শয্যাকে অতন্দ্র করে রাখে। আশ্চর্য ! সেই স্বপ্নের কথা এই কুহকিনী বেদেনী ছাড়া আর কেউ তাকে এমন করে বলে নি। গাঢ় গলায় মহব্বত বলল, "পরানে সাধ আছে বাইদ্যানী, আছে আহ্লাদ, আছে খুয়াব (স্বপ্ন)। কিন্তুক সাধ আর খুয়াব থাকলেই বা পারি কই ? আমি বান্দা। আমার আম্মারে কিনে আনছিল ভূঁইয়া সাহেবের নানা ! আমার কী পলাইয়্যা ঘর বান্ধন চলে ! ঐ কবরেই চিরটা কাল কাটাইতে হইব। ঘর আর জরুর খুয়াব কোন কালেই সত্য হইব না বাইদ্যানী। বান্দাই থাকতে লাগব সারা জনম।" পঁচিশ বছরের তরুণ হৃৎপিন্ডকে ফালা ফালা করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মহব্বতের, "ঐ বড় ভুঁইয়া আমারে কোন দিনই গোরস্থান থিকা যাইতে দিব না। আমি যে বান্দা !"

এই মানুষটার সঙ্গে সহসা নিজের একটা আশ্চর্য মিল খুঁজে পেল শঙ্খিনী। আশ্চর্য একটা সঙ্গতি। তাকে আটক করে রেখেছে আসমানীরা ; এই বেবাজিয়া বহর থেকে কোন মতেই পালিয়ে যাবার উপায় নেই। চারদিক থেকে অজস্র জোড়া বেবাজিয়া চোখ তাকে পাহারা দিয়ে চলেছে। আর এই মানুষটাকে বন্দী করেছে কোন এক বড় ভুঁইয়া। দু'জনেরই গৃহী জীবনের বাসনা আছে। এই বেবাজিয়া বহর আর ঐ বড় ভূঁইয়ার বাড়ি থেকে ফেরারী হয়ে কোন বনস্পতির নিরালা ছায়ায় ঘর বাঁধবার জন্য দুটি তরুণ প্রাণই উন্মুখ হয়ে রয়েছে। কিন্তু প্রতিকূল পৃথিবী পদে পদে—প্রতিটি পদক্ষেপ তাদের বেঁধেই চলেছে। নতুন পরিচিত মানুষটার সঙ্গে কেমন একটা একাত্মতা

অনুভব করল নাগমতী বেদের মেয়ে।

মহব্বত ভাবছে। এক আগেও রয়নাবিবির খালে অজস্র বেদেবহর এসে 'পারা' ফেলেছে। এসেছে কত না তীক্ষ্ণযৌবনা বেদেনী। তাদের হাসি-তামাশা, তাদের অফুরন্ত রঙ্গরস তার তরুণ মনকে মাতিয়ে তুলেছে। কিন্তু তাদের সকলের থেকে এই বেবাজিয়া মেয়েটি অনেক, অনেক আলাদা। জন্মাবধি বান্দা জীবনে শুধু স্বপ্নই দেখেছে মহব্বত। অতন্দ্র চোখ দু'টি আকাশের তারায় তারায় ছড়িয়ে সমস্ত রাত্রি পাড়ি দিয়েছে সে। ঘর, জরু, গৃহস্থালি—এদের নিয়ে যে একটি মধুর বেহেস্তের কল্পনা, সে কল্পনার কোন প্রত্যক্ষ রূপ নেই তার জীবনে। সে কল্পনা অতন্দ্র রাত্রির স্বপ্নে নিরাকারই ছিল এতকাল ; শুধু মাঝে মাঝে প্রখর আক্ষেপে আর বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসে তার প্রকাশ হত। সেই সুন্দর কল্পনাটি, ঘর-জরু-সন্তান দিয়ে ঘেরা একটি মনোরম বেহেস্তের ভীরু স্বপ্নের কথা কী আশ্চর্যভাবেই না বলল নতুন এই বেদেনী! বিস্মিত দৃষ্টিতে শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে রইল মহব্বত।

এই রয়নাবিবির খাল, তার অবারিত জলরেখা, আউশের ধানবনে বাতাসের সোহাগ, আকাশের কাজল মেঘে মেঘে সজল বর্ষার ছায়ালিপি—এই পটভূমিতে শঙ্খিনী যেন রঙ্গিনী নাগকন্যা নয়। মহব্বতের মনে হলো, একটি প্রিয়মুখ পরিজন হয়ে সে যেন তার গৃহস্থালির খবর নিচ্ছে।

মহব্বত বলল, "এখন আমি তোমার লাখানই বেবাজিয়া। ঘর যখন বান্দুম, তখন তোমারে ঠিকানা দিমু। তোমারে দাওয়াত করলাম বাইদ্যানী ; তুমি যাইও। তখন যেইখানে আছি সেইখানের ঠিকানা দিয়া যাই। ক্যামুন ?"

"যুবতী মাইয়ার কাছে যুয়ান পুরুষের ঠিকানা লাগে না বাদশাজাদা। ঘর যখন বান্‌বেন (বাঁধবেন), তখন ঠিক গিয়া হাজির হমু। তার আগে আপনের দাওয়াত নিলাম। আপনে আপনের ভুঁইয়া বাড়িতে যান, আমরা আসতে আছি।" শেষের দিকে কণ্ঠটা যেন ফিস ফিস হয়ে এলো। তারপরেই খিল খিল শব্দে হেসে উঠতে চাইল শঙ্খিনী। কিন্তু মহব্বতের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খিল খিল কৌতুকের হাসি মুছে গেল শঙ্খিনীর। অপলকে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে মহব্বত।

শঙ্খিনীর মনে হলো, রাজাসাহেবের চোখ যে স্বপ্নের কথায় শঙ্কিত হয়, সেই স্বপ্নই মহব্বতের দৃষ্টিতে আবেশ এসে দেয়। সেই আবেশভরা চোখের দিকে তাকিয়ে আবিষ্ট হয়ে যায় উচ্ছলা যাযাবরী।

একটু পরেই মহব্বতের কোষডিঙিটা খালের দূর বাঁকে মিলিয়ে গেল।

তিন

এক সময় বৃষ্টি শুরু হলো। ঋজু রেখায় জল ঝরছে ; আর সেই জল রয়নাবিবির খালে খৈ-এর মত ফুটে উঠছে। শ্রাবণের আকাশ থেকে সোনালী

রোদ কি এক ভোজবাজিতে মুছে গিয়েছে। বৃষ্টির চিকের ওপারে আউশ-আমনের প্রান্তর কি দূরের ছৈতানের সারিটাকে এখান থেকে আবছা দেখাচ্ছে।

বাইরের অনাবৃত পাটাতন থেকে 'ছই'-এর মধ্যে চলে এলো শঙ্খিনী। দু'দিকে ঝাপ টেনে দেওয়া হয়েছে। বৃষ্টির তীর মুলি বাঁশের ঝাঁপের ওপর আছড়ে পড়ছে অবিরাম। অবিশ্রাম। তারপর জল হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

অতিকায় ঘাসি নৌকার গর্ভলোক।

লাল কেরোসিনের হ্যারিকেন জ্বালিয়েছে সোহগী। পিঙ্গল রঙের আলো 'ছই'-এর দেওয়ালে দেওয়ালে কাঁপছে।

এক পাশে কাঁথাবালিশের স্তূপ 'ছই'-এর চূড়ায় গিয়ে ঠেকেছে। দু'পাশের বাতায় নারকেল দড়ি টাঙানো। সেই দড়ি থেকে কতকগুলো জাফরানী ঘাগরা ঝুলছে। পাটাতনের নীচে পোড়া মাটির অজস্র হাঁড়ি আর রয়েছে থরে থরে সাজানো অনেক বেতের ঝাঁপি। খাল-বিল, জলজঙ্গলের এই দেশ—দিগদিগন্ত থেকে রাশি রাশি সাপ ধরে ঝাঁপি আর হাঁড়িগুলোর মধ্যে বন্দী করে রেখেছে বেদেরা। নানা নামের, নানা রঙের, নানা বিষের সাপে এই বেবাজিয়া বহরের ভবা ভরে উঠেছে। চক্রচূড়, কালচিতি, খৈজাতি, শঙ্খনাগ, উদয়নাগ, আলাদ, গোক্ষুর। এমনি অসংখ্য।

'ছই'-এর ছাদে ঝম ঝম বৃষ্টির বাজনা। ঝাঁপি আর হাঁড়ির মধ্যে সোঁ সোঁ ফণা আছড়াচ্ছে সাপেরা। শ্রাবণের অশান্ত বর্ষণ শুনতে শুনতে মুক্তির ডাক শুনেছে তারা। বেরিয়ে আসার দুর্বার কামনায় তারা অবিরাম গর্জন করে চলেছে।

পাটাতনের এক কিনারায় আগুনের মালসা, ক্যাঁচা বাঁশের চিমটে, গোটা পাঁচেক ডাবা হুঁকো আর তামাকের চোঙা ছড়িয়ে রয়েছে। তারই পাশাপাশি সপ্তনাগের চূড়াচক্রে দেবী 'বিষহরি'-র মূর্তি। সামনে সরষের তেলের একটা প্রদীপ থেকে স্তিমিত আলো ছড়িয়ে পড়েছে। দুটো অতিকায় ধুনুচি থেকে গন্ধধূপের শেষ ধোঁওয়া এখনও শিথিল কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে চলেছে।

জড়িবুটি আর বিষপাথরের তিনটে ঝাঁপির পাশ থেকে কয়েকটা বকনা বাছুর তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। গত রাত্রিতে মেঘনার ওপারে ইনামগঞ্জ থেকে নিরীহ প্রাণী ক'টিকে হাতিয়ে এনেছে রাজাসাহেব আর যোশেফ।

বাইরের আকাশ থেকে আরও উদ্দাম হয়ে ঝরছে শ্রাবণের বৃষ্টি।

লালা কেরাসিনের পোড়া গন্ধ, কাঁথাকানির স্তূপ থেকে উগ্র দুর্গন্ধ, গন্ধধূপের গন্ধ, বকনা বাছুরের গায়ে বোটকা গন্ধ— সব মিলিয়ে একটা মিশ্রিত দুর্গন্ধ 'ছই'-এর মধ্যে জমাট বেঁধে রয়েছে। নৌকার খোলের মধ্যে কয়েকটা কুঁচিলা ধরে রাখা হয়েছিল; সেগুলি পচেও একটা বিষাক্ত দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। ইন্দ্রিয়গুলো কেমন যেন অসাড় হয়ে আসে।

পাটাতনের ওপর নির্বাক বসে ছিল শঙ্খিনী।

তুঙ্গ বুক দুটিকে মেহেদী রঙের কাঁচুলীতে বন্দী করতে করতে সামনে এগিয়ে এলো গোলাপী, "কী লো শঙ্খি; পরানে না তুর ঘর বান্ধনের শখ

ফুইট্যা উঠছে ? উই সব মতলব ছাড়। হামরা বেবাজিয়া।”

শঙ্খিনীর মেয়ে-মনের সেই কামনাটির কথা এই বেবাজিয়া বহরের সকলেই জানে।

কোন জবাব দিল না শঙ্খিনী। চুপচাপ বসে রইল।

অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে শঙ্খিনীর কানের মধ্যে মুখটাকে গুঁজে দিল গোলাপী, “আম্মা তুরে ভাত দিব না, কইছে। কইছে, তুরে উপাস দিবার লাগব ; বিষহরির কাছে ধুপতি নাচাইতে লাগব। ডরাইস না শঙ্খ, হামি তুরে লুকাইয়্যা ভাত আইন্যা দিমু। ক্যাও ট্যার পাইব না। বুঝলি ঘরবান্ধনী মাগী !”

“যা, যা পেত্নী। উই যুশেইফ্যার কাছে যা। উয়ার কানে কানে সোহাগের কথা ক’ গিয়া। হামার কাছে মরতে আসছিস ক্যান ?” নির্মম চোখে তাকাল শঙ্খিনী।

“উরে, বাজান, ম্যাজাজ কী ! যেন কাচা মরিচের লাখান। ভাল কথা কইতে গেলে ফোঁস কইর‍্যা ওঠে জাতি সাপের ছাও। যা, যা পেত্নী মাগী !” বারুদের মত জ্বলে উঠল গোলাপী।

পাটাতনের নীচে ধর্মজালের সন্ধানে নেমেছিল আতরজান। ঝুপসি মাথাটা তুলে অমানুষিক ভঙ্গিতে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল সে, “উয়ার কাছে ক্যান গেছিস লো গোলাপী ? উয়ার ঘরের বউ সাজনের ভাবন লাগছে। ভালটা উয়ার কাছে মোন্দ হইব অখন। যা, যা, আম্মার কাছে গিয়া ভাতে জ্বাল দে। গুষ্টি খাইয়্যা বাঁচব।”

কাঁচুলির গ্রন্থি শিথিল করে খুলে ফেলল গোলাপী। যৌবন-বন্ধক ঠিক মত মনে ধরছে না তার ? অনাবৃত ঊর্ধ্বাঙ্গ। বুকের ওপর লাল চন্দনের ফোঁটা পরানো অপূর্ব পরিপূর্ণতা টলমল করছে।

সেদিকে তাকিয়ে খলখল করে হেসে উঠল আতরজান, “তুর লগে পিরিত জমাইতে ইচ্ছা করে লো গোলাপী। হামার নাগরী হবি ?”

তীক্ষ্ণ কৌতুকে হিস হিস করে উঠল গোলাপীর জিভ, “তুর লগে পিরিত জমাইয়্যা হামার লাভ ! তুই তো এট্টা মাগী লো আতরজান ! আর হামিও মাগী।”

এবার কাঁচুলিটা মনোরম করে বেঁধে নিয়েছে গোলাপী। আচমকা একটা ক্ষিপ্র মোচড় খেয়ে সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো সে। তারপর ‘ছই’-এর ঝাঁপ খুলে বাইরের বৃষ্টিঝরা পাটাতনে চলে গেল।

গোলাপী বাইরের পাটাতনে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নৌকার খোল থেকে উঠে এলো আতরজান। হাতের মুঠিতে একটি ধর্মজাল।

শঙ্খিনী বলল, “জাল দিয়া কি হইব লো আতর ?”

“কী আবার হইব ? খাল থিকা মাছ মারতে লাগবো। রসুন দিয়া মাছের ছালুন না হইলে মুখে ভাত রুচব না। সিধা কথা।”

শঙ্খিনী বলল, “আইজ হামি মাছ খামু না। রোজ রোজ মাছে সোয়াদ পাই না। বড় মুর্গা খাওনের সাধ হইছে লো আতরজান।” দুটো ঝকঝকে

চোখ লুব্ধ হয়ে উঠল শঙ্খিনীর।

"কী খাবি? মুর্গা। হামি তুরে খাওয়ামু।" ঝাপটা ভেঙে দমকা বাতাসের মত ভিতরে চলে এলো রাজাসাহেব। এতক্ষণ একটা খাটাসের মত থাবা পেতে বাইরের পাটাতনে বসে ভিজছিল সে।

"হারামজাদা ইবলিশ্! তুরে হামাগো এই নৌকায় আসতে কইছে কে? পিরিত ফুটানের আর জায়গা পাইস না?" আতরজানের লাল লাল অসমান দাঁতগুলো হিংস্র শব্দ করে বেজে উঠল।

রাজাসাহেব গর্জে উঠল, "চুপ মার আতর, চিল্লাচিল্লি করলে এক্কেবারে জানে খাইয়্যা ফেলমু।"

"চুপ করমু তুর ডরে! হামারে তুই জানস না রাজাসাহেব—তুর কলিজা খামু হামি।" চোখের কপিশ মণিদুটো ক্রূর হয়ে উঠেছে আতরজানের। মুখখানা কবে যেন ঝলসে বিকৃত হয়ে গিয়েছিল। সেই বিকৃত মুখটা মুহূর্তে বীভৎস দেখাচ্ছে।

"হ-হ—আমার ডরে। দুই ঠ্যাঙ্ ধইর‍্যা এক্কেবারে ফাইড়্যা ফেলমু তুর।" রাজাসাহেবের গলা আবারও হুঙ্কার দিয়ে উঠল। দুটো চোখ রক্তাভ হয়ে উঠেছে তার।

মুগ্ধ চোখে রাজাসাহেবের দিকে তাকাল শঙ্খিনী। পুরো পাঁচ হাত দীর্ঘ একটি চেহারা। মাথার চুলগুলো থরে থরে কাঁধের সীমানায় নেমে এসেছে। সুগৌর দেহ। টানা টানা ভ্রূরেখার নীচে দু'টি ধারাল চোখ। বিশাল একখানা বুকে অফুরন্ত শক্তি ও সাহসের ইঙ্গিত। রাজাসাহেবের কুপিত পেশীগুলো উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। ক্রুদ্ধ রাজাসাহেবকে দেখতে দেখতে দৃষ্টিটা মধুর আনন্দে ভরে যাচ্ছে শঙ্খিনীর। কী হিংস্র রাজাসাহেব অথচ কী সুন্দর!

ইতিমধ্যে ঘাগরার কোন গোপন ভাঁজ থেকে একটা আলাদ গোক্ষুরের বাচ্চা বার করে হাতের মুঠিতে তার ফণাটা চেপে ধরেছে আতরজান। সাপের চিকন দেহটা মণিবন্ধে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বলয় হয়ে রয়েছে। নির্মম চোখে রাজাসাহেবের দিকে তাকালো আতরজান। তারপর আচমকা, একান্তই আচমকা তার ঝলসানো মুখখানা থেকে একটি খরশান হাসি খল খল করে বেজে উঠল, "এই মাইয়াটারে চিনস রাজাসাহেব?" বলতে বলতে আলাদ গোক্ষুরের বাচ্চাটাকে দেখিয়ে দিল আতরজান, "এক্কেবারে জঙুলি সাপ, বিষদাঁত অখনও কামাইয়্যা দিই নাই। একটা ছোবল মারলে, বিষহরির বাঁজানের ক্ষ্যামতা নাই সেই বিষ উঠায়। খুব সাবধান। হিঃ-হিঃ-হিঃ—"

ওদিকে পলকপাতের মধ্যে কোমর থেকে একটা একহাত ছোরার ফলা সাঁ করে টেনে বার করেছে রাজাসাহেব। ঝকমকে ফলাটার ওপর মৃত্যু যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। কালনাগের মত হিস হিস করে উঠল রাজাসাহেব, "বেবাজিয়া মরদেরে আলাদ গোক্ষুরের ডর দেখাইস শয়তানের ছাও। এই ছোরা দেখছিস মাগী। এক্কেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় কইর‍্যা ফেলমু।"

পাটাতনের ওপর বসে বসে শঙ্খিনী ভাবছে, ঠিক এমনি হিংস্র ভঙ্গিতে

বিষহরির বিরুদ্ধে, আসমানীর কুটিল শাসনের বিরুদ্ধে, ঘর বাঁধার একটি মনোরম স্বপ্নের স্বপক্ষে যদি রাজাসাহেব একবার রুখে দাঁড়াতে পারত, তবে তাকে ঘিরে তার কামনা আর বাসনা, তার নীড়প্রেম চরিতার্থ হতে পারত। সার্থক হত নাগমতীর গৃহী পৃথিবীর কল্পনা।

আতরজানের মুঠি থেকে আলাদ গোক্ষুরের বাচ্চাটা জ্বল জ্বল চোখে তাকিয়ে রয়েছে। আতরজানের ঝলসানো মুখখানা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ওদিক থেকে এক হাত ছোরার ফলাটা নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে বাগিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে আসছে রাজাসাহেব। রাজাসাহেব আর আতরজান। বেদে-বহরের দুটি ভয়াল প্রতিপক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

ভয়ানক কিছু একটা ঘটে যেতে পারত। আলাদ গোক্ষুরের বাচ্চাটার বিষদাঁতের সোহাগে রাজাসাহেবের পুরো পাঁচ হাত সুগৌর দেহটা নীল হয়ে যেত; এক হাত ছোরার ফলাটা হয়ত আতরজানের হৃৎপিণ্ডটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করত। কিন্তু তার আগেই আম্মা আসমানীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে আলাদ গোক্ষুরের বিষদাঁতে আর এক হাত ছোরার ফলায় নির্মম মৃত্যুর শপথ বিচলিত হলো। বিভ্রান্ত হলো।

আসমানী ডাকছে, "এই রাজাসাহেব, এই ইবলিশের ছাও, গেলি কই?"

"যাইতে আছি আম্মা।" চমকে উঠল রাজাসাহেব। তারপর আতরজানের দিকে তাকিয়ে গর্জাল, "আম্মা ডাকতে আছে, খুব বাইচ্যা গেলি মাগী। না হইলে তুরে জানে খাইয়্যা ফেলতাম।"

ঝর ঝর বর্ষণের মধ্যে বাইরের পাটাতনে অদৃশ্য হয়ে গেল রাজাসাহেব।

চোখের মণিদুটো কপিশ অগ্নিকণা হয়ে জ্বলছিল আতরজানের। টেনে টেনে কদর্য গলায় সে বলল, "কার জান কে খায় দেখা যাইত। বান্দীর পুত রাজাসাহেবটা হামারে শাসাইতে আসে। শয়তানের ছাও, ইবলিশ—" একটি হিংস্র মনের উত্তেজনা ঝলসানো মুখে, আতরজানের কুপিত বুকে টগবগ করে ফুটতে লাগল যেন।

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই আবার সেই খরশান হাসিতে ভেঙে ভেঙে পড়ল আতরজান! হাসি নয়, যেন কোন প্রেতের গলা ককিয়ে ককিয়ে উঠছে, "উই শয়তান রাজাসাহেবটা খালি ওতে ওতে থাকে লো শঙ্খ। তুরে জবর পিরিত করে! কী, কথা কইস না ক্যান লো বান্দী?"

"পিরিত করে। অমন মহব্বতের ঠ্যালায় পরান হামার উথল-পাথল করে! কত যে পিরিত করে, সে তো আইজ বিহান বেলায় বুঝলাম। কইলাম, রাজাসাহেব তুই আর হামি এই বহর থিকা কুনো কিষাণী গেরামে গিয়া ঘর বান্ধি, হামাগো ছানাপোনা হইব। তা না, ইবশিলটা—" শঙ্খনীর কণ্ঠ থেকে বিন্দু বিন্দু বিরক্তি ঝরল।

রঙ্গভরা গলায় আতরজান বলল, "অ্যামুন মহব্বত যে তার ঠ্যালায় রাজাসাহেবরে নিয়া এই বহর থিকা ভাগবি? শাদি কইর‍্যা কিষাণীগো লাখান সোংসারী হবি। হায় মা বিষহরি—বাইদ্যানী মাগীর মহব্বতের রস দেখ মা—"

সাঁ করে ফণা তুলল শঙ্খিনী, "মহব্বতের কথা কইস না লো আতর ! তুর মুখে আঙ্গার পড়ব। মহব্বত ! হামার লেইগ্যা রাজাসাহেবের পরানে মহব্বত থাকলে—" বলতে বলতে থেমে গেল শঙ্খিনী।

"আইচ্ছা, আইচ্ছা, হামি আর কমু না মহব্বত-পিরিতের কথা। কিন্তুক তুরে যে আইজ উপাস দিবার লাগব ! আম্মায় কইছে।"

"হামি উপাস দিমু তো তুর পরান পোড়ে ক্যান ?" শঙ্খিনীর গলা থেকে আগুনের ফুলকি ঝরল।

"না, হামার পরান পুড়ব ক্যান ? হামি রাজাসাহেবেরে কইয়্যা দিমু দুইজনের ভাত গিলতে। ও খাইলে তুরও প্যাট ভইর‍্যা যাইব।" মর্ম জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে খরধার হাসি হাসল আতরজান।

খানিকটা সময়ের বিরতি। নিস্তব্ধ, নিস্তরঙ্গ সময়।

শিকারী বিড়ালের মত কপিশ চোখের মণিদুটো একবার চারিদিকে ঘুরপাক খাওয়াল আতরজান। নাঃ, ঘাসি নৌকার এই গর্ভলোকে সে আর শঙ্খিনী ছাড়া অন্য কেউ নেই। বিড়ালীর মত মসৃণ পা ফেলে ঝাঁপটার দিকে এগিয়ে গেল সে। পদক্ষেপে এতটুকু শব্দ নেই। ঝাঁপটা বন্ধ করে সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল আতরজান ; তারপর ঠোঁট দুটোর ওপর ডান হাতের তর্জনীটা রেখে হিস হিস করে উঠল, "চুপ—"

একটা কুটিল ইঙ্গিতে ইন্দ্রিয়গুলো সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল শঙ্খিনীর, "আবার —আবার—"

আতরজানের গলায় একটা শঙ্খনাগ যেন গর্জে উঠল, "চুপ, চিল্লাইলে এক্কেবারে জবাই করুম তুরে।"

বলতে বলতে ঘাগরার কোন এক গোপন ভাঁজে আলাদ গোক্ষুরের বাচ্চাটাকে লুকিয়ে একটা আধ হাত ছুরির ফলা টেনে বার করল। আধ হাত লম্বা ছুরির বাঁকা ফলা—ছুরি নয়, যেন অজগরের জিভ। আতরজানের ঝলসানো মুখে সেই কপিশ চোখের মণিদুটো হিংস্র উল্লাসে জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগল, "হিঃ-হিঃ-হিঃ—বেবাজিয়া পুরুষেরে দেখাইতে হয় সাপের ডর, আর বাইদ্যানী মাগীরে চাকুর ডর !" ছুরিটাকে সামনের দিকে ঘোরাতে ঘোরাতে আতরজান বলল, "এইবার চুপ মারবি তো নাগ ী ! হিঃ-হিঃ-হিঃ—"

ভাবলেশহীন চোখ। যেন কেউ ধুলো পড়া ছিটিয়ে দিয়েছে। সেই বোধহীন চোখের দৃষ্টি মেলে আতরজানের দিকে তাকিয়ে রইল শঙ্খিনী। ছুরির ঝকঝকে ফলাটা দেখতে দেখতে চেতনাটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আসছে তার।

"এই তো হামার নাগরী, তুর লগে শাদি বসনের মন লাগে। এক্কেবারে ঘরের জরুর লাখান মিঠা তুই। হিঃ-হিঃ-হিঃ—" বিকৃত মুখখানার ওপর হাসিটা ঝলসে ঝলসে বেড়াতে লাগল আতরজানের।

একপাশে সপ্তনাগের চূড়াচক্রে দেবী বিষহরির মূর্তি। মূর্তিটিকে পিছনে রেখে স্তূপাকার কাঁথাকানিগুলোর দিকে এগিয়ে গেল আতরজান। তারপর

হাতড়ে হাতড়ে ধূসর রঙের একটা বালিশ বের করে আনল। বালিশের প্রাথমিক রঙটি কি ছিল, তা আজ গবেষণার বিষয়। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই আতরজানের। বালিশের ওপর নির্মম হাতে ছুরির ফলাটা টেনে দিল সে। নীলচে তুলোর মধ্য থেকে উঁকি দিল একটি দেশী মদের বোতল। বেবাজিয়ারা বালিশ, তোষক—এমনি নানান গোপন জায়গায় বেআইনী মদ লুকিয়ে রাখে।

ক্ষিপ্র হাতে ঢাকনা খুলে ফেলল আতরজান ; তারপর গলার মধ্যে উপুড় করে দিল বোতলটা। তীক্ষ্ণ তরলধারা গলার সুড়ঙ্গ বেয়ে নামতে লাগল। আতরজানের শিরায় শিরায়, উত্তাল ধমনীতে প্রতিটি রক্তকণা দাউ দাউ অগ্নিকণা হয়ে জ্বলে উঠল। শিথিল মুঠি থেকে শূন্য মদের বোতলটা পাটাতনের ওপর লুটিয়ে পড়ল। নির্জলা মদ। নেশার প্রাথমিক আঘাতে স্নায়ুগুলো ঝন ঝন করে বেজে উঠলো তার।

শূন্য বোতলটার দিকে করুণ নজর ফেলে আতরজান বলল, "এক্কেবারে সাফা হইয়্যা গেছে লো শঙ্খ, এট্টা ফোঁটাও আর নাই। কী করুম হামি ? হামি এইবার কান্দুম কিন্তুক—"

বোতলটাকে হাতের থাবায় খুলে সশব্দে কয়েকটা চুমু খেল আতরজান। তারপর খিল খিল গলায় হাসতে হাসতে, ভেঙে ভেঙে, গলে গলে পাটাতনের ওপর আছড়ে পড়ল সে।

আতঙ্কিত গলায় শঙ্খিনী বলল, "অখনই আম্মা আইস্যা পড়তে পারে ! তুই যে কী করতে আছিস আতরজান !"

"অ্যাঁ—ঠিক কইছিস তুই।" উগ্র নেশাভরা দুটো চোখ মেলে তাকাল আতরজান। তারপর নরম গলায় বলল, "ওগো শঙ্খ, তুই হামার নাগরী—এই বোতলটায় জল ভইর‍্যা ঢাকনি আটকাইয়্যা দে। হামি আবার বালিশে ভইর‍্যা সিলাই কইর‍্যা রাখুম।"

"হামি পারুম না।" দুর্বিনীত ভঙ্গিতে তাকাল শঙ্খিনী।

"পারবি না! তুর সাত ভাতারে পারবো, সাত বাজানে পারবো—" পাটাতনের ওপর থেকে সেই ভয়াল ছুরির ফলাটা হাতের থাবায় তুলে আবার নাচাতে লাগল আতরজান।

আশ্চর্য এক কুহক! বিচিত্র ভোজবাজি! পলকপাতের মধ্যে বোতলটা তুলে নিয়ে বাইরের খালের জল দিয়ে ভর্তি করে আনল শঙ্খিনী।

ইতিমধ্যে সুঁচ আর সুতো নামিয়ে সেলাইয়ের আয়োজন করে বসেছে আতরজান। শঙ্খিনীর হাত থেকে বোতলটা নিতে নিতে আচমকা তার নেশা-লাল দৃষ্টিটা ঝাঁপের মুখে আটকে গেল। দেখতে দেখতে হাতপায়ের জোড়াগুলো শিথিল হয়ে আসছে, সমস্ত দেহ-মন থেকে চৈতন্য মুছে মুছে যেতে শুরু করেছে। নেশাময় চোখদুটো কেমন যেন স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে আতরজানের।

আশ্চর্য ! ঝাঁপের কাছে সেই সাঙ্ঘাতিক মুখ দুটো স্থির হয়ে রয়েছে।

দু’ জোড়া চোখ পাহাড়ী অজগরের মত ধকধক করে জ্বলছে। আম্মা আসমানী আর জুলফিকার। দুটো প্রেতদেহ। দুটো অপযোনি।

আসমানী গর্জে উঠল, “মনে করছিস, হামি ট্যার পামু না। বখিলের ছাও, আবার যে না কইয়্যা মদ গিলছিস! তুরে হামি কয়দিন নিষেধ কইর‍্যা দিছি লো বান্দীর বাচ্চা! তুর পেট ফাইড়্যা হামি মদ বাইর করমু।”

আতরজান কি জানত, এই বেবাজিয়া বহরের কোথায়, কোন্ গোপন অন্ধিসন্ধিতে কোন্ গোপনতম ঘটনাটি ঘটছে, সবই আম্মা আসমানীর প্রখর ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ে যায়। সহসা আর্তনাদ করে উঠল আতরজান, “আম্মা—আম্মা—আম্মা—”

মনে হয়, আসন্ন মৃত্যুর আতঙ্কে আতরজানের বিবর্ণ চোখ দুটো এখনি ছিটকে বেরিয়ে আসবে। ভয়ে, আশঙ্কায় হৃৎপিণ্ডের বাজনা থেমে থেমে আসছে তার। আবারও চেঁচিয়ে উঠল আতরজান, “আম্মা—আম্মা—”

“কাছিমের ছাও শুওর, আবার কথা কইস!” সাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল আসমানী, “জুলফিকার, কেয়াকাঁটা আর বোড়া সাপটা লইয়্যা আয়।” উত্তেজনায় গলার সরু সরু শিরাগুলি কাছির মত ফুলে ফুলে উঠলো আসমানীর।

জুলফিকার! একটা কালপুরুষের মত চেহারা। পাহাড়ের মত কর্কশ কালো দেহ। ভ্রূহীন রক্তাভ চোখ। কোমর থেকে জঙ্ঘা পর্যন্ত একটুকরো পিঙ্গল রঙের কাপড় ঝুলছে। কোমর-সন্ধিটাকে ঘিরে রেখেছে একটা মরা চন্দ্রবোড়ার দেহ। রক্তাভ চোখে নির্বোধ জিঘাংসা; মুলোর মত বড় বড় গজদাঁত, খাড়া খাড়া কয়েকগাছা পাটকিলে রঙের চুলে, বেঢপ কাঁধদুটোতে ভয়াল হিংস্রতা ছড়িয়ে রয়েছে। দেহের কালো রঙের সঙ্গে পিঙ্গল আবরণের একটা বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে। দু’পাশে মাথাটা হেলিয়ে একটা অতিকায় জানোয়ারের মত দুলতে দুলতে অদৃশ্য হয়ে গেল জুলফিকার।

একটু পরেই রয়নাবিবির খালের কিনারা থেকে কেয়াকাঁটা আর কাঁধের ওপর বিশাল একটি বোড়াসাপ সংগ্রহ করে শঙ্খনীদের নৌকার পাটাতনে চলে এলো জুলফিকার।

আচমকা এই ঘাসি নৌকা, এই রয়নাবিবির খাল, দূরের ঐ মেঘভরা আকাশকে বিদীর্ণ করে চেঁচিয়ে উঠল আতরজান, “হামি আর করমু না আম্মা, আর করমু না—”

নির্মম চোখে জুলফিকারের দিকে তাকাল আসমানী। নির্ভুল নির্দেশ। ঘাতনের অধিকার পাওয়া গিয়েছে। পাওয়া গিয়েছে হত্যার সনদ। জুলফিকারের আরক্তিম চোখে মশাল জ্বলে উঠল দপ্ করে। তার কণ্ঠে একটা শব্দের ঝড় তরঙ্গিত হতে লাগল, “গর্-র্-র্-র্—” উত্তেজনার মুহূর্তে কোন কথা বলে না জুলফিকার। শুধু ঐ হিংস্র আওয়াজটা বিচিত্র রেশে রেশে গলার মধ্যে কাঁপতে থাকে।

বাতাসের মধ্যে একটা গর্জন তুলে কেয়াকাঁটার ডালটা আতরজানের মুখের

ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর আবার। বার বার। অবিরাম। প্রথমে দু'টি দুর্বল বাহু তুলে ক্ষীণ একটু বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল আতরজান। কিন্তু আঘাতের পর আঘাতে মুহূর্তের মধ্যে সব প্রতিরোধ মুছে গেল আতরজানের বাহু থেকে। সারা দেহে কতকগুলি রক্তাক্ত রেখা ফুটে বেরুল। জুলফিকারের থাবার কেয়াকাঁটার শাখাটা ইতিমধ্যে রক্তস্নান করেছে।

গালের কষের ফাঁক দিয়ে জিভটাকে বের করে, নিরোম ভ্রূ দুটোকে চোখের ওপর নামিয়ে কেয়াশাখাটা আবার মাথার ওপর তুলেছিল জুলফিকার। আর একটি আঘাতের প্রস্তুতি।

আসমানী বলল, “এইবার থাম জুলফিকার—”

কেয়াশাখাটা চালাতে চালাতে কালো পাথরের মত নির্মম দেহটা বেয়ে দর দর ধারায় ঘাম নেমে আসছে জুলফিকারের। ভয়াল মুখখানায় পিশাচের ছায়া এসে পড়েছে তার।

পাটাতনের ওপর আতরজানের দেহটা থর থর করে কাঁপছে। নিথর দু'টি আঁখিতারা থেকে চেতনার সকল চিহ্ন মুছে গিয়েছে। কপাল, মুখ, বুক ফালা ফালা হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছে। কাঁচুলির বন্ধন খুলে রক্তকমলের মত বিক্ষত দু'টি তুঙ্গ বুক বেরিয়ে পড়েছে। নানা রঙের ঘাগরাটা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে।

এক পাশে একটা প্রায় নিশ্চিহ্ন বিন্দুর মত নিস্পন্দ হয়ে বসেছিল শঙ্খিনী। তার সমস্ত স্নায়ু, সকল অস্থিমজ্জা, দেহমনের সকল তন্ত্রী একটি দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে চমকে উঠছে। সম্ভব হলে মেদরক্তের এই বস্তুদেহটিকে বায়বীয় করে সে মিলিয়ে যেত।

এবার আসমানীর দৃষ্টিটা তির্যক্ রেখায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্খিনীর ওপর, “কী লো মাগী, তুর মনে না ঘরের সোহাগ! সোয়ামী-পুত্তুরের লেইগ্যা জবর পিরিত!” বলতে বলতেই গর্জে উঠল আসমানী, “জুলফিকার, মাগীর গায়ে বোড়া সাপটা ঘইষ্যা দে।”

জাফরানী রঙের চক্রকাটা বোড়া সাপের দেহ। নানা বর্ণের পিচ্ছিল আঁশগুলি চকচক করছে। অপক্ষ্ম চোখ দু'টি আশ্চর্য নিস্তেজ। জুলফিকার নিজের থাবার মধ্যে বোড়া সাপের দীর্ঘ শরীরটাকে তুলে নিল। তারপর শঙ্খিনীর বরতনুটিতে ঘষে ঘষে দিতে লাগল সেই শীতল নাগদেহ।

রক্তের কণায় কণায় একটা ঝড় যেন ভেঙে পড়ছে। হৃৎপিণ্ডটার মধ্য দিয়ে হিমধারা নামতে শুরু করেছে। ভয়ে, আতঙ্কে, অনিবার্য একটি অপঘাতের আশঙ্কায় আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল শঙ্খিনী, “আম্মা—আম্মা—হামি মইর্যা যামু—”

দু' পাটি মাড়িতে ধ্বংসাবশেষ কয়েকটি দাঁত। সেই দাঁতগুলো কড়মড় করে বেজে উঠল আসমানীর, “আহ্লাদী মাগীর—ঘরের আহ্লাদ! ক' দেখি বান্দীর ঝি, গা থিকা কীসের গোন্ধ বাইর হইতে আছে?”

“বোড়া সাপের!” আর্তনাদ করে উঠল শঙ্খিনী।

“ঘরের গোন্ধ ভাগছে গা থিকা ?” ক্রূর গলায় হুংকার দিল আসমানী।

“হ। আম্মা—আম্মা—হামারে ছাইড়্যা দে—”

“গর্-র্-র্-র্—” পৈশাচিক গর্জন উঠছে জুলফিকারের গলায়। নিরীহ একটি শিকারের উল্লাসে হাতের মুঠিতে কেয়াকাঁটার শাখাটা ঘন ঘন আন্দোলিত হচ্ছে। অনুগত একটি কুকুরের মত আসমানীর মুখের দিকে বার বার তাকাতে লাগল জুলফিকার। একটি মাত্র নির্দেশ। একটি মাত্র ইঙ্গিত ! পলকপাতের মধ্যেই তা হলে কেয়াকাঁটার শাখাটা ঝাঁপিয়ে পড়বে শঙ্খিনীর সরস আর দীঘল একটি বরদেহে।

জুলফিকারের দিকে একটিবারও ভ্রূপাত করল না আসমানী। তর্জনীটাকে সামনের দিকে প্রসারিত করে গর্জে উঠল সে, “গা থিকা ঘরের গোন্ধ তো গেছে ! মন থিকা যদি না গিয়া থাকে তো ক’। জুলফিকার আছে সামনে, উয়ার হাতে কেয়ার কাঁটা আছে। দাওয়াই দিয়া দিব।”

জুলফিকার ! নামটা কানের সুড়ঙ্গে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে হুংকার দিয়ে উঠল সে, “গর্-র্-র্-র্—”

তীক্ষ্ণ গলায় আসমানী বলল, “কি লো নচ্ছার মাগী, কথা কইস না ক্যান ? রাজাসাহেবের লগে পলাইয়্যা যাওনের বীজমন্তর পড় ! তামাম জন্মের মত বীজমন্তর পড়াইয়্যা ছাড়ুম। জুলফিকার !”

এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে জুলফিকার। এক হাতে কেয়াশাখার নিষ্ঠুর শাসন, আর এক হাতে বোড়া সাপের চক্রকাটা দীর্ঘ দেহ। ঐ কেয়াশাখায় কী নাগদেহে এতটুকু মায়া নেই এতটুকু প্রশ্রয় নেই। বিশাল পৃথিবীর কোথায়ও ফেরারী হয়ে বনস্পতির ছায়াতলে নীড় রচনার এতটুকু স্নেহও সেখানে অনুপস্থিত। এই বেদেবহর থেকে কোনক্রমেই পলাতক হতে দেওয়া যবে না নাগমতী বেদেনীকে।

আর্ত গলায় শঙ্খিনী বলল, “না, না, হামি আর কুনোদিনই ঘর চামু না লো আম্মা। কুনোদিনই না। হামারে তুই মারিস না, হামার গায়ে সাপ ঘইষ্যা দিস না।”

একটি প্রেতকণ্ঠ। ফিক ফিক শব্দে হেসে উঠল আসমানী, “ইয়ারেই কয় দাওয়াই। হিঃ-হিঃ-হিঃ, মাইর দিলে আর গায়ে সাপ ঘষলে পেত্নীর মির্গী (মৃগী) ব্যারাম সাইর‍্যা যায়। আর তুই তো এট্টা মানুষের ছাও। তুই জবর ভালো লো শঙ্খিনী : ঘর যখন চাইস, এট্টা পুরুষের লেইগ্যা যখন পরানটা ফাকুর-ফুকুর করে তুর, শাদী তখন তুর হামি দিমুই। এট্টা কালনাগের লগে তুর শাদী দিমু। হিঃ-হিঃ-হিঃ—”

অন্তরঙ্গ হয়ে এগিয়ে এলো আসমানী। তারপর শঙ্খিনীর নরম নিটোল দু’টি গালে কঙ্কালবাহু বিছিয়ে দিল, “আইজ তুরে শুট্‌কি (ভাত না দিয়ে শুকাবো) দিমু। ভাত প্যাটে না পড়লে সোয়ামী আর ঘরের খুয়াব আসমানের পঙ্খী হইয়া উড়াল দিব।” বলতে বলতে মাথাটাকে বঁড়শীর মত নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিল আসমানী ; তারপর ফাটা ফাটা দু’টি ঠোঁট

শঙ্খিনীর গালে ঠেকিয়ে চুমু দিল। খানিকটা রক্তাভ লালা সারা মুখেচোখে ছিটিয়ে গেল শঙ্খিনীর। তারপর আসমানী আবার বলল, "এক চুমা দিয়া গেলাম। এই চুমা খাইয়া আইজ থাকিব। তুরা যেমুন বখিল, আইজ তুগো তেমুন ভাত নাই। খাড়, এই পেত্নীটারেও এট্টা চুমা দেই।"

আতরজানের রক্তাক্ত মুখখানার ওপরও একটি চুমু আর খানিকটা লালা উপহার দিয়ে উঠে দাঁড়াল আসমানী, "এই জুলফিকার, এইবার বাইরে আয়।"

আসমানীর এই নির্দেশে খুশী হতে পারলো না জুলফিকার। হত্যার নেশায় পেয়েছিল তাকে। হিংস্র দৃষ্টি থেকে বিরক্তি ঠিকরে বেরুল তার। এই দৃষ্টিটা কী এক অজানা আশঙ্কায় আসমানীর হিসাবহীন বয়সের দেহমনে কী এক শিহরন তুলে যায়। এই জুলফিকারের দিকে তাকালে মনে হয়, একটি ক্ষুধিত শ্বাপদকে তার শিকারের সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আচমকা সেই দিনটির কথা মনে পড়ল আসমানীর। সেই দিনটি, যেদিন প্রথম এই বেবাজিয়া বহরে সে নিয়ে এসেছিল জুলফিকারকে। আবারও চমকে উঠল আসমানী।

হাত দুটি ধরে ত্রস্তে জুলফিকারকে বাইরে টেনে আনল আসমানী। তারপরেই ঝাঁপটা কঠিন হাতে টেনে তালা বন্ধ করে দিল। ঘাসি নৌকার গর্ভলোকে নিরুপায় আক্রোশ নিয়ে বন্দী হয়ে রইল আতরজান আর শঙ্খিনী! বন্দী হয়ে রইল দুটি যাযাবরীর অসহায় বঞ্চনা। তাদের দুটি দেহে নির্যাতনের স্বাক্ষর এঁকে দিয়েছে এই বেদেবহর। এই বেবাজিয়া জীবন তাদের দুটি মনকে বিক্ষত করেছে।

এই অপঘাত থেকে, এই তিল তিল মৃত্যুর সীমানা থেকে, দেহমন, অস্থিমজ্জার এই গোরস্থান থেকে মুক্তির সমুদ্রবাতাস কতদূরে? কত ব্যবধান পাড়ি দিয়ে, কত পল-প্রহর-ক্লান্তি উজিয়ে সেই জ্বালাহর শান্তির পৃথিবীতে পৌঁছান যাবে?

চার

এতক্ষণ ধরে আকাশের কোন নেপথ্য থেকে এক তীরন্দাজ রাশি রাশি বৃষ্টির তীর ছুঁড়ছিল। এইমাত্র সেই শরবর্ষণ ক্ষান্ত হলো।

রয়নাবিবির খালের সেই বেদে-বহর থেকে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে রক্তের কণিকাগুলি দ্রুত লয়ে বেজে বেজে উঠল মহব্বতের। হৃৎপিণ্ডটা দুরু দুরু করে দুলল। শ্রাবণ দিনের বেলার পরমায়ু এখন দু প্রহর পেরিয়ে গিয়েছে।

রয়নাবিবির খালটা দুপুরের রোদে বিশাল একটি পদ্মরাগ মণির মত জ্বলছে।

বড় ভুঁইয়া একবার টের পেলে নির্ঘাৎ কয়েকজোড়া পয়জার (জুতো) ভাঙবেন পিঠে। ভাবতে ভাবতে মহব্বতের চেতনাটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে গেল।

কাল ইদিলপুরের বন্দর থেকে ফেরার পথ মৃদু একটু জ্বর হয়েছিল। সেই জ্বরটাই ধীরে ধীরে উগ্র হয়ে প্রখর হয়ে সারা দেহে রাজত্ব করেছে। একেবারে মাঝ রাত্রি পর্যন্ত। পেশীগুলো, শরীরের গ্রন্থি আর মেদমজ্জা কেমন যেন শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তাই নিশি রাত্তিরে ঠিকমত উঠতে পারে নি মহব্বত। বিছানাটা শতবাহু দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল। তারপর মোরগের গলায় গলায় সূর্যবন্দনা শেষ হবার অনেক পরে, ক্যাঁচা বাঁশের মাচা থেকে উঠে কী এক খেয়ালে ধানবনের দিকে চলে গিয়েছিল মহব্বত। হাতের থাবায় ছিল ধারালো কোঁচের ফলা, আর শাণিত দুটি চোখে বর্ষার মাছের সন্ধান।

আশ্চর্য! সেই বেবাজিয়া বহরটা চেতনার মধ্যে দোল খেয়ে যায়। বার বার। ঘন ঘন। আর মনের পর্দায় একটি প্রতিচ্ছায়া তীক্ষ্ণ রঙে রঙে ফুটে ওঠে। হাজারমণী একটি ঘাসি নৌকা। তার অগুন্ঠিত পাটাতনে এক রমণীয় বেদেনীতনু। শঙ্খিনী। শঙ্খিনীর খিল খিল হাসি, তীক্ষ্ণ কৌতুক তার কোঁচের ফলাটা থেকেও অনেক, অনেক বেশী খরধার।

আরও একটি ভাবনা মহব্বতের মনে ছল ছল করে। বেদেনী—রঙ্গরস নিয়ে যায় বাণিজ্য, আচমকা তার কণ্ঠে কী এক ছায়া নেমে এসেছিল; কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল দৃষ্টিটা। ঘর-বউ-সন্তানের স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা একটি সুন্দর, একটি মনোরম পৃথিবীর সংবাদ দিয়েছিল বেদেনী। মহব্বতের তরুণ চেতনা শুনতে শুনতে কেমন যেন সুরভিত হয়ে গিয়েছিল।

কোষাডিঙিটা চালাতে চালাতে বিড় বিড় করে উঠল মহব্বত, "কবে শালায় যাইতাম গিয়া দুই চোখ যেইদিকে যায়, সেইদিকে। ভুঁইয়া সুমুন্দির পুতের মাইর আর খাওন যায়! এইখান থিকা যামু একদিন ভাইগ্যা।"

ডিঙিটাকে খালের পারে একটি ছৈতানের শাখায় কাছি দিয়ে বাঁধল মহব্বত। তারপরেই শিথিল পদক্ষেপে রয়নাবিবির খালে গিয়ে নামল।

কাল দুপুরে স্রোতের গতিমুখে 'চাই' (মাছ ধরবার যন্ত্র) আর 'বেনা' (বেড়া) পেতে গিয়েছিল মহব্বত। শ্রাবণের খাল এখানে গভীর গহীন। এখানে বাঁও মেলে না। স্বচ্ছ আয়নার মত টলটলে জল। খালে নেমেই চমকে উঠল মহব্বত।

'চাই'-এর গর্ভে মাছ নেই। নেই একটি রুপালী আভাসও। তবে কী—তবে কী—চেতনাটা নাগরদোলার মত বন্ বন্ পাক খেয়ে গেল একবার। তারপরেই খালের জলে ডুব দিল মহব্বত। তিন তিনটে অতিকায় 'চাই' তুলে মাত্র চারটে ভাউস মাছ পাওয়া গেল।

আবারও ভুস্ করে ডুব দিল মহব্বত। বর্ষার খাল সচকিত হয়ে উঠল।

নিঃশ্বাসটা বুকের মধ্যে বন্দী করে রাখতে কেমন যেন কষ্ট হয়, পাঁজরে পাঁজরে হাঁপানির দোলা কাঁকিয়ে বেড়ায়।

আকাশ এখানে নিরাবরণ। আর তারই নীচে রয়নাবিবির খালের এই গভীর অতলে শ্রাবণ শেষের দিনগুলিতে পৌষের হিম যেন সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে।

আরও চারটে 'চাই' পারের শ্যামা-ঘাসের ওপর তুলে আনল মহব্বত। কিন্তু দু'টি কুঁচিলা সাপ, চারটে গজার মাছ, আর গোটা তিরিশেক অতিকায় শামুক ছাড়া আর কিছুই উপহার পাওয়া গেল না সেগুলোর মধ্যে থেকে।

এতক্ষণ শীতে কুঁকড়ে আসছিল মহব্বতের দেহ। এখন সেই দেহ বেয়ে বেয়ে দর দর ধারায় কালঘাম ছুটল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বড় ভুঁইয়ার হুকুমটা চেতনার মধ্যে চমকে উঠল। কাল ইদিলপুরের বন্দর থেকে ফিরবার পথে তীক্ষ্ণ দাড়ি তোয়াজ করতে করতে বড় ভুঁইয়া হুংকার ছেড়েছিলেন, "মধ্যি রাইতে উইঠ্যা 'চাই'-এর মাছ তুলবি। তা না হইলে চুরি যাইব। তারপর তিন প্রহর বেলার মধ্যে লবণ ইলিশের মাছকাটা শ্যাষ করবি। না হইলে পয়জার (জুতা) মাইর‍্যা পিঠের বাকলা (ছাল) তুইল্যা ফেলামু। মনে থাকে যেন—"

বড় ভুঁইয়ার গর্জনের নেপথ্য অখণ্ড যুক্তি আছে। মাঝ রাত্রে 'চাই'-এর মাছ না তুললে রীতিমত চুরি যায়। কিন্তু কাল রাত্রির জ্বরটা উগ্র হয়ে এই বিপর্যয় ঘটিয়ে দিয়েছে। আর শঙ্খিনী নামে একটি সুন্দর বরতনু মহব্বতের তরুণ চোখকে বিস্ময় আর বিচিত্র আবেশে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। সেই বিস্ময় আর আবেশ অনেকটা সময়কে বিমোহিত করে রেখেছিল। কাল রাত্রির নিটোল একটি ঘুম, আর শঙ্খিনী নামে একটি দুর্ঘটনার জন্যেই বোধ হয় 'চাই'-এর মাছগুলি বেমালুম উধাও হয়ে গিয়েছে। একটি উথল-পাথল কান্নায় শতখান হয়ে ভেঙে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে মহব্বতের। সহসা আর একবার চমকে উঠল মহব্বত। সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়ল, লবণ ইলিশের জন্য একটি মাছও কাটা হয় নি।

সব মিলিয়ে আটটা 'চাই' তুলেছে মহব্বত। খরদীপ্ত দুপুরের দিকে তাকিয়ে হৃৎপিণ্ডটা শিউরে উঠল তার। তার পরেই রয়নাবিবির খালটাকে আলোড়িত করে আবার ডুব দিল সে।

আর উঠেই খালের পাড়ে জিন দর্শন হলো তার। শ্রাবণের এই সোনালী রোদের, এই কাজল মেঘের আকাশ থেকে একটা ইবলিশ যেন নেমে এসেছে। একেবারে সরাসরি। বড় ভুঁইয়া সাহেব!

সেই ডোরাকাটা বাদশাহী লুঙ্গি, চোখের কোলে সুর্মার সেই সতর্ক রেখা, ময়না কাঁটার মত তীক্ষ্ণ দাড়ি, দুটি ছোট ছোট চোখে দপ্ দপ্ সন্ধানী আলো—সব মিলিয়ে একটা আদিম আতঙ্ক যেন শ্যামা-ঘাসের জাজিমে মূর্তি ধরেছে।

আরো নিঃসন্দেহ হলো মহব্বত। বড় ভুঁইয়া সাহেব গর্জন করে উঠলেন, "কী রে সুমুন্দির পুত, আমারে দ্যাখস নাই কোনদিন? কাছিমের ছাও, শুওর। তোরে যে মধ্যি রাইতে উইঠ্যা 'চাই'-এর মাছ তুলতে কইছিলাম। সেই মাছ তুলতে এই দুফার বেলায় আইছিস?"

এতক্ষণ বড় ভুঁইয়ার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল মহব্বত। একেবারেই নির্নিমেষ দৃষ্টিটা যেন তার অপক্ষ্ম। এবার আর্তনাদ করে উঠলো সে,

“আইজ্ঞা—আইজ্ঞা—জ্বর আইছিল রাইতে। সেই লেইগ্যা—”

“জ্বর আইছিল! হারামজাদার বাচ্চা, মিছা কথা কইস! সেই লবণ ইলশার মাছ কাটছিস?” তীক্ষ্ম দাড়ির আড়ালে অসমান দাঁতগুলি কড়মড় করে বেজে উঠল বড় ভুঁইয়ার, “সকালে উইঠ্যা গেছিলি কোথায়?”

“আইজ্ঞা—আইজ্ঞা—”

“উইঠ্যা আয়—আয় শিগ্গীর—তোর জ্বর আমি সারাইয়্যা দেই, আর যাতে কোন সময়ে না আসে!” কণ্ঠটা নির্মম শোনাল বড় ভুঁইয়ার।

রয়নাবিবির খালটাকে মৃদু মৃদু দুলিয়ে পাড়ে উঠে এলো মহব্বত! আর সঙ্গে সঙ্গেই পা থেকে জরিদার পয়জার খুলে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন বড় ভুঁইয়া।

নিরীহ দেহের ওপর একটির পর একটি আঘাত নামল। অনেক, অজস্র। দাঁতের ওপর দাঁত চেপে, সারা দেহের পেশীগুলিকে কঠিন করে দাঁড়িয়ে রইল মহব্বত। তার জিভে এতটুকু প্রতিবাদ নেই, দুটি বাহুতে নেই বিন্দুমাত্র প্রতিরোধের আভাস।

জরিদার জুতো চালাতে চালাতেই হুঙ্কার ছাড়লেন বড় ভুঁইয়া, “হারামজাদা, বান্দা হইয়্যা একেবারে বাদশাজাদা বইন্যা গেছ!”

চেতনাটা কেমন একটু চমকে উঠল। বাদশাজাদা! মহব্বত ভাবল, জীবনে আজ প্রথম ঐ নামেই ডেকেছে একজন। বেবাজিয়া বহরের শঙ্খিনী। এত আঘাতের মধ্যেও ঐ শব্দটি কানের ওপর গানের দোলা দিয়ে গেল মহব্বতের। তাকে বাদশাজাদার মর্যাদা দিয়েছে শাঙ্খনা। কোথায়, কোন্ এক দুনিয়ায় তার জন্যে সিংহাসন পাতা রয়েছে, রয়েছে বিশাল এক সাম্রাজ্য। সেই ঠিকানাহীন দুনিয়ার নিশানাটা এখনও জানা হয় নি মহব্বতের। তবে কী—তবে কী—

এতক্ষণে মহব্বতের পিঠটা রক্তজবার মত লাল টকটকে হয়ে গিয়েছে।

পয়জার চালাতে চালাতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন বড় ভুঁইয়া, “‘ক’ কাছিমের ছাও, শুওর! সকালে উইঠ্যা গেছিলি কই?”

রুদ্ধশ্বাস গলায় মহব্বত বলল, “আইজ্ঞা, মাছ মারতে গেছিলাম।”

“মাছ কই?”

“আইজ্ঞ—ভুঁইয়া সাহেব, মাছ পাই নাই। খালের ঐ কিনারে বেবাজিয়ারা আইছে। তাগো বহরে গেছিলাম।” স্তিমিত গলায় বলল মহব্বত। বেদে-বহরের সংবাদটা বড় ভুঁইয়াকে দেবার কণামাত্র উৎসাহ ছিল না; কিন্তু নিজেরই অজান্তে কথাগুলো ফস্ করে বেরিয়ে এসেছে তার।

“বেবাজিয়ারা আইছে!” স্বগতর মত শোনাল বড় ভুঁইয়ার গলা। এই মুহূর্তে তাঁর দুটি সুর্মা-আঁকা চোখ থেকে বীররস মুছে গেল। বেদেবহর! স্বপ্নের মত একটি নাম। ডানাকাটা হুরীদের এক কুহকিত সীমানা। বিচিত্র হাসিতে মুখখানা ভরে গেল বড় ভুঁইয়ার।

কয়েকটা মুহূর্ত একটি সরস আবেশের মধ্য দিয়ে দোল খেতে খেতে উধাও

হয়েছিল। বড় ভুঁইয়া সাহেব আবার গর্জন করে উঠলেন, "যা কাছিমের ছাও, শুওর, বিকালের মধ্যে লবণ ইলশার মাছ কাটা শ্যাষ করবি। তা না হইলে একেবারে জবাই করুম। মনে থাকে যেন—"

খুন। এই পবিত্র কাজটি বড় ভুঁইয়া সাহেব বেমালুম করে বসতে পারেন! নিতান্ত অবলীলাক্রমেই। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই মহব্বতের।

এক সময় দূরের হিউলি ঝোপটার আড়ালে কখন যে বড় ভুঁইয়ার বাদশাহী লুঙ্গিটা অদৃশ্য হয়েছিল, এতক্ষণ খেয়াল ছিল না মহব্বতের।

আচমকা সামনের অর্জুন-শাখা থেকে কয়েকটা শংখচিল তীক্ষ্ম গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "ট্রি—ট্টি—ট্টিট্টি—ট্টি—ট্টি—"

ত্রস্তে বয়নাবিবির খালে নেমে গেল মহব্বত। এখন বারো হাত জলের অতল তলায় চার গণ্ডা 'চাই' নতুন করে পাততে হবে।

'চাই' পেতে দক্ষিণের উঠানে এসে বসল মহব্বত। আরও কয়েকজন বান্দা বঁটি নিয়ে বসেছে চক্রাকারে। লবণ ইলিশের জন্য মাছ কাটতে হবে। অজস্র নতুন হাঁড়ি ছত্রখান হয়ে রয়েছে উঠানে। ইলিশ মাছ লবণে মাখিয়ে চালান করা হয় দূরের শহরে-বন্দরে। বড় ভুঁইয়ার এই লবণ ইলিশের কারবার সারা জল-বাঙলায় ছড়িয়ে রয়েছে। ফলাও বাণিজ্য। তালতলা, মীরকাদিম, সিরাজদীয়া, গোয়ালন্দ—এই জলের দেশের নানা দিগন্ত থেকে নানা রঙের বাদাম উড়িয়ে আসতে থাকবে ব্যাপারী নৌকার মিছিল। দরে দামে, নানা কণ্ঠের সোরগোলে এই দক্ষিণের উঠান চকিত হয়ে উঠবে। আর রুপালী পুলকে মুঠি ভরে উঠবে বড় ভুঁইয়ার, তীক্ষ্ম দাড়ির প্রান্তে, সুর্মাচোখে একটি মোহন হাসি আঠার মত জড়িয়ে থাকবে।

ইলিশ মাছের উগ্র গন্ধে শ্রাবণের বাতাস মন্থর হয়ে উঠেছে। স্নায়ুগুলো কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে আসছে মহব্বতের।

এর মধ্যে বার দশেক এসেছেন বড় ভুঁইয়া। দু চোখের মণিতে সন্ধানী আলো জ্বালিয়ে তদারক করে গিয়েছেন কাজকর্মের। বান্দাগুলো একটি অনুপলও যাতে ফাঁক দিতে না পারে। শ্রাবণদিনের এই ব্যাপার-বাণিজ্যের উপর সারা বছরের আর্থিক স্বচ্ছলতা নির্ভর করছে। আর সেই স্বচ্ছলতার উপর নির্ভর করছে সকল সৌখিন আনন্দ, আইনী আর বে-আইনী সব খেয়াল-খুশী। নতুন বিবি বায়না করতে হবে, সাভার কী রসুনিয়ায় যে সব বন্দর-কন্যারা সারা দেহে রূপ আর যৌবনের প্রলোভন জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে কামনাকে উত্তেজিত করে তোলে, সেই রূপ আর যৌবনের বাতাসে উড়িয়ে দিতে হবে মুঠো মুঠো করকরে নোট। অতএব, অতএব—নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসতটুকু যাতে না পায় বান্দারা।

বার বার গর্জে উঠছেন বড় ভুঁইয়া, "এই, এই সুমুন্দির পুতেরা, কাম থুইয়্যা ফুসুর-ফুসুর আড্ডা জমাইছিস! একেবারে জানে খাইয়্যা ফেলুম।"

মাঝখানে মুহূর্তের যতিপাত। এক সানকি রাঙা আউশের ভাত আর

রসুনের ছালুন খেতে যখন মহব্বত উঠেছিল, তখন আকাশে আকাশে ধূপছায়া সন্ধ্যা ছড়িয়ে পড়েছিল।

অনেকটা রাত্রি পার হয়ে গিয়েছে। রক্তের কণায় কণায় ঝড় যেন ভেঙে পড়ল। মহব্বতের জ্বর আসছে। ইন্দ্রিয়গুলোকে দলিত করে সেই জ্বর মাতামাতি শুরু করে দিয়েছে। ছেঁড়া কাঁথাকানির নীচে থরথর করে পাথর-পেশী দেহটা এখন কাঁপছে মহব্বতের। ইলিশ মাছের উগ্র গন্ধে সারাদিন স্নায়ুগুলো অসাড় হয়ে ছিল। দুপুরবেলা বড় ভুঁইয়া জমিদার পয়জার (জুতো) দিয়ে পিঠের উপর সোহাগ করেছিলেন। এখন, শ্রাবণ রাত্রির এই নিবিড় অন্ধকারে সেই রক্তাক্ত সোহাগের চিহ্নগুলি জ্বালা ছড়িয়ে দিল।

বাদশাজাদা! আচমকা একান্তই আচমকা চেতনার উপর একটি মুখের ছায়া এসে পড়ল। সে মুখ শঙ্খিনীর! রয়নাবিবির খালের বেদেবহরে সেই অপরূপ নাগ-কন্যাকে দেখে এসেছে মহব্বত।

ঘর-জরু-সন্তান! সতের বন্দের সুন্দর একটি ঘর, সেই ঘরের চালে চালে লাউলতার আলপনা। সামনে ঝকমকে নিকানো একটি অঙ্গন! একটি শ্রীময়ী নারী। সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য স্বপ্নময় পৃথিবীর সন্ধান দিয়েছিল বেদেনী। আর আবিষ্ট কণ্ঠে তাকে বাদশাজাদার গৌরব দিয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে তার এই জ্বরদগ্ধ দেহ, তার বিক্ষত পিঠ যদি দেখত নাগমতী বেদের মেয়ে, তার এই অগৌরবের বান্দা জীবন যদি নজরে পড়ত শঙ্খিনীর? না, না, সে কথা ভাবতে পারছে না মহব্বত। বাইশ বছরের বন্দী জীবন। বান্দা জীবন। এই হতমান জীবনে কোন গৌরব নেই, কোন গর্ব নেই। একটি দুঃসহ বেদনা, রাশি রাশি অপমান আর পরাজয় ছাড়া এ জীবনে কোন সুখের সঙ্কেত নেই, নেই কোন আনন্দের সঞ্চার। বাইশ বছরের তরুণ স্মৃতিতে এমন একটি মানুষের ছায়া নেই, যার কণ্ঠে সোহাগ আছে, যার চোখে বিন্দুমাত্র স্নেহের আভাস রয়েছে। জীবন থেকে কবে, কোন্‌দিন স্নেহ-সোহাগ-ভালবাসা নির্বাসিত হলো? বেদেনীর সেই সুন্দর কথাগুলি আর সেই ঘর-জরু-সন্তানের পরম রমণীয় স্বপ্নের আয়নায় একটি অস্বচ্ছ প্রতিচ্ছায়া এসে পড়ল। তার মা নজিমা।

রাশি রাশি স্নেহ আর সোহাগ, মমতা আর করুণা মেদ-মজ্জার একটি শরীরে, একটি ছোট্ট নিরাকার মনে ধারণ করে যে মূর্তিটি মহব্বতের চেতনায় এই মুহূর্তে এসে দাঁড়াল, সে তার মা নজিমা। অনেক, অনেকদিন পর শ্রাবণের এই প্রথম রাত্রিতে ধূসর একটা স্মৃতির ওপর থেকে নজিমা যেন কথা কয়ে উঠল। অনেক দিন? কতদিন আগে? মহব্বতের বয়স তখন আট বছর।

প্রথম ভোরের ছায়া ছায়া আকাশের মত প্রথম কৈশোরের অস্বচ্ছ দিনগুলি স্নায়ুতে স্নায়ুতে এখনও দোল খায়। সে সকল দিনে দু'টি বাহু বিস্তার করে বার বার নজিমা আড়াল করে রেখেছে মহব্বতকে! বড় ভুঁইয়ার সকল আঘাত কী বিবিজানদের নির্যাতন থেকে সরিয়ে পরম মমতায় তাকে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে! বান্দা আর বাঁদীর জীবনে পৃথিবী বড় নির্মম। ভয়ানক

নিষ্ঠুর। প্রতিকূল দুনিয়ার সকল পীড়ন নিজের দেহ পেতে নিয়েছে নজিমা। মহব্বতের চারপাশে একটি নিরাপদ দুর্গের মত ঘিরে ছিল নজিমা। মহব্বতের আট বছরের নধর দেহটাকে বড় ভুঁইয়ার জরিদার পয়জার আর বিবিজানদের চাবুক থেকে অনেক, অনেক দূরের নির্বিপদ সীমানায় সরিয়ে রেখেছিল। তার দেহে এতটুকু আঘাত লাগতে দেয় নি। তার মনে এতটুকু বেদনা বাজতে দেয় নি নজিমা।

নজিমার কথাগুলি এই শ্রাবণ রাত্রিতে ইন্দ্রিয়ের তারে তারে যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, "বড় হইলে যেমুন কইর‍্যা হউক এইখান থিকা পলাইয়্যা যাইস মহব্বইত্যা। না হইলে আমার লাখান (মত) তোরেও মাইর‍্যা ফেলব বড় ভুঁইয়া। এই বান্দা হইয়া থাকনের থিকা কোনখানে গিয়া ঘর বান্ধিস। শাদী করিস।"

আশ্চর্য! আজ দুপুরে বেদেনীর গলায় নজিমার কথাগুলিরই প্রতিধ্বনি বেজেছিল। সহসা, একান্তই সহসা, শ্রাবণের এই প্রথম রাত্রিতে নতুন পরিচয়ের সেই নাগমতী মেয়েকে বড় অন্তরঙ্গ মনে হলো মহব্বতের।

"আমার লাখান (মত) তোরেও মাইর‍্যা ফেলব বড় ভুঁইয়া।" ঘুরে ঘুরে নজিমার সেই কথাগুলো মহব্বতের কানের উপর চক্র দিয়ে ফিরছে।

জীবন্ত মানুষটা সেদিন অমন কথা বলত কেন? কই, তার মা তো তখনও মারা যায় নি। দুটো বিবর্ণ চোখের দৃষ্টি ফেলে নজিমার দিকে তাকিয়ে থাকত মহব্বত।

মনে আছে, সে বছর ভয়াল তুফান উঠল মেঘনায়, রাশি রাশি ঢেউ প্রচণ্ড আক্রোশে আছড়ে পড়ল পারের ভূখণ্ডে। মাতলা ঝড়ের মুখে মুখে উড়ে গেল ধাওরাদের টিনের চাল, নিকারীদের ডোল ঘর। ছত্রখান হয়ে গেল ছৈতানের অরণ্য, বনহিজল আর রক্তমাদারের সারি উপড়ে গিয়ে পড়ল নয়নাবিবির খালে। সোঁ সোঁ ঝড়ে আর হু-হু তুফানে সে বছর শুধু সংহার, শুধু মৃত্যু আর প্রলয়ের ঘোষণা।

সে বছরই কালাজ্বরে মরেছিল নজিমা। আর সেই থেকে এই অগৌরবের জীবন শুরু হলো মহব্বতের। শুরু হলো করুণাহীন, স্নেহহীন এক বান্দা-জীবন।

ভুঁইয়া বাড়ি, নানান শরিক। প্রাচীন একটি বংশীবটের মত নানান মানুষের শাখায় শাখায় শিকড়ে শিকড়ে প্রসারিত। সেই বংশীবটের দেহে একটি শীর্ণ পরগাছার মত জড়িয়ে রইল মহব্বত। আর সেদিন থেকেই তার পিঠে বড় ভুঁইয়ার পয়জার পড়ছে অবিরাম। সেদিন থেকে তার মেরুদণ্ডে বিবিজানদের চাবুক ভেঙেছে অবিশ্রাম। সারা দেহে বড় ভুঁইয়া আর বিবিজানদের সোহাগগুলি শিলালিপির মত চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

আরও একটু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই রয়নাবিবির খাল, দূরের আকাশ, সেই আকাশে খণ্ডছিন্ন মেঘমালা, হিজলবন কী লাটাঝোপকে যখন ভাল লাগছিল মহব্বতের, কিশোর মনে একটি অস্ফুট চেতনার অঙ্কুর যখন স্পষ্ট

হয়ে উঠেছিল, একটি অপরূপ ভালবাসার আমোদে এই জলের দেশ যখন সুন্দর হয়ে ধরা দিয়েছিল, ঠিক তখনই একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানিতে ইন্দ্রিয়গুলো অসাড় হয়ে গিয়েছিল তার। সেদিন সে প্রথম শুনেছিল, বড় ভুঁইয়া সাহেবের নানা তার মা নজিমাকে সাভার থেকে তিন টাকা ছ' পয়সা দিয়ে কিনে এনেছিল।

দোচালা ঘরখানার পাশেই মানকচুর জঙ্গল। নতুন বর্ষার সজল সোহাগে নিবিড় হয়ে উঠেছে। সেখান থেকে এক ঝাঁক শিয়াল ডেকে উঠল, 'হুক্ক-হুয়া —হুক্কা-হুয়া—"

চমকে উঠল মহব্বত। অনেকটা রাত্রি পার হয়ে গিয়েছে। শিয়ালের গলায় গলায় এখন ত্রিযামা রাত্রির ঘোষণা। এতক্ষণ সমস্ত দেহে জ্বরটা অবাধে রাজত্ব করছিল। এখন সেই জ্বরের উত্তাপ শরীর থেকে মুছে গিয়েছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে বেরিয়েছে মুখেচোখে।

কিন্তু কোনদিকে কণামাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই মহব্বতের। এই মুহূর্তে তার সামনে একটি আবছায়া অতীত আর একটি স্পষ্ট বর্তমান দু'টি নারীদেহে মূর্তি ধরেছে। নজিমা আর শঙ্খিনী। দু'জনেই এক সংবাদ, এক মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছে তার জীবনে।

চেতনার উপর দিয়ে রাশি রাশি পতঙ্গ হয়ে অনেকগুলো দিন উড়ে গেল। তারপরেই এক জায়গায় এসে আচমকা থমকে গেল মহব্বত।

পনের বছর বয়স তখন মহব্বতের। আশ্বিনের এক বিকেলে কোষাডিঙি নিয়ে ইদলপুরের বন্দর থেকে ফিরছিল সে। রয়নাবিবির খালের দূর বাঁকে আসতেই সামনের খাড়ি থেকে একটা এক মাল্লাই কেরায়া নৌকা সাঁ করে বেরিয়ে এসেছিল। কেরায়া নৌকা, মাঝখানে ছই-এর ঘেরাটোপ। সেই নৌকা থেকে কেরায়া মাঝি কিতাব্দী মৃধার কথাগুলো বল্লমের ফলার মত যেন ছুটে এসেছিল। তাদের ছোট্ট কৃষাণী গ্রাম নাগরপুরের দেবেন পালকে কিতাব্দী বলছিল, "বুঝলা নি দেবেন্দর ভাই, আমাগো ভুঁইয়া বাড়ির ঐ যে বান্দা, ঐ যে মহব্বত, ওরে দেখতে ঠিক বড় ভুঁইয়ার লাখান (মত)। কী কও তুমি?"

ভুর ভুর করে তামাক টানতে টানতে, ধূসর রঙের রাশি রাশি ধোঁয়ার সেই তামাকের মৌতাত উড়িয়ে দিতে দিতে মাথা নেড়েছিল দেবেন পাল। তারপর উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠেছিল, "হ হ—তুই আর কী কইবি?—সেই খবর আমি জানি তোর জন্মের আগে। দ্যাখস না, নাকমুখ ক্যামুন সোন্দর মহব্বতের; ক্যামুন চোখা! মহব্বইত্যা বড় ভুঁইয়ার পোলা। এট্টা জারজ। এই তত্ত্ব আমি শোনছি নিশি চক্কোত্তির বৌর মুখে। এ আর এমন নয়া কথা কী? ট্যাকা দিয়া দিয়া বান্দী কিন্যা আনছে। সেই বান্দীরে কী এংরাজী বাজনা বাজাইয়্যা শাদি দিব পোলা বিয়ানের লেইগ্যা! হে-হে—বুঝলি কী না কিতাব্দী—"

"তবে তো জানোই। আমি মনে করছি, তুমি জানোই না।"

হো-হো শব্দ করে দু'টি কণ্ঠে একটি অট্টহাসি বেজে উঠল। আশ্চর্য নিষ্ঠুর ভাবে হেসেছিল দু'টি মানুষ। কিতাব্দী মৃধা আর দেবেন পাল। সেই

খরশান হাসিতে রয়নাবিবির খালের হৃৎপিণ্ডটা কেঁপে কেঁপে উঠেছিল। আর শিউরে উঠেছিল মহব্বত। তার থাবা থেকে কাঁঠাল কাঠের বৈঠাটা শিথিল হয়ে খালের জলে পাক খেতে খেতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। তখন আশ্বিনের সোনালী বিকেল পেরিয়ে প্রাক্-সন্ধ্যা নেমে এসেছিল রয়নাবিবির খালে। দূরের ছায়াতরুর সারি আবছায়া দেখাচ্ছিল।

আর সেদিন থেকেই, তার কলঙ্কিত জন্মের ইতিহাসটা জানার মুহূর্ত থেকেই মহব্বত এই রুদ্ধশ্বাস পৃথিবী থেকে পলাতক হতে চেয়েছে; ফেরারী হতে চেয়েছে জীবনের সেই প্রসন্ন দিগন্তে, যেখানে অতীতের জ্বালাময় দিনগুলি একটা অপযোনির মত তাকে ধাওয়া করে নিয়ে যাবে না।

পালিয়েই যেত মহব্বত। কিন্তু বড় ভূঁইয়া সাহেব সহস্র-লোচন। দেহের প্রতিটি বিন্দুতে তাঁর অদৃশ্য চোখ রয়েছে। আর সেই চোখে সন্ধানী আলো জ্বেলে পাহারা দিয়ে চলেছেন তিনি। সকলেই তাঁর দৃষ্টিবন্দী। একটি বান্দা-বান্দীরও পলাতক হবার উপায় নেই। বড় ভুঁইয়ার ধারণা, বান্দা কী বান্দীর জীবনে বন্দীত্বই তো চরম প্রাপ্তি, পরম সিদ্ধি।

ভুঁইয়া-বাড়িতে এককোণে একবিন্দু ধূলার মত অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে রয়েছে মহব্বত। তার মন নিহত, তার চেতনা বিক্ষত, তার ভাবনাটা নিষ্প্রাণ। দেহমনে এতদিন জীবনের কোন স্পন্দন ছিল না। পৃথিবীর কোন আঘাতে, কোন বঞ্চনায়, কী কোন নির্যাতনে এতটুকু বিকার ফুটে ওঠে নি মুখে। বড় ভুঁইয়ার পয়জার কী বিবিজানদের চাবুকের জ্বালা এতদিন নিয়মিত ছিল। এই নিয়মের বাইরে এই বান্দা জীবনের দোজখের ওপারে, এই আঘাত আর পীড়নের সীমানা থেকে অনেক, অনেক দূরে যে একটি ব্যতিক্রম আছে, একটি সোহাগের, একটি সহজ স্নেহের জগৎ আছে, তার আস্বাদ এতদিন ভুলেই গিয়েছিল মহব্বত। আজ দুপুরে বেবাজিয়া বহরে অনেক, অনেক দিন পর সেই মধুর বেহশ্‌তের সন্ধান পেয়েছিল সে।

বাদশাজাদা! শঙ্খিনীর কণ্ঠে শব্দটি অপরূপ গমকে বেজে উঠেছিল। মহব্বতের বিন্দুমাত্র মনে হয় নি, উচ্ছলা যাযাবরী তার সঙ্গে বিচিত্র কোন খেয়ালে কৌতুক করছে। আর সেই জন্যেই তার জীবনের সকল বঞ্চনা আর বেদনার উপর ঐ শব্দটি একটি স্নিগ্ধ প্রলেপ ছড়িয়ে দিয়েছিল।

আচমকা, সমস্ত ভাবনাটাকে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ঘরের ঝাঁপটা ককিয়ে উঠল। কে যেন ঝাঁপটাকে দু হাতে ঝাঁকানি দিচ্ছে। চমকে বয়রা বাঁশের মাচানে উঠে মহব্বত বলল, “কে?”

“কে আবার? আমি।” একটা বাজ গর্জে উঠল যেন। বাজ নয়, স্বয়ং বড় ভুঁইয়া সাহেব।

তড়াক করে বয়রা বাঁশের মাচান থেকে মাটিতে লাফিয়ে নামল মহব্বত। তারপর পাণ্ডুর গলায় বলল, “আইজ্ঞা, আমি তো বেবাক মাছ কাইট্যা আসছি।”

“হারামজাদা বান্দা, আমি এত রাইতে মাছের তল্লাস করতে আসছি না

কী ? উজবুক কোথাকার ?" শ্রাবণ রাত্রির অন্ধকারে বড় ভুঁইয়ার দু পাটি দাঁত কড়মড় করে বেজে উঠল।

"আইজ্ঞা।" মহব্বতের কণ্ঠ এবার একেবারেই নিভে এসেছে।

"কী যে শয়তানের ছাও, ঐ যে রয়নাবিবির খালে বেবাজিয়ারা আসছে, তার মধ্যে খুবসুরত কোন মাগী আছে ? ঠিক ডান-কাটা হুরীর লাখান (মত) ? তুই তো গেছিলি বাইদ্যা বহরে। কী রে বখিল, দেখছিস কোন বেবাজিয়া জলপৈরী ?" পরিষ্কার বোঝা যায়, বড় ভুঁইয়ার কণ্ঠটা অবিশ্বাস্য রকমের মোলায়েম শোনাচ্ছে।

"আইজ্ঞা—"

"আমাগো বাড়িতে দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) কইর‍্যা আসছিস বেবাজিয়াগো ?"

"আইজ্ঞা—"

"আইচ্ছা, এই নে চাইর আনা পয়সা। তোর ইনাম দিলাম।" একটা সিকি ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে শ্রাবণ রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বড় ভুঁইয়া।

চার আনা পয়সার ইনাম, বেদে-বহব, বড় ভুঁইয়ার এই রহস্যময় আবির্ভাব, বেদেনীতনুর রূপ নিয়ে কদর্য কৌতূহল—সব মিলিয়ে একটা কুটিল ইঙ্গিত রয়েছে। সব মিলিয়ে একটা ভয়ঙ্কর সংকেত রক্তের কণায় কণায় জলদ মিডে মিড়ে বেজে উঠল মহব্বতের।

একটি মুগ্ধ নাগকন্যা, তার দু চোখে কোমল দৃষ্টি, তার কণ্ঠে মধুর আবেশে গৃহী জীবনের স্বপ্ন টলমল করছিল। এই মুহূর্তে মহব্বতের মনে হলো, শঙ্খনী নামে গৃহী পৃথিবীর সেই স্নিগ্ধ স্বপ্নটির দিকে বড ভুঁইয়া দু'টি হিংস্র থাবা প্রসারিত করে দিয়েছেন।

এই দোচালা ঘর, শ্রাবণ রাত্রির এই নিশ্ছেদ অন্ধকার, দূরতম ঐ আকাশকে ফাটিয়ে ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইল মহব্বত। কিন্তু কণ্ঠ থেকে একটি বিবর্ণ শব্দও মুক্তি পেল না তার।

পাঁচ

রাত্রির পরমায়ু এখন তিন প্রহর।

রয়নাবিবির খালের পারে ছায়াতরুর সারিগুলিকে আশ্চর্য ভৌতিক মনে হয়। নল খাগড়ার দীঘল দীঘল ডাঁটাগুলোর ফাঁক দিয়ে কলধ্বনি তুলে বর্ষার জল নামছে ধানক্ষেতের দিকে। আকাশে পাণ্ডুর জ্যোৎস্না। তারই রহস্যময় আলোতে রয়নাবিবির খালটা চিক চিক করে উঠে। অর্জুন পাতার ফাঁকে ফাঁকে রাশি রাশি জোনাকি সবুজ দীপান্বিতা শুরু করেছে।

বেদে-বহরটা স্রোতের খেয়ালে দোল খেয়ে চলেছে অবিরাম। অবিশ্রাম।

সব নৌকার পাটাতনে অতিকায় ডাবা হারিকেন জ্বালানো হয়েছে। লাল

কেরোসিনের শিখা থেকে ধোঁয়ার রেখা কুণ্ডলিত হয়ে উঠছে।

আচমকা, মাঝখানের একটা নৌকা থেকে তীব্র-তীক্ষ্ণ গলায় শঙ্খচিল ডাকল। শঙ্খচিল নয়, আম্মা আসমানী, "যুশেইফ্যা—এই যুশেইফ্যা"—অবারিত খালের উপর দিয়ে আসমানীর কণ্ঠ বর্ষার বাতাসে তরঙ্গিত হতে হতে ছড়িয়ে পড়ল।

একটু পরেই শেষ প্রান্তের বিশাল ঘাসি নৌকাটা থেকে জবাব ভেসে এলো, "ক্যান? চিল্লানের কী হইছে?"

"কী হইছে!" আসমানীর কণ্ঠটা আশ্চর্য ক্রূর হয়ে উঠল, "বখিল, সময় হয় নাই অখনও? রাইত হইয়্যা গেল দুফার (দুপুর)। শিগ্‌গীর উই রাজাসাহেব জিনটারে ডাক দিয়া আন।"

খানিকটা সময়ের বিরতি। তারপরেই রাজাসাহেব আর যোশেফ মাঝখানের নৌকাটায় চলে এলো, "এই তো আইলাম হামরা।"

"এই তো আইলাম! হামার তিন জনম উদ্ধার কইর‍্যা দিছিস শয়তানের বাচ্চারা!" হলদে রঙের দু পাটি ক্ষয়িত দাঁত হিংস্রভাবে বেজে উঠল আসমানীর।

যোশেফের ডান হাতখানা কপাল, বুক আর বাহুসন্ধি ছুঁয়ে ছুঁয়ে অদৃশ্য ক্রুশ এঁকে চলেছে। এতটুকু বিরাম নেই এই ক্রুশ আঁকায়, এতটুকু জিরান নেই।

আসমানীর দু চোখে ধূসর রঙের ছানি পড়েছে। ভ্রূ দুটোকে কাঁকড়া বিছার মত কুঁকড়ে চাপা গলায় বলে উঠল সে, "হারামজাদা বখিল; আঙ্গুল দিয়া কপাল-মাথা-হাত ছুইয়্যা ঢং করে!"

এবার গর্জন করে উঠল যোশেফ, "জিভ্যা সামাল কইর‍্যা কথা কইবি আম্মা; না হইলে ভাল হইব না। হামার ধম্ম হামি পালুম না!"

"কী আবার হইব?" আসমানীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠটা এবার আশ্চর্য নিভন্ত শোনাচ্ছে।

"কী হইব! হামি রোমের কাত্তিক (রোমান ক্যাথলিক); যীশুরে হামি পূজা করি। ফির ঐ ঢং-এর কথা কইলে এট্টা খুনখারাপি হইয়্যা যাইব। সিধা কথা কইয়্যা দিলাম। হুঃ—" উত্তেজনায় ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ঘন ঘন ক্রুশ এঁকে চলল যোশেফ।

"আইচ্ছা, যা, যা—" আসমানীর কণ্ঠটা আরও নির্জীব হয়ে এলো।

ইতিমধ্যে ডহরবিবি আর গোলাপী নারকেলের মালায় সরষের তেল আর সুপারির ডোঙায় রক্তজবার ফুল নিয়ে এসেছে।

অদ্ভুত করিতকর্মা! পলকপাতের মধ্যে পিহরান খুলে, ডোরাকাটা লুঙ্গি গুটিয়ে, তেল ঘষে ঘষে শরীরটাকে মসৃণ আর পিচ্ছিল করে ফেলল যোশেফ আর রাজাসাহেব। লাল কেরোসিনের অস্বচ্ছ আলো দু'টি পাথরপেশী বেবাজিয়া দেহে ঝকমক করতে লাগল। কেউ যদি দু'টি বাহুর বেষ্টনে জড়িয়েও ধরে, একান্ত অবলীলায় তারা পিছলে বেরিয়ে আসতে পারবে।

চাপা অথচ খরশান গলায় আসমানী বলল, "যা পাবি, বেবাক বহরে আইস্যা হামার হাতে তুইল্যা দিবি। না হইলে—" ভয়াল একটি ইঙ্গিত দিয়ে আসমানীর কণ্ঠটা আচমকা স্তব্ধ হয়ে গেল।

ভয়ঙ্কর দু জোড়া চোখ তুলেই আবার নামিয়ে নিল রাজাসাহেব আর যোশেফ। দু'টি আলাদ গোক্ষুর যেন দৃষ্টির আগুনে ঝলসে দিল আসমানীর জীর্ণ দেহটা।

ডহরবিবির হাত থেকে সুপারির ডোঙাটা নিয়ে থাবার মধ্যে রক্তজবার ফুল তুলে নিল রাজাসাহেব আর যোশেফ। তারপর দু'টি হাত যুক্ত হয়ে কপালের ওপর উঠে গেল তাদের; দু'টি কণ্ঠ থেকে একটি সুললিত প্রার্থনা শ্রাবণ-রাত্রির বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। সেই স্বর, সেই আকুল কান্না রাশি রাশি ইকড় ফুল হয়ে তিমির দেবতার চরণে ভেসে গেল, "জয় বাবা নিশানাথ, জয় বাবা নিশানাথ, জয় বাবা নিশানাথ বেবাক তুমার দোয়া! বেবাক তোমার দোয়া!"

এর মধ্যে পাটাতনের তলা থেকে দু'খানা ধারালো সিঁদকাঠি বের করে এনেছে আসমানী। রাজাসাহেব আর যোশেফ রক্তজবার ফুল রয়নাবিবির খালে ভাসিয়ে সিঁদকাঠি দুটো হাতে তুলে নিল। তারপর থর থর গলায় বলল, "জয় বাবা নিশানাথ, জয় বাবা নিশানাথ। তুমার দোয়ায় যেন্ জানমান লইয়া আসতে পারি হামরা।"

একটু পরেই বেবাজিয়া বহর থেকে দু'টি পাথরপেশী দেহ খালের পারে নেমে গেল। রাজাসাহেব আর যোশেফ।

অতিকায় গলুইটার ওপর দাঁড়িয়ে আসমানী আর একবার গর্জন করে উঠল, "সামাল শয়তানের বাচ্চারা; এট্টা জিনিস ইদিক-উদিক সরাইলে মা বিষহরি তুগো মাথায় ঠাটা (বজ্র) ফেলব। বাবা নিশানাথ ঘাড মুচড়াইয়্যা রক্ত খাইব। মনে থাকে যেন্—খুব সাবধান—"

নিশ্ছেদ অন্ধকার। এতটুকু রন্ধ্র নেই, কণামাত্র ফাঁক নেই। এক সময় সেই অন্ধকারের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল রাজাসাহেব আর যোশেফ। আর দু'টি ছানিময় অস্বচ্ছ চোখকে একজোড়া শিকারী বল্লমের মত শাণিত করে সেদিকে তাকিয়ে রইল আসমানী।

ডহরবিবি ডাকল, "আম্মা, অ-আম্মা—"

চকিত হয়ে পিছন ফিরল আসমানী। মুখচোখের ভঙ্গি তার কুটিল হয়ে উঠেছে। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলল, "কী হইল তুর? কী লো শয়তানের ছাও?"

ডহরবিবি বলল, "যুশেফ আর রাজাসাহেব সিঁদকাঠি লইয়্যা তো গেল। হামি দিনের বেলায় গেরামে বিস্তর ছাগল আর বাছুর দেইখ্যা আইছি। ইদ্রিস আর ওসমানেরে তুই পাঠাইয়্যা দে আম্মা হাতাইয়্যা আনুক।"

"মাথাটা তুর জবর সাফ লো ডহর, এইর লেইগ্যাই তুরে এত মম্বত করি!" কঙ্কালবাহুর বেষ্টনে ডহরবিবির গলাটা জড়িয়ে ধরল আসমানী; তারপর দু'টি জীর্ণ ঠোঁট দিয়ে তার নরম আর নিটোল গালের ওপর একটি লালাভরা

চুম্বন আঁকলো, "ঠিক কইছিস তুই। রাইতের আন্ধারে যা হাতাইয়্যা আসা যায়, উয়াতেই লাভ। না হইলে আবার কাইল বিহান বেলায় চৌকিদার আইস্যা হামলা করব, দফাদার আইস্যা পড়ব জিনের লাখান (মত)।" ছানিময় চোখ দু'টি বিচিত্র উল্লাসে মাছের আঁশের মত চক চক করতে লাগল আসমানীর। ডহরবিবির কাছ থেকে গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে যেন সে।

এক মুহূর্তের যতিপাত! তারপরেই আসমানী চিৎকার করে উঠল, "উরে ইদ্রিস, উরে ওসমাইন্যা, শিগ্গীর ইদিকে আয়—"

একটু পরেই সামনে এসে দাঁড়াল ওসমান আর ইদ্রিস। ওসমানের সারা মুখে কদম্বরেণুর মত দাড়ির রোঁয়া ছড়িয়ে রয়েছে। একমাথা বিস্রস্ত চুল, নিরোম ভ্রূরেখা, পেঁচার মত একজোড়া কোটরচোখ ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

ইদ্রিসের একটা চোখ দেহের মায়া কাটিয়েছে বছর দশেক আগে। কোন এক বাঘা মুসলমান ব্যাপারীর ঘরে সিঁদ কাটতে গিয়েছিল সে। সড়কির খোঁচায় নগদ একটি চোখ খেসারত দিতে হয়েছে। সারা গায়ে নানা ক্ষতরেখা, নামাবলীর মত ব্যভিচারের অজস্র চিহ্ন ছড়িয়ে রয়েছে। যখন হাসে তখন গালের কশ চৌফালা করে অসমান কয়েকটি গজদন্ত বেরিয়ে আসে।

ইদ্রিস আর ওসমান। দু'জনের কণ্ঠ থেকেই এক জিজ্ঞাসা ঝরল, "কী ব্যাপার আম্মা?"

"কী ব্যাপার আম্মা!" দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে, জীর্ণ তর্জনীটাকে ঘন ঘন নেড়ে একটা অমানবিক ভঙ্গি করল আসমানী, "জিগাই (জিজ্ঞাসা করি), সানকিতে ভাত আসে কুথা থিকা? বাদশাজাদার বাচ্চারা গায়ে বাতাস দিয়া বেড়াবি খালি? ইট্টু ইদিক-উদিক ঘুইর্যা দুই চাইরটা ছাগল কী বাছুর হাতাইয়্যা আনলে খাঞ্জা খাঁর নাতিন জামাইগো কী গতর গইল্যা পড়ব?"

"এই যে যাইতে আছি আম্মা।" সমস্বরে বলে উঠল দু'জনে।

খানিকটা পর নিশানাথের নাম নিয়ে, অদৃশ্য তিমির দেবতার চরণপদ্মে একটি প্রণাম জানিয়ে ওসমান আর ইদ্রিস ঘাসি নৌকার গলুই থেকে পারের মাটিতে নেমে গেল।

রিম ঝিম করছে শ্রাবণের রাত। আবছায়া ছায়াতরুর বন থেকে কর্কশ গলায় কোঁড়াল ককিয়ে উঠেছে। কোথায় যেন এক ঝাঁক খটাশ ডাকল। পাট আর ধানপাতার ফাঁকে ফাঁকে নীল জোনাকি। সব মিলিয়ে দ্বিতীয় ঋতুর রাত্রি ভৌতিক হয়ে উঠেছে, ভয়াল হয়েছে।

স্নায়ুগুলোকে ধনুকের ছিলার মত প্রখর করে, দু'চোখে বিড়ালের দৃষ্টি জ্বালিয়ে এগিয়ে চলেছে ওসমান আর ইদ্রিস। একটু আগেই এই পথ দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছিল রাজাসাহেব আর যোশেফ।

আচমকা পেছন থেকে লঘু পদশব্দ এগিয়ে এলো। সাঁ করে একটা বেতবনের আড়ালে সরে গেল দু'জনে। ওসমান আর ইদ্রিস। এই পদশব্দে একটা অনিবার্য ইঙ্গিত রয়েছে। তবে কী—

"হামি গো হামি, ডরে দেখি এক্কেবারে আধমরা তুমরা! ক্যামুন পুরুষ,

ক্যামুন মরদ—হায় রে খোদা ! হায় মা বিষহরি ! হিঃ-হিঃ-হিঃ—" খিল খিল হাসিতে শ্রাবণের রাত্রি চকিত হয়ে উঠল। ডহরবিবি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

বেত-বনের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো ওসমান আর ইদ্রিস।

ওসমান বলল, "কী ব্যাপার বিবিজান ?"

"হায় রে বেকুব বেবাজিয়া ; ছাগল তো আনতে যাইস। মন্তরপড়া সউরষা (সর্ষে) লইয়্যা যা। পাঁঠার কানে, বাছুরের কানে সউরষা না দিলে চিল্লাইয়া মাত করবো। তখন কিষাণী উইঠ্যা ফতুল্লার চিড়া আর সিরাজ-দীঘার ক্ষীর দিয়া ফলার খাওয়াইব না কী ?"

মন্ত্রপড়া সর্ষে নিয়ে খড়্গের মত খালের বাঁকটা এক পাশে রেখে এগিয়ে গেল ওসমানেরা। আর পেছন পেছন আসতে শুরু করল ডহরবিবি।

সামনের জলঘাসের বন থেকে এক ঝাঁক শিয়াল তারস্বরে ডেকে উঠল।

একবার থমকে দাঁড়াল ওসমান ; তারপর বিরক্ত গলায় বলল, "কী হইল বিবিজান ? আবার আইতে আছিস ক্যান ? তুর মনে মনে কী মতলব ?"

"হামার কাছে একবার আয় ওসমান। তুর লগে হামার কথার কাম আছে। হামার লগে আবার গোলাপী আইছে।" ছৈতানের ঘন পত্রশাখার নীচে এসে দাঁড়িয়েছে দু'টি নারীতনু। ডহরবিবি আর গোলাপী।

সামনে এগিয়ে এলো ওসমান, "কী হইছে ? অ্যামুন করলে কাম হইব না বিবিজান। এইটা সোহাগের সময় না।"

তরল গলায় ডহরবিবি বলল। তার কণ্ঠ থেকে বিন্দু বিন্দু অভিমান ঝরল, "তবে কিসের সময় ? যখনই তুর কাছে যাই, তখনই হামারে ভাগাইয়্যা দিতে চাইস !" পরিষ্কার বোঝা যায়, একটা থম থম কান্নার ভারে কণ্ঠটা মন্হর হয়ে এসেছে ডহরবিবির।

এবার বিব্রত হবার পালা ওসমানের। বেদেনীর রসরঙ্গে, পুলক-বেদনায় যে কত ছলাকলা ! ছত্রখান গলায় ওসমান বলল, "তুরে যে কতখানি মহব্বত করি, তা ক্যামনে বুঝাই ! তুই কাছে আইলে পরান হামার খুশবু হইয়্যা যায়। কিন্তুক আম্মা আসমানীরে তো চিনস ! ছাগল-বাছুর হাতাইয়্যা না আনলে জানে খাইয়্যা ফেলব হামার। তুই তো বোঝস না রসবতী, তুর লেইগ্যা বুকের মধ্যে কতখানি পিরিতের মৌ জমছে ! তুই তো—"

"থাউক, থাউক, বেবাজিয়া পুরুষের মুখে রসের কথা, মহব্বতের কথা শুনলে পরান হামার জুইল্যা যায়। হিঃ-হিঃ-হিঃ—" বলতে বলতে একটা পাহাড়ী প্রপাতের মত উদ্দাম হাসিতে বেজে উঠল ডহরবিবি।

ওসমান বলল, "কী কইবি, এইবার ক' ডগর। রাইত হইয়্যা গেল দুফার।"

সহসা সোহাগী বিড়ালের মত গর গর করে উঠল ডহরবিবির গলাটা, "হামার লেইগ্যা এট্টা মোরগা আনবি, অনেকদিন প্যাটে শিককাবাব পড়ে নাই। আনবি তো ! এই ওসমাইনা, খোদার কসম খা।"

"আনুম। এইবার বহরে যা আহ্লাদী বিবি।"

একপাশে এতক্ষণ নিথর হয়ে দাঁড়িয়েছিল গোলাপী। এবার সে বলল, "ওসমান চাচা যুশেফরে তুমি সাবধানে কাম করতে কইব্যা। গিরস্থেরা বড় চতুর হইছে। একবার ট্যার পাইলে ল্যাজার ঘাই মাইর‍্যা জান নিয়া নিব। উর জান গেলে হামার আর কী থাকব এত বড় দুনিয়ায়!" একটু থামল গোলাপী, তারপর আবার গলাটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল তার, "চুরি জবর খারাপ কাম, জবর মোন্দ! যেই গেরামেই যাই, সেই গেরামেই যুশেফরে চুরি করতে পাঠায় আম্মা। কুন দিন যে উর জান যায়, আল্লা জানে। হায় মা বিষহরি। উর কথা ভাবতে ভাবতে পরানটা হামার কাঁপে।"

"এক্কেবারে ডাহুক পংখী! পরানটা কাঁপে! বেবাজিয়া পুরুষ চুরি করবো না, খুনখারাপি করবো না, খালি মাগীর ঘাগরার নীচে বইস্যা থাকবো! অ্যামন কথা বাইদ্যানী হইয়্যা কইস ক্যামনে লো গোলাপী!" তীব্র-তীক্ষ্ণ শ্লেষে কণ্ঠটা ঝকমক করতে লাগল ডহরবিবির, "আর চুরির কথা এমুন কইর‍্যা কইস না। হামরা শুনছি, কিছু হইব না তাতে। কিন্তুক আম্মার কানে যেন্ এই কথা না যায়। বড় যে পিরিত উথলাইয়্যা উঠছে যুশেফের লেইগ্যা! বেবাক পিরিত বল্লম মাইর‍্যা সিধা কইর‍্যা দিব আম্মা। অনেক রাইত হইছে, এইবার বহরে চল পোড়ারমুখী।"

গোলাপীর দু'খানা হাত ধরে টানতে টানতে বহরের দিকে পা বাড়িয়ে দিল ডহরবিবি। আর খিক্ খিক্ শব্দ করে একটা গোরস্থানের শিয়ালের মত হেসে উঠল ইদ্রিস। সে হাসিতে শ্রাবণের ত্রিযামা কেঁপে কেঁপে উঠল।

ইদ্রিস বলল, "ইয়ারেই বুঝি পিরিত কয় রে ওসমাইন্যা! কৃষ্ণনীলার (কৃষ্ণলীলার) পালায় রাধিকার লাখান (মত) আন্ধার রাইতে নাগরের খোঁজে বাইর হইয়্যা পড়ছে মাগী দুইটা। হিঃ-হিঃ—হাঃ-হাঃ—"

"চুপ মার—" দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল ওসমান।

অনেক, অনেকটা দূরে একটা আটকিরা ঝোপের কিনার থেকে ডহরবিবির গলা ভেসে এলো, "ওসমাইন্যা, তুই হামার পরানের মণি, হামার বুকের ধুক্ ধুক্। হামারে কিন্তুক এট্টা মোরগা আইন্যা দিবি। অনেক দিন শিককাবাব খাই নাই। মোরগা আইন্যা না দিলে হামি কিন্তুক উই বজবালি শয়তানের লগে জোড় পাতামু। তুরে ছাড়ান দিমু।"

"আনুম, নিচ্চয় আনুম। অমুন বেদরদী কথা আর কইস না ডহর। তুরে কতখানি পিরিত করি হামি—" আর্তনাদ করে উঠল ওসমান।

যেমন করেই হোক, এই বিশাল পৃথিবীটার সকল আসমান-জমিন একাকার করেও একটা মুরগি সংগ্রহ করে আনতে হবে ওসমানের। আনতেই হবে।

ছয়

পেটের ভেতর ক্ষুধার বাসুকি ফণা আছড়াচ্ছে। কপালের দুপাশে রগদুটো দপ্ দপ্ করে চলেছে একটানা। সমস্ত দুনিয়ার উপর এক অসহায় আক্রোশে মেদমজ্জা, অস্থি-মাংসের এই বস্তুদেহ যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে ছিটকে পড়বে। জ্বালাভরা দুটো চোখ মেলে চারদিকে একবার তাকালো শঙ্খিনী। চারপাশ থেকে 'ছই'-এর ঘেরাটোপটা যেন নেমে আসছে। বুকের মধ্যে যে ধুক্ ধুক্ নিঃশ্বাস বাজছে, যে কোন মুহূর্তে তাকে যেন স্তব্ধ করে দেবে এই 'ছই'-এর অবরোধ।

মাঝরাতে উঠে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে দিয়েছিল আতরজান। সেই কুপির শিখা অতন্দ্র হয়ে রয়েছে। 'ছই'-এর দেওয়ালে পিঙ্গল রঙের আলো নাচছে।

পাটাতনের উপর পড়ে রয়েছে একটি নিথর বেদেনীতনু। আতরজান। কেয়াকাঁটার আঘাতে আঘাতে সে দেহ এখন রক্তপদ্ম।

দিনরাত্রির এতগুলি প্রহরের মধ্যে বেবাজিয়া বহরের কেউ আসে নি এই নৌকাটায়। পৃথিবীর সকল উপভোগ আর বিলাস, স্নেহ আর সোহাগের বাইরে এই নির্মম 'ছই'-এর গুণ্ঠনে আতরজান আর শঙ্খিনী নামে দু'টি বেদেনী-মনকে নির্বাসিত করে রেখেছে আসমানী। আম্মা আসমানীর নির্দেশ —দোজখ আর বেহেস্তে ঘেরা এতবড় দুনিয়ার সমস্ত গ্রহতারা যদি টুকরো টুকরো হয়ে নীহারিকায় মিলিয়ে যায়, প্রচণ্ড ভূমিকম্পের উৎক্ষেপে যদি এই খাল-বিল, নদী-গাঙের বিশাল দেশটা সপ্ততলের অবতলে তলিয়েও যায়, তবু কেউ আসবে না এদিকে। তার অগোচরে এক সানকি ভাত আর ছালুনও কেউ দিয়ে যাবে না। আম্মা আসমানীর নির্দেশকে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস নেই কারো ধমনীতে। এই বেবাজিয়া বহরের প্রতিটি নারী কি পুরুষ জানে, আসমানীর নির্দেশের কোন ব্যতিক্রম ঘটলে অজগর জিভের মত এক হাত সড়কির ফলা হৃৎপিণ্ডটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে যাবে। এ এক নির্মম নিয়ম, বেদে-বহরের এক ভয়ঙ্কর কানুন।

এক অঞ্জলি জলও পেটে পড়েনি শঙ্খিনীর। দুপুরের দিকে পাশের নৌকা থেকে কুঁচিলা সাপের ভর্তা আর রসুনের ছালুন রান্নার উত্তেজক সৌরভ ভেসে এসেছে। সে সৌরভে ক্ষুধার সেই বাসুকিটা বার বার ফুঁসে উঠেছে। চারপাশের ঘাসি নৌকায় বেবাজিয়া পুরুষের গলা খুশী খুশী হল্লায় মেতে উঠেছে, নাগমতী বেদেনীর কণ্ঠে খল খল হাসি বেজেছে। সেই হাসি, সেই উল্লাস এ নৌকার পাটাতনে একটি সুঠাম বেদেনীমনকে ফালা ফালা করে দিয়েছে। আক্রোশে, ক্ষোভে কুপিত বুকটা বার বার ফুলে ফুলে উঠেছে শঙ্খিনীর। নাঃ, কোনক্রমেই পাশের নৌকার পাটাতনে গিয়ে সকলের উল্লাসে

নিজের আনন্দ মেশাবার উপায় নেই তার। এতক্ষণ রাগে, ক্ষোভে, রোষে রক্তের প্রতিটি কণিকা ফুঁসে ফুঁসে উঠেছিল শঙ্খনীর, এবার প্রচণ্ড অভিমানে চোখের মণিদুটো চোঁচির করে ফোয়ারা বেরিয়ে এলো তার। এই বিশাল আসমানের নীচে, এত বড় পৃথিবীতে কেউ নেই তার। ভাই না, বোন না, বাজান না, আম্মা না। কেউ না। তার জন্য কোন মনের মৌচাকে এতটুকু সোহাগের মৌ নেই, এতটুকু স্নেহের সুধা নেই।

সারাটা দিন ভরপেট মদ আর দেহময় মারের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়েছিল আতরজান। কপাল থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত কেয়াকাঁটার আঘাতের গয়না। সন্ধ্যা পর্যন্ত মরা গোসাপের মত নির্জীব হয়ে পড়ে ছিল সে। তারপর উঠেই প্রেতের মত খিল খিল করে হেসেছিল, "নেশাটা জবর জইম্যা উঠছিল শঙ্খ! মদ, আর তার চাট হইল মাইর (মার)। হিঃ-হিঃ—হিঃ-হিঃ—একেবারে তোফা নেশা! অ্যামুন নেশা জনমে করি নাই কুনো দিন।"

আর্ত গলায় শঙ্খনী বলেছিল, "তুই এর পরেও হাসতে পারস আতরজান, তুই যেন এট্টা কী!"

"হামি আবার কী? হামি বাইদ্যানী মাগী। হামার তো আর তুর লাখান (মত) ঘরের বউ সাজনের মিঠা মিঠা ভাবন লাগে না। যাউক উই সব কথা। তুই তো কিছুই খাইস নাই! না মদ, না মাইর!" বলতে বলতে কণ্ঠটা অবসন্ন হয়ে এসেছিল আতরজানের। তার পরেই আবার একটা শরাহত পাখির মত দেহটিকে পাটাতনের উপর ছড়িয়ে দিয়েছিল আতরজান।

আর সেই থেকেই তার শিয়রে নিশ্চুপ বসে রয়েছে শঙ্খনী। তারপর একবারও আর চোখের পাতা খোলে নি আতরজান।

কেরোসিনের কুপি থেকে লালাভ ধোঁয়া কুণ্ডলিত হয়ে উঠেছে। পাটাতনের নীচে ভাঙা হাঁড়ি আর বেতের ঝাঁপিগুলোতে চক্রচূড়, খৈজাতি, কালচিতি আর আলাদ গোক্ষুরেরা ফণা আছড়াচ্ছে। কয়েকটা ছাগল প্রাণান্ত চিৎকার করে উঠল। 'ছই'-এর ফাঁকে একটা টিকটিকি টিক্ টিক্ বাজনা বাজালো! বাইরে শাবণের বাতাস অশ্রান্ত হয়ে উঠেছে! ধান আর পাটবনেব মধ্য দিয়ে সোঁ সোঁ গর্জনে নামছে বর্ষার জল। ঢেউ-এর নাগরদোলায় অবিরাম টলে চলেছে নৌকাটা। আর চেতনটা কখনও ক্ষোভে, কখনও অভিমানে পাক খেয়ে খেয়ে বিক্ষিপ্ত হতে লাগল শঙ্খনীর।

আচমকা বাইরে থেকে ঝাঁপ খোলার শব্দ ভেসে এলো। চকিত হয়ে উঠল শঙ্খনী। একটা ভয়াল মুখ উঁকি দিয়েছে ঝাঁপের ফাঁকে। দেখতে দেখতে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে হিমধারা নামতে শুরু করেছে যেন।

ততক্ষণে 'ছই'-এব গর্ভলোকে চলে এসেছে মানুষটা। কালো পাথরের মত সেই অমসৃণ মূর্তি। পেশীময় বিশাল বুকখানায় অফুরন্ত শক্তি আর সাহসের মোহানা। সজারুর কাঁটার মত সারা দেহে অজস্র রোমাবলী। এক রাশ বিশৃঙ্খল গোঁফদাড়ির মধ্যে দু'টি নির্ভাব চোখ। জুলফিকার।

গর্-র্-র্-র্-র্—সেই অমানবিক গর্জন। বিবর্ণ দৃষ্টিতে জুলফিকারের

দিকে তাকালো শঙ্খিনী। বিশেষ একটি প্রয়োজন ছাড়া তো জুলফিকারের আবির্ভাব ঘটে না। আর সেই প্রয়োজনটি হলো, আম্মা আসমানীর নির্দেশে এই বেবাজিয়া বহরের যে কোন মানুষকে নির্বিচারে আঘাত করা। তার থাবায় কেয়াশাখার কাঁটায় কাঁটায় হত্যার অবাধ অধিকার তুলে দিয়েছে আসমানী।

আশ্চর্য মানুষ এই জুলফিকার। জাতে মগ। বহুদিন আগের সেই অতীতে নাম ছিল মিমি খিন্। কিন্তু এই বেবাজিয়া বহরে এসে. নতুন জন্মান্তরে তার নাম হয়েছে জুলফিকার। আম্মা আসমানীই তাকে জুলফিকার নামের মহিমা দিয়েছে।

এই জুলফিকারকে ঘিরে সেই বীভৎস দুপুরের স্মৃতিটা আজও চেতনায় দোল খেয়ে যায় শঙ্খিনীর। কতদিন আগের সে কাহিনী! যত দিনেরই হোক, সে ইতিহাস মনের পরতে পরতে আজও নির্বিকার রয়েছে। এতটুকু রঙ মোছে নি সে স্মৃতি থেকে।

আট বছর আগের একটা হেমন্ত দুপুর। তার ওপর থেকে পর্দাটা উঠে গেল। সেদিন তাদের বিশাল বেবাজিয়া বহরটা কর্ণফুলীর পারে ছোট্ট একটা বন্দরে 'পারা' পুঁতেছিল।

সেদিন অঘ্রাণের রোদ তীব্র হচ্ছিল, তীক্ষ্ণ হচ্ছিল। কর্ণফুলীর ঢেউ-এ ঢেউ-এ তরঙ্গিত হচ্ছিল হেমন্তের খরশান দুপুর। আকাশে আকাশে মরসুমী পাখির ঝাঁক ছেঁড়া ছেঁড়া পাপড়ির মত ছড়িয়ে ছিল। আর ঠিক সেই সময় আম্মা আসমানী এই মানুষটাকে কোথা থেকে যেন তাদের বহরে জুটিয়ে এনেছিল। কালো পাহাড়ের মত অতিকায় দেহে স্তবকে স্তবকে রক্ত জমে রয়েছে। নিরোম ভ্রূ দুটো চৌচির; বিন্দু বিন্দু ঘন রক্ত চোখের পিঙ্গল পক্ষ্মকে ভিজিয়ে দিয়েছে। একটু আগেই এই মানুষটা শুধু দু'টি হাতের হাতিয়ার সম্বল করে একটা চিতাবাঘ হত্যা করে এসেছিল। নিভার দু'টি চোখে ঘাতনের উল্লাস ঝিলিক দিয়ে উঠছিল তার।

আট বছর আগের সেই হেমন্ত-দুপুর। বিরাট থাবা নেড়ে নেড়ে, বেঢপ শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে আর দুর্বোধ্য ভাষায় মানুষটা তার শিকার-কাহিনী ঘোষণা করেছিল। সে ঘোষণার একটি বর্ণ কি একটি শব্দও বোঝা যায় নি, শুধু বেবাজিয়া বহরের প্রতিটি নারী আর পুরুষ সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভুল অনুমান করতে পেরেছিল। সকল কথার শেষে, সকল দেহভঙ্গির পর্ব থামিয়ে আশ্চর্য উত্তেজিত একটি শব্দ করে উঠেছিল মানুষটা। গর্-র্-র্-র্-র্—

সেদিন মানুষটার নাম মিমি খিন্। আশ্চর্য বিস্ময়! এই মানুষটার মিমি খিন্ নামে যে একটি অতীত রয়েছে, সেই অতীতের নেপথ্য থেকে কোন সংবাদই সংগ্রহ করতে পারে নি বেবাজিয়ারা। শুধু মাত্র একটি চিতাবাঘ শিকারের কাহিনী তার অতীতের প্রথম আর শেষ ইতিহাস হিসাবে শঙ্খিনীরা জেনেছে।

মিমি খিন্ থেকে জুলফিকার ! আট বছর ধরে জুলফিকার নামের মধ্যে একটু একটু করে জন্মান্তর নিতে নিতে বিশাল দেহটির কোন পরিবর্তন হয় নি তার। হেমন্তের সেই দুপুরটির মতই জুলফিকারের সে দেহ অক্ষয় আর অব্যয় মহিমায় আজও বিরাজ করছে। শুধু মুখের ভাষাটাই আশ্চর্য বদলে গিয়েছে তার। আট বছর আগে কর্ণফুলীর পারে সেই ছোট্ট বন্দরের মাটিতে দাঁড়িয়ে যে দুর্বোধ্য ভাষায় চিতাবাঘ শিকারের কাহিনী সে বলেছিল, সে ভাষা আর একবারও উচ্চারণও করে নি জুলফিকার।

একটু একটু করে এই আট বছরে বেবাজিয়া জীবনের অস্থি-মজ্জা, মেদ-মাংস, কামনা-বাসনার মধ্যে একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে জুলফিকার; একেবারেই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পদ্মা-মেঘনা, ইলসা-কালাবদর, আড়িয়াল খাঁ আর ধলেশ্বরী—জলবাঙলার নদী-বিলে ভাসতে ভাসতে, এই ভাসমান বেদে-বহরে নোঙরহীন আনন্দে দুলতে দুলতে মিমি খিন্ নামের অতীতকে ভুলে গিয়েছে জুলফিকার। দেহের প্রতিটি কোষে কোষে, মর্মের প্রতিটি সচেতন স্নায়ুতে স্নায়ুতে এই যাযাবর জীবনের নেশা আফিম ফুলের মত মোহ ঘনিয়েছে। নিখাদ বেবাজিয়া হয়ে গিয়েছে জুলফিকার।

অতীত বর্ণনায় কোন কৌতূহল নেই জুলফিকারের। আট বছরের পরপার থেকে স্মৃতির এক ঝলক রোশনাই এসে আজকের যাযাবর মনকে বিভ্রান্ত করে, এ হয়ত সে চায় না। সবই সে বিস্মৃতির অন্ধকারে সরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু একটি শব্দ সে ভুলতে পারে নি। ভয়াল উত্তেজনার মুহূর্তে সে আওয়াজটি নিজের অজান্তেই গর্জন করে ওঠে। গর্-র্-র্-র্-র্—

সেই হেমন্ত দুপুরের পর একটা বছর পার হলো। কর্ণফুলীর পারে সেই নগণ্য বন্দর থেকে নোয়াখালির এক বিলে এসে নোঙর ফেলল বেবাজিয়ারা। সাউটশাহীর বিল।

বিলের মাটিতে দাঁড়িয়ে তীব্র-তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠেছিল আসমানী, "এই শয়তানের বাচ্চারা, এই বান্দীর ছাও বান্দীরা, ইদিকে আয়।"

মাঝখানে কৃষ্ণাঙ্গ একটা দানব। তার চারপাশে এসে বৃত্তের মত ঘন হয়ে দাঁড়াল বেবাজিয়া নারী আর পুরুষেরা।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। আসমানীর গলায় আবার যেন শঙ্খচিল ডেকে উঠেছিল। জুলফিকারের দিকে তাকিয়ে সে বলেছিল, "এই জুলফিকার, এই জিন, এই শয়তানের বাচ্চাগো দেইখ্যা নে। ইট্টু ইদিক-উদিক করলে এক্কেবারে জান নিবি। এই বহর থিকা কেউ পলাইয়্যা যাইতে চাইলে, কারো ঘরের ভাবন লাগলে, মা বিষহরির নামে, জাঙ্গুলির নামে, খোদা আর নিশানাথের নামে কেউ গুণাহ করলে সড়াকি মাইর‍্যা তার কালিজা এফোঁড়-ওফোঁড় কইর‍্যা ফেলাবি। এইর লেইগ্যা তুরে হামার বহরে আনছি, তুরে ইট্টু ইট্টু কইর‍্যা বেবাজিয়া বানাইছি। এই ইবলিশের ছাওগো সব সময় তুই পাহারা দিবি! বুঝলি?"

দু'টি নির্বোধ চোখ ভয়ানক উল্লাসে জ্বলে জ্বলে উঠেছিল জুলফিকারের।

কর্ণফুলীর পারে সেই প্রথম হেমন্ত দুপুরটির স্মৃতির মধ্যে দোল খায় শঙ্খনী। সেদিন জুলফিকারের চারপাশে বৃত্তের মত ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বেবাজিয়ারা। বেদে-বহরের প্রতিটি মানুষের চোখেমুখে সেদিন কৌতুকের আলো ছিল, ছিল কৌতূহলের উত্তেজনা। গোলাপী আর ডহরবিবি হাত দিয়ে টিপে টিপে পরখ করেছিল, জুলফিকারের কালো পাহাড়ের মতো দেহটা নিখাদ রক্তমাংসের কী না? কোন্ আজব গ্রহলোক থেকে ঠিকানা ভুলে একটা বিচিত্র প্রাণী এলো তাদের বহরে! তার ভাষা অজানা, তার অঙ্গভঙ্গি দুর্বোধ্য।

কিন্তু কর্ণফুলীর পারে একটি হেমন্ত দুপুর আর নোয়াখালির সেই আউট-শাহীর বিল সম্পূর্ণ আলাদা। এর মধ্যে একটা বছর উড়ে গিয়েছে। এর মধ্যে জুলফিকার নামের গরিমা পেয়েছে মিমি খিন্। আর এই জুলফিকারের মধ্যে থেকেই একটু একটু করে, একটি ভয়াল পরিচয় বেরিয়ে এলো। তার থাবায় কেয়াকাঁটা উঠল, তার দু'টি নির্বোধ চোখ হিংস্র হলো। আজকের আতরজানের মত সেই কেয়াশাখায় বেবাজিয়াদের দেহ ফালা ফালা হয়ে গেল। আম্মা আসমানীর নির্দেশে অবাধ হত্যার অধিকার পেয়েছে সে।

এই বেবাজিয়া বহরের প্রতিটি নারী আর পুরুষের দেহ-মন, অস্থি-মজ্জা, কামনা বাসনাকে কেয়ার শাখা দিয়ে শাসন করছে জুলফিকার; দু'টি নির্বোধ চোখ সতর্ক করে. দু'টি বিশাল বাহু বিস্তার করে, অবিরাম পাহারা দিয়ে চলেছে। প্রথম দিনের মত সকৌতুক কৌতূহলে আজকাল আর কেউ তার পাশে অন্তরঙ্গ হয়ে আসে না। জুলফিকার নামে একটি বিভীষিকা থেকে নিরাপদ দূরত্বে সবে থাকে বেবাজিয়ারা।

শঙ্কিত একজোড়া চোখ মেলে জুলফিকারের দিকে তাকিয়ে রইল শঙ্খনী। আশ্চর্য! জুলফিকারের দৃষ্টিতে কোন হিংস্র ছায়া নেই, নেই হত্যার প্রেরণা। নির্বোধ চোখ দু'টি কী এক বেদনায় কোমল হয়ে গিয়েছে তার। থাবায় কেয়াশাখা নেই, তার বদলে দু' সানক বোরো চালের ভাত আর ছালুন।

গর্-র্-র্-র্-র—ভয়ঙ্কর শব্দ করে উঠল জুলফিকার। তারপরেই ছই-এর মধ্যে চলে এলো সে।

নিষ্পলক তাকিয়েও রয়েছে শঙ্খনী। চোখদুটো তার পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে।

হাতিকায় থাবা থেকে ভাত আর ছালুনভরা সানকদুটো পাটাতনের উপর নামিয়ে রাখলো জুলফিকার; তারপর হাঁটুদুটো ভাঁজ করে আতরজানের পাশে বসে পড়লো। তারও পর আশ্চর্য স্নিগ্ধ গলায় সে ডাকলো, "এই আতর, আতর—আতরজান—"

নির্বাক বিস্ময়ে চমকে উঠলো শঙ্খনী। জুলফিকারের কণ্ঠে কে এক মমতাময় পুরুষ যেন কথা কয়ে উঠল। তার দৃষ্টিতে ছায়া পড়লো এক মুগ্ধ প্রেমিকের!

আশ্চর্য! চেতনাটা বন্ বন্ করে ঘুরপাক খেয়ে গেল শঙ্খনীর। জুলফিকারের থাবায় নিষ্ঠুর হত্যা আর নির্মম আঘাতের অধিকার তুলে

দিয়েছে আম্মা আসমানী! জুলফিকারের কণ্ঠে এতকাল বাঘ গর্জন করে উঠেছে। কিন্তু, এই মুহূর্তে পাথরের মত একটি কঠিন বুকের কোন্ তলদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে স্নিগ্ধধারা ফল্গু? এই সুন্দর মমতার কণ্ঠটি জুলফিকার নামে একটি বিভীষিকার কোন্ অন্তরালে এতকাল ফেরারী হয়ে ছিল? শ্রাবণের এই রাত্রিতে জুলফিকারের কী জন্মান্তর হলো? এই রাত্রি কী জুলফিকার সম্বন্ধে শঙ্খিনীর সকল ধারণাকে বিভ্রান্ত করলো? এতকালের পরিচিত জুলফিকারের সঙ্গে এই মুহূর্তের মানুষটির কোন মিলই খুঁজে পেল না নাগমতী বেদেনী।

নিষ্পলক তাকিয়েই রইলো শঙ্খিনী। চোখ দু'টি তার যেন অপক্ষ্ম।

কুপির রক্তাভ শিখাটা বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে পাটাতনের উপর। একটা রহস্যময় আলোর রেশ দপ্ দপ্ করে কেঁপে চলেছে। ছই-এর দেওয়ালে দেওয়ালে জুলফিকারের দানবীয় ছায়া চঞ্চলভাবে নড়ছে। একটানা। অবিরাম। আর কপির সেই আলোতেই শঙ্খিনী দেখল, সবুজ রঙের সুঙমা লতা নিঙড়ে নিঙড়ে রস বের করলো জুলফিকার; তারপর আতরজানের রক্তাক্ত ক্ষতগুলির উপর সেই রস মাখিয়ে দিল। তারও পর ভারী ভারী দু'টি কর্কশ হাতে পৃথিবীর সকল স্নেহ আর মমতা সঞ্চার করে আতরজানের সুঠাম দেহটিতে বুলিয়ে দিতে লাগলো জুলফিকার!

অনেকটা সময়ের বিরতি। এক সময় জুলফিকার আতরজানের কানের কাছে মুখটাকে ঘনিষ্ঠ করে আনলো, "আতর-অ—আতরজান।"

এবারে ডুকরে কেঁদে উঠলো আতরজান। এতক্ষণ প্রখর অভিমানে হৃৎপিণ্ডটা পাথরের মত কঠিন হয়ে গিয়েছিল। এই মুহূর্তে একটি মধুর স্নেহের উত্তাপে সেই হৃৎপিণ্ডটি গলে গলে চোখের মণি চৌচির করে বন্যা হয়ে নামলো। খরশান গলায় আতরজান বলল, "ক্যান? হইছে কী? সোহাগ দেখাইতে আইছিস! মারণের সময় মনে আছিল না! যা, যা ইবলিশ, সোহাগ থুইয়্যা গোরে যা। শয়তান হারামজাদা জিন কুথাকার?"

জুলফিকারের কণ্ঠটা এবার একেবারেই নিভে গেল, "হামি কী করুম তুই-ই ক' আতরজান! তুই হামার আতর, আতরগুল! তুই তো বেবাক বোঝস। আম্মা তুরে যে মারতে কইল। মারণের কথা কইলে হামার যেন কী হয়! পিরিতের কথা, মহব্বতের কথা, সোহাগের কথা বেবাক ভুইল্যা যাই। এট্টা ইবলিশ বইন্যা যাই হামি। পরানে তখন দরদ থাকে না, কলিজায় এতটুকু বেদনা থাকে না। কী যে করুম হামি।" জুলফিকারের কদর্য দেহ সেই দেহের মধ্যে একটি মধুমান মন আকুল হয়ে উঠল।

আতরজান ফুঁসলো, "যা, যা, উই আসমানী শয়তানীর কাছে যা। মাইর‍্যা-ধইর‍্যা আবার মিঠা মিঠা সোহাগের বুলি!" চোখের সেই বন্যাটা আরো উত্তাল হলো আতরজানের। হু-হু কান্নায় উথল-পাথল হচ্ছে সে।

রয়নাবিবির খালে ঢেউ-এর খুশী গমকে গমকে বাজছে। স্রোতের খেয়ালে খেয়ালে এই বেবাজিয়া বহর ঠমকে ঠমকে দুলছে। ছই-এর দরজার ফাক দিয়ে

শ্রাবণ রাত্রির আকাশ নজরে আসে। নৈঋত দিগন্তে কুণ্ডল মেঘ জমেছে। সেই মেঘ চিরে চিরে সাপের জিভের মত বিজুরী চমকায়।

পাটাতনের এক পাশে শিলামূর্তির মত বসে ছিল শঙ্খিনী। তার অপলক দৃষ্টিটা একেবারেই বিস্মিত হয়ে গিয়েছে।

আতরজান! পলকে পলকে তার ঝলসানো মুখে খরধার হাসি চমকায়। যে কোন মুহূর্তে ঘাগরার গোপন কোন গ্রন্থি থেকে একখানা ছোরা বের করে আনে সে। অজগর জিভের মত সেই ছোরার ফলায় মৃত্যু শিউরে ওঠে। কথায় কথায় কাঁচুলির ফাঁস খুলে ফেলে আতরজান। বুকের যুগলকুম্ভের মধ্য থেকে সাঁ করে বেরিয়ে আসে আলাদ গোক্ষুরের ফণা। সেই আতরজান, সেই ভীষণা নাগিনী কোন্ ভোজবাজীতে কুহকিত হলো? কোন্ ইন্দ্রজালে সারা দেহ মথিত হয়ে কান্নার ফোয়ারা ঝরছে তার? দুপুরবেলা জুলফিকারের যে থাবা কেয়াকাঁটার আঘাতে সুতনুকা আতরজানের শরীরটাকে ফালা ফালা করে ফেলেছিল, সেই থাবাই এখন সোহাগে-আদরে রুক্ষমন বেদেনীকে কোন্ রহস্যে ছত্রখান করে দিল? এই কী তবে পিরিতির রীতি? এই কী তবে মহব্বতের মন্ত্রগুপ্তি?

এই সহজ জিজ্ঞাসার পরিষ্কার উত্তরমালা জানা আছে শঙ্খিনীর। একটি প্রেমিক পুরুষ, তার নির্দয় পেষণ, তার নিষ্ঠুর সোহাগ দিয়ে ঘেরা গৃহাঙ্গনের একটি স্বপ্ন আতরজান আর জুলফিকারকে দেখতে দেখতে মনের ভীরু তারে তারে আবার জলদ মিড়ে বেজে উঠল শঙ্খিনীর। নাগমতী মেয়ে ভুলে গেল, সারাদিন পেটে এক দানা ভাত পড়ে নি, এক বিন্দু জল পড়ে নি জিভে। অস্থিমেদের এই দেহটির পুষ্টির জন্য যে ক্ষুধাতৃষ্ণা, তার বাইরে দেহাতীত একটি প্রবল পিপাসা, একটি প্রখর কামনা রয়েছে শঙ্খিনীর। সেই পিপাসাকে কেয়াশাখার শাসনে বার বার হত্যা করতে চেয়েছে জুলফিকার। কিন্তু এই মুহূর্তে জুলফিকার আর আতরজানকে দেখতে দেখতে সেই পিপাসা, সেই কামনা একটি অভুক্ত বেদেনীতনুর সকল ইন্দ্রিয়ে দুর্বার হয়ে উঠল; শঙ্খিনী নামে একটি নারীমনে রিমঝিম করে উঠল।

পাটাতনের একপাশে ভাত আর ছালুনের সানকদুটো পড়ে রয়েছে। আচমকা একান্তই আচমকা শঙ্খিনীর দৃষ্টিটা সেই সানকদুটোর উপর এসে পড়ল। সারাটা দিন এই ছই-এর গর্ভলোকে বন্দী রয়েছে শঙ্খিনী, পেটের নাড়ীতে নাড়ীতে ক্ষুধার বাসুকি ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। জুলফিকার আর আতরজানের পিরিতির রীতি দেখতে দেখতে ক্ষুধার বোধটা অবসন্ন হয়ে গিয়েছিল। বোরো চালের মোটা মোটা ভাত আর লাল রঙের খানিকটা ছালুন পেটের সেই বাসুকিটাকে আবার উত্তেজিত করে তুলল। ডানহাতটা সানকদুটোর দিকে বাড়িয়ে দিল শঙ্খিনী; তারপরেই শামুকের বুকের মত গুটিয়ে নিয়ে এলো।

জুলফিকার বলল, "তুর লেইগ্যা ভাত আনছি আতরজান। সারাটা দিন তুই খাইস নাই। এইবার উইঠ্যা খা। হামার মাথা খাইস আতর, তুই ভাত

না খাইলে গলায় রশি দিমু নিঘ্ঘাৎ।"

একটা তার ছেঁড়া সারঙ্গীর মত ঝঙ্কার দিয়ে উঠল আতরজান, "পিরিত কত? সোহাগের ঠ্যালায় হামার পরান এক্কেবারে দরিয়ায় নাকানি-চুবানি খাইতে আছে! হারামজাদা, জিন—হামার লেইগ্যা তো ভাত আনছিস, কিন্তুক উই শঙ্খ খাইব কী?"

"ইয়া আল্লা, উর লেইগ্যাও তো ভাত লইয়্যা আইছি।"

অভিমান আর অনুনয়। সোহাগ আর পিরিতের আবেশে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। জুলফিকার আর আতরজান। আর সেই অবসরে গুটিয়ে-আনা হাতখানাকে সানক দু'টির দিকে আবার প্রসারিত করে দিয়েছিল শঙ্খনী। তারপর দু'টি আবিষ্ট মানব-মানবীর অগোচরে দু'সানক ভাত আর ছালুন নিঃশেষ করে ফেলেছিল।

এতক্ষণে জুলফিকারের অনেক আদর, অজস্র অনুনয় চরিতার্থ হলো। পাটাতনের ওপর উঠে বসল আতরজান।

জুলফিকার বলল, "হামার আতরগুল, দুফারে তুরে মারছিলাম। শরীল (শরীর) বেদনা করে তুর? দরদ লাগে?"

আহ্লাদী গলায় আতরজান বলল, "লাগে তো! বড় খিদা পাইছে ভাত কই?"

"এই তো!"

পিছন দিকে ফিরে তাকাল আতরজান আর জুলফিকার। আর তাকিয়েই দু'জোড়া চোখ স্তব্ধ হয়ে গেল। সানক দুটিতে এককণা ভাতও আর অবশিষ্ট নেই।

গর্জে উঠল জুলফিকার, "হারামজাদী, দুই সানক ভাত শ্যাষ কইর‍্যা ফেললি তুই? এক্কেবারে জানে খাইয়্যা ফেলুম না! হামি কী খাইতে দিমু আতরগুলেরে? ইয়া খোদা বিসমিল্লা!" শেষের দিকে গলা থেকে গর্জন মুছে গেল জুলফিকারের; মুখচোখের ভঙ্গি কেমন যেন অসহায় দেখাচ্ছে, "এত রাইত হইয়্যা গেল, হামি অখন কী খাইতে দেই হামার আতরজানেরে! কী দেই!"

ঝলসানো মুখের মধ্যে সেই খরশান হাসিটা খল খল করে বেজে উঠল আতরজানের, "হামি খামু না জুলফিকার। শঙ্খনী পোলাপান মানুষ, সারাদিন উর প্যাটে কিছুই পড়ে নাই। হামি তো এক বোতল মদ গিলছি, সারা গা দিয়া তুর মাইর (মার) খাইছি। হিঃ-হিঃ-হিঃ—শঙ্খ পোলাপান। হিঃ-হিঃ-হিঃ—"

এতক্ষণ একটা নিশ্চিত অপঘাতের আশঙ্কায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল শঙ্খনীর। যে কোন মুহূর্তে একটা শিকারী বাজপাখীর মত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে জুলফিকার।

কিন্তু কিছুই ঘটলো না। অতিকায় দেহটাকে টানতে টানতে শঙ্খনীর পাশে চলে এলো জুলফিকার। আশ্চর্য অবিশ্বাস্য গলায় সে বলল; তার কণ্ঠ

থেকে বিন্দু বিন্দু স্নেহ ক্ষরিত হচ্ছে যেন, "তুই ডরাইস না লো শঙ্খিনী। হামার আতরগুল যখন কইছে, তুরে হামি মারুম না।"

দুপুর বেলার সেই জুলফিকারের যেন জন্মান্তর ঘটেছে। এই মুহূর্তের পরশপাথর লেগে কুৎসিত জুলফিকার অপরূপ হয়ে উঠেছে, ভয়ঙ্কর জুলফিকার স্নিগ্ধ হয়েছে! ক্ষমাসুন্দর দেখাচ্ছে তাকে।

সহসা. শ্রাবণের ত্রিযামাকে চৌচির করে শঙ্খচিল ডাকল। শঙ্খচিল নয়, আম্মা আসমানী, "কই রে জুলফিকার, কুথায় গিয়া মরলি? ইবলিশের ছাও, এই নৌকায় আয়—"

চকিত হয়ে উঠে দাঁড়াল জুলফিকার। কালো দেহটার ওপর দিয়ে একটা শিহর খেলে গেল তার। বিশাল শরীরটাকে ধনুকের মত বাঁকিয়ে ছই-এর বাইরে এলো সে, তারপর তালা লাগিয়ে পাশের নৌকার দিকে চলে গেল।

একটু পরেই জুলফিকারের ভারী ভারী পায়ের শব্দ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে মিলিয়ে গেল।

সাত

পাটাতনের উপর চারটে ডাবা হারিকেন জ্বালিয়ে দিয়েছে আসমানী। আর সেই আলোর চারপাশে বৃত্তের মত ঘন হয়ে বসেছে জুলফিকার, যোশেফ, রাজাসাহেব আর আসমানী স্বয়ং। জুলফিকারের দুই থাবায় দু'টি বিশাল ছোরা নিষ্ঠুরভাবে ধরা রয়েছে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে যোশেফ আর রাজাসাহেব নাগরপুর গ্রামে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য মহৎ। বর্ষার রাত। গৃহী পৃথিবীটা একটি নিবিড় আর নিটোল ঘুমের সাধনায় নিঃসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে। আর সেই ঘুমের সুযোগে ঘরে ঘরে নিশ্চিন্ত পুলকে সিঁধকাঠি চালিয়েছে দুজনে; তারপর একটু আগেই বহরে ফিরে এসেছে।

আসমানীর চোখজোড়া সাপের মাথার মণির মত ঝলসে উঠল। ক্রূর গলায় সে বলল, "তৃবা খোদা আর বিষহরির নামে কসম খা।"

"ক্যান?" রাজাসাহেব আর যোশেফ। দু'টি কণ্ঠেই একটি বিস্মিত জিজ্ঞাসা ফুটে বেরুল।

"ক্যান আবার? গেরাম থিকা সিঁদ দিয়া ফিরলি! কোন জিনিস সরাইয়্যা রাখস নাই তো! রাখলে বিষহরির মাইয়া (সাপ) তোগো জানে খাইয়্যা ফেলব। আল্লাতাল্লা তোগো মাথায় ঠাটা (বাজ) ফেলব। খা, খা, শয়তানের ছাওয়া—কসম খা।"

চারটে হারিকেনের আলো ফলিত হয়ে একটা ধাতুমূর্তির মত দেখাচ্ছে আসমানিকে। তার দু'টি চোখ ফণা তুলে যেন স্থির হয়ে রয়েছে রাজাসাহেব আর যোশেফের দিকে।

কপাল, বুক আর দুই বাহুসন্ধি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রুশ আঁকছিল যোশেফ। সে আর রাজাসাহেব নির্বিকার গলার শপথ উচ্চারণ করল, "খোদার কসম, বিষহরির কসম। চুরির কোন জিনিস হামরা সরাই নাই।"

"তবে বাইর কর। দেখি কী আনছিস জিনের বাচ্চা জিনেরা।"

পাশ থেকে দু'টি বস্তা তুলে পাটাতনের উপর ঢেলে দিল যোশেফ আর রাজাসাহেব। সোনার বাজু, বনফুল, রক্তপাথরের নাকঠাসা, বেসর, কাঁসার থালা-বাসন থেকে শুরু করে রঙদার ডুরে শাড়ি, রেশমী লুঙ্গি, ডোরাকাটা পিরহান, পিতলের পিলসুজ, ভরনের গয়না, কৃষাণ-বধূর আয়নাচুড়ি, গন্ধ সাবান—সমস্ত কিছু ছড়িয়ে পড়ল। মাত্র দু'টি প্রহরের মধ্যে ছোট্ট কৃষাণী জনপদ নাগরপুরের বধূ-কন্যাদের সকল সৌখিন শখগুলিকে হাতিয়ে নিয়ে এসেছে যোশেফ আর রাজাসাহেব।

আসমানী বলল, "আর কী আনছিস তুরা?"

"আর কিছুই না। খোদার কসম, তুর নানার কসম আম্মা।" সমস্বরে চিৎকার করে উঠল রাজাসাহেব আর যোশেফ।

আসমানী বলল, "সিঁদ কাটতে তো গেছিলি! খুনখারাপি কিছু হইছে?"

রাজাসাহেবের বাঁকা ঠোঁট দুটির উপর খঞ্জের মত একটি হাসি ফুটল, "তেমন কিছু না আম্মা! সেই চরকান্দার লাখান (মত) গলা টিপা মারতে হয় নাই। সেই কুমিল্লার বারুই মহাজনটার লাখান কলিজায় ছোরাও বসাইতে হয় নাই। খালি এক বাড়িতে একটা বুড়ী সজাগ আছিল, সিঁদকাঠির ঘা দিয়া তার মাথাটা দুই ভাগ করতে হইছে। আর কিছু না। এই গেরামের মানুষগুলির জবর ঘুম। যেন্ মুর্দা। হাঃ-হাঃ-হাঃ—" শ্রাবণ রাত্রির আকাশকে ফাটিয়ে ফাটিয়ে হেসে উঠল রাজাসাহেব।

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বেসর-বনফুল, খাড়ু-পৈছাগুলো পাটাতনের নীচে, ছই-এর বাতায়, তামাকের চোঙায়, চক্রচূড় আর উদয়নাগের ঝাঁপিতে, বেবাজিয়া নৌকার সকল গোপন অন্ধি-সন্ধিতে চালান করে দিল আসমানী। তারপর কঠিন গলায় ডাকলো, "জুলফিকার!"

কোন জবাব দিল না জুলফিকার। শুধু দাঁতাল শুয়ারের মত দু'টি ক্রুর চোখে তাকালো একবার। আশ্চর্য! একটু আগে শঙ্খিনীদের নৌকায় জুলফিকারের যে সুন্দর জন্মান্তরটি হয়েছিল, এই মুহূর্তে সেটা যেন নিতান্তই মিথ্যে হয়ে গেল। তার কণ্ঠ থেকে স্নেহ মুছে গিয়েছে, দৃষ্টি থেকে মমতা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। আসমানী নামে এক কুহকিনীর ভোজবাজীতে আবার ভয়ানক হয়ে উঠেছে জুলফিকার।

আসমানী বলল, "এই যুশেইফ্যা, কয়টা বাড়িতে সিঁদ কাটছিলি তুই?"

"সাত বাড়িতে।"

উত্তেজনার মুহূর্তে ঘন ঘন ক্রুশ এঁকে চলল যোশেফ; বিড় বিড় মন্ত্রোচ্চারের মত সে বলে চলেছে, "ফাদার যীশু, মাদার মেরী; মাদার মেরী,

ফাদার যীশু। জয় মা বিষহরি! জয় মা জাঙ্গুলি!”

রাজাসাহেবের দিকে তাকালো আসমানী, “আর তুই কয় বাড়িতে সিঁদ দিছিস?”

“হামি ছয় বাড়িতে।”

“শয়তানের বাচ্চারা এতগুলি বাড়িতে সিঁদ দিয়া এই জিনিস আনছিস। জানে খাইয়্যা ফেলুম তোগো; শিগ্‌গীর বাইর কর আর কী আছে! না হইলে—” একটা ভয়াল ইঙ্গিত দিল আসমানী। বিধ্বস্ত কয়েকটি দাঁত কড়মড় করে বেজে উঠল তার।

“আর কিছুই নাই। এক্কেবারে সাচা (সত্য) কথাটা কইলাম। তুর কাছে মিছা কইতে পারি আম্মা! হে-হে—তুই ছাড়া হামাগো আর কে আছে?” হাব্‌সী পাঠের মত পবিত্র শোনাল রাজাসাহেব ও যোশেফের গলা, “হামরা উই চুরির জিনিস নিয়া কী করুম? রাখুম কুথায়?” শেষ দিকে আশ্চর্য নিরাসক্ত হয়ে এলো দু’টি বেবাজিয়া কণ্ঠ।

আসমানীর মুখেচোখে এবার বজ্র চমকাল, “এই জুলফিকার, দ্যাখ্‌ তো. শয়তান দুইটারে তল্লাস কইর‍্যা দ্যাখ্‌।”

থাবা থেকে ছোরা দুটি পাটাতনের উপর রেখে, হারিকেনের উলঙ্গ আলোতে রাজাসাহেব আর যোশেফের লুঙ্গি টেনে খুলে ফেলল জুলফিকার! দু’টি দেহের সমস্ত গোপন প্রদেশগুলি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছুই আবিষ্কার করতে পারলো না সে।

হতাশ গলায় আসমানী বলল, “যা হারামীর বাচ্চারা। ভাগ্‌—”

কোমরে লুঙ্গির গ্রন্হি বাঁধতে বাঁধতে ছই-এর বাইরে বেরিয়ে এলো রাজাসাহেব আর যোশেফ। আর ভেতরে আসমানী আর জুলফিকারের ভয়াল পাহারার মধ্যে সঞ্চিত হয়ে রইল তাদের পরিশ্রমের সোনালী সাফল্য। নাগপুরের ঘরে ঘরে সিঁদকাঠি চালিয়ে বধূ-কন্যাদের যে সৌখিন শখগুলিকে তারা হাতিয়ে এনেছিল, আসমানীদেব হেফাজতে সে সব রেখে আসতে হলো।

বাইরের ডোরায় দাঁড়িয়ে দৃষ্টি থেকে রাশি রাশি রোষ আর অজস্র নিরুপায় আক্রোশ ছই-এর দেওয়ালে ছুঁড়ে মারল যোশেফ আর রাজাসাহেব। বিড় বিড় গলায় যোশেফ বলল, “হামরা জান কবুল কইর‍্যা গেরাম থিকা জিনিস আনুম আর উই দুইটা শয়তানের বাচ্চা বেবাক কাইড়্যা নিব। আইচ্ছা—”

“আইচ্ছা, দিনের লাগুড় (নাগাল) পাইলে হামরাও দেখুম।” রাজাসাহেবের গলায় একটি তীব্র অসন্তোষ টগবগ করে ফুটে উঠল।

যোশেফ বলল, “গোলাপীটা হামারে এত পিরিত করে, উরে কিছু এট্টা দিতে পাবি না। বেবাকই বরাত। তুই দেইখ্যা নিস রাজাসাহেব, উই আসমানী মাগীটা হামাগো কলিজার রক্ত চুইষ্যা খাইব!” ঘন ঘন ক্রুশ এঁকে চলল সে।

কোন জবাব দিল না রাজাসাহেব।

শ্রাবণের আকাশ থেকে রাত্রি শেষের অন্ধকার আরও গহন হয়ে নামছে। কেয়াবন, কাশঝোপ আর আটকিরার অরণ্য আশ্চর্য রহস্যময় হয়ে উঠেছে। রয়নাবিবির খালটা বিরাট একটা অজগর দেহের মত টলমল করছে। ঈশান আকাশে পাণ্ডুর রঙের কয়েকটি তারা ফুটে বেরিয়েছে।

এক সময় যোশেফ বলল, "হামি এইবার যাই রে রাজাসাহেব। এই শ্যাষ রাইতে গিয়া আবার গোলাপীর ঘুম ভাঙ্গাইতে হইব। অভিমান ছুটাইতে হইব। তুই আর কী করবি রাজাসাহেব! আইজ রাইতে তুর শঙ্খিনীর কাছে যাওনের উপায় নাই। এই পাটাতনের উপর বইস্যা বইস্যা মশা মারতে থাকু রাজাসাহেব! হামি যাই। হাঃ-হাঃ-হাঃ—" কর্কশ গলায় অট্টহাসি বেজে উঠল যোশেফের। তারপর দ্রুত পদক্ষেপে ওপাশের একটা ঘাসি নৌকার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রাজাসাহেব। তারপরেই একটু একটু করে একটি নিঃশব্দ হাসি সারা মুখের ছড়িয়ে পড়ল তার। বিজয়ের হাসি। গৌরবের হাসি। একটি আংটি এখনও তার কাছে রয়েছে। সারা দেহের প্রতিটি অন্ধি-সন্ধি তন্ন তন্ন করে হাতড়িয়েও কোনদিনই তার সন্ধান পাবে না জুলফিকার কী আসমানী। গলার মধ্যে, সকল দৃষ্টির বাইরে একটি গোপন থলি আছে রাজাসাহেবের। সেখানেই নির্বিবাদে বিরাজ করছে আংটিটা?

আচমকা মনের উপর এক খণ্ড কুটিল মেঘের ছায়া এসে পড়ল রাজাসাহেবের। শ্রাবণের এই রাত্রি, সিঁদকাঠি চালানোর উত্তেজনা, আসমানী, জুলফিকার—এদের বাইরে শঙ্খিনী নামে যে একটি সুঠামতনু বেদেনী আছে, সেই নাগকন্যাকে ঘিরে যে একটি রমণীয় স্বপ্নের অবকাশ রয়েছে, সে কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল রাজাসহেব। সহসা, একান্তই সহসা সমস্ত চেতনাটা বিভ্রান্ত হয়ে গেল তার। আজ দুপুরে তাদের বহরে মহব্বত এসেছিল। শঙ্খিনী তাকে বাদশাজাদা নামটি উপহার দিয়েছে। তার কাছে মধুর গুঞ্জনে গুঞ্জনে গৃহী জীবনের বাসনার কথা বলেছে, ছায়াতরুর নীচে নীড় বাঁধার কামনাটিকে প্রকাশ করেছে। কুহকবতী বেদেনী। কৌতুকময়ী যাযাবরী। কিন্ত মহব্বতের সামনে বসে বসে যখন একটি মৌমাছির মত সে গুন গুন করছিল, তখন তার কণ্ঠে কৌতুক ছিল না, এতটুকু রঙ্গরসের আভাস ছিল না। ঘনিষ্ঠ পরিজনের মত মনের প্রিয়তম স্বপ্নটির কথা মহব্বতের কাছে বলেছিল শঙ্খিনী।

না, না—এ ভাল নয়। এর মধ্যে কোথায় যেন একটি অশুভ সংকেত রয়েছে। না, না, শঙ্খিনী আর সে; তাদের দু'জনের মধ্যে মহব্বত নামে একটি ছায়ার সঞ্চার হোক, এ চায় না রাজাসাহেব।

সারাটা দিন, তারপর রাত্রির এতগুলি প্রহর নানা কাজকর্মের পাখনায় সওয়ার হয়ে উড়ে গিয়েছে। এখন, এই শ্রাবণ রাত্রির শেষ যামে শঙ্খিনীর ভাবনায় সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল রাজাসাহেবের। আসমানীর এই বহরে তাদের কৈশোর পার হয়েছে। তারপর পাশাপাশি যৌবন পেয়েছে দু'জনে।

তার মনের মধ্যে গুনগুন নিয়ে উঠেছে নতুন বয়সের মৌমাছি, বাঘের মত চোখ দুটোতে কী এক মাদক ছায়া নেমেছে। আর সুতনকা শঙ্খিনীর কথা ফুটেছে কৃষ্ণকলি হয়ে, অস্ফুট কোরকের মত দু'টি বুক একদিন যুগলকুম্ভ হয়ে উঠেছে, তার কটাক্ষে বিজুরী চমকেছে, কী সুঠাম হয়েছে নিতম্ব, কী সুন্দর হয়েছে চিবুক! সমস্ত তনুমন একটি নিবেদনের জন্য কী আকুলই না হয়ে উঠেছে শঙ্খিনীর !

প্রথম কৈশোর থেকে মধ্য যৌবন। কতগুলি দিন, কত দুঃখসুখ, কত হাসি-কান্নার পান্না সমান ভাগে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে দু'জনে। রাজাসাহেব আর শঙ্খিনী। না, না—আজ অন্তত শঙ্খিনীর ভাবনাকে মহব্বত নামে দ্বিতীয় পুরুষ এসে দোলা দিক, এ চায় না রাজাসাহেব। এ কিছুতেই সইবে না সে। যেমন করেই হোক শঙ্খিনীর চেতনা থেকে, কামনা থেকে মহব্বতের চকিত ছায়াটুকু সরিয়ে দিতে হবে। দিতেই হবে। যেমন করেই হোক।

গলার গোপন থলিতে একটি আংটি রয়েছে। সকলের অগোচরে সরিয়ে রেখেছিল রাজাসাহেব। এই আংটির কুহক দিয়ে শঙ্খিনীর মন থেকে মহব্বতের ছায়াকে, দ্বিতীয় পুরুষের আবির্ভাবের সকল সম্ভাবনাকে সে নিশ্চিহ্ন করে দেবে !

কর্তব্য স্থির করে ফেলল রাজাসাহেব !

আতরজান আর শঙ্খিনী যে নৌকায় বন্দী হয়েছিল, এক সময় সেই নৌকার পাটাতনে এসে দাঁড়াল রাজাসাহেব। ঝাঁপের পাশ থেকে ফিস ফিস গলায় সে ডাকল, "শঙ্খ—এই শঙ্খ—কী করতে আছিস ?"

সারা রাত্রি আসমান-জমিন একাকার করে ভেবেছে শঙ্খিনী! চোখের পাতাদুটো একবারের জন্যও ঘুমের আঠায় জড়িয়ে আসে নি তার। এই ভাসমান জীবন, এই নিরুপায় বন্দীত্ব, তার নারীমনের সকল কামনা আর বাসনার এই অপমান—এই বেদেবহরের প্রেতলোক থেকে কোথায়, কতদূরে মুক্তির সেই প্রসন্ন দিগন্ত ? যেমন করেই হোক, সে পলাতক হবে এখান থেকে। এই যাযাবর জীবনের অভিশাপ থেকে ফেরারী হয়ে এমন কোথাও উধাও হবে, যেখানে জুলফিকার আর আসমানী অপযোনির মত তাকে কোনদিনই ধাওয়া করে যেতে পারবে না। আজ দুপুরে তাদের বহরে এসেছিল একটা নতুন মানুষ। মহব্বত। তার বাদশাজাদা। সেই বাদশাজাদার চোখে-মুখে যেন তারই বাসনার প্রতিচ্ছায়া। মহব্বতের কথায় একটি সুন্দর মুক্তির ইঙ্গিতই কী পেয়েছে শঙ্খিনী! সারা রাত্রি অতন্দ্র চোখে সেই মুক্তির স্বপ্নই কী দেখেছে নাগমতী বেদের মেয়ে ? আচমকা ভাবনাটা একটা প্রখর ঝাঁকানিতে ছত্রখান হয়ে গেল শঙ্খিনীর।

রাজাসাহেব আবারও ডাকল, "শঙ্খিনী, এই শঙ্খিনী—এক্কেবারে শ্যাষ ঘুম ঘুমাইলি না কী ?"।

একপাশ নিটোল ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেছে আতরজান। ভোঁস্ ভোঁস্ শব্দে নাকের বাজনা বাজছে একটানা। অবিরাম। সকাল বেলা আকণ্ঠ দেশী মদ আর দিক্ রাত্তিরে মন ভরে জুলফিকারের সোহাগের মদ গিলেছিল আতরজান। দেশী মদ আর সোহাগ-মদে দেহমনের সকল ইন্দ্রিয়গুলি মাতাল হয়ে গিয়েছিল তার। একটি সুখঘুমে মাতাল আতরজান এখন পরিতৃপ্ত হচ্ছে। চরিতার্থ হচ্ছে। তার দিকে একবার তাকিয়ে বিরক্ত গলায় শঙ্খিনী বলল, "কী—কী মতলব তুর ? কী রে রাজাসাহেব ?"

'হে-হে, তুর লগে হামার সারা জনমের কথা আছে শঙ্খিনী ! তুই হামার খুশবু বেগম। তুই হামার বাদশাজাদী।" সরস পরিহাসে উদ্বেল হয়ে উঠতে চাইল রাজাসাহেব, "আয়, বাহির হইয়্যা আয় হামার জলপৈরী, হামার ডানাকাটা হুরী !"

শঙ্খিনী বলল, "বাইর হমু ক্যামনে ? বাইর থিকা তালা দিয়া দিছে যে !"

"তালা ভাঙ্গুম ?"

ছই-এর মধ্যে দাঁতমুখ খিঁচাবার আভাস পাওয়া গেল। শঙ্খিনী গর্জে উঠল, "তালা ভাঙ্গলে তুর জান নিয়া নিব আম্মা। সেই ডর না থাকলে তালা ভাঙ্গতে পারস।"

রাজাসাহেব অন্য কথার হাল চেপে ধরল, "তুই এত রাইত তরি (পর্যন্ত) জাইগ্যা রইছিস শঙ্খিনী। হে-হে, হামার ভাবনা ভাবতে আছিলি বুঝি ! হে-হে, তুই জবর মিঠা। একেবারে খাজুর রসের লাখান (মত)।"

"হামার লেইগ্যা সোহাগ দেখি টগরবগর কইর‍্যা ফোটে। মতলবখান কী ? তুই তো উই আম্মা মাগীর পিরিতের পুত ! তার কথার বাইরে তো কোন কাম করস না তুই। সেই বুড়ী মাগীর কাছেই ছোক্ ছোক্ করতে যা। হামার কাছে ক্যান ?"

শঙ্খিনীর কণ্ঠটা আশ্চর্য হিংস্র। বড় বেতরিবত শোনাচ্ছে। চমকে উঠল রাজাসাহেব। এতক্ষণ সারাদেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, অস্থিমজ্জায়, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে যে আশাটাকে লালন করছিল রাজাসাহেব, এই মুহূর্তে সেটা যেন একটা অসত্য ছলনা হয়ে, একটা অবাস্তব বিভ্রান্তি হয়ে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। বুকের মধ্যে কোথায় যেন রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে রাজাসাহেবের।

এখনও পঞ্চশরের শেষ শর তূণীরে তোলা রয়েছে। পলকপাতের মধ্যে গলার গোপন থলি থেকে আংটিটা বের করে আনল রাজাসাহেব ; তারপর পৃথিবীর সকল আবেগ, সকল আবেশ কণ্ঠে সঞ্চারিত করে দিল, "শঙ্খিনী, তুর লেইগ্যা হামি এট্টা জিনিস আনছি। তুরে হামি কত পিরিত করি, কিন্তুক তুই জবর বেদরদী।"

"কী জিনিস ?" শঙ্খিনীর গলায় নির্লিপ্ত কৌতূহল।

"আতরজান ঘুমাইয়্যা আছে তো ! হে-হে—ইটু গোপন জিনিস। হে-হে—বুঝলি কী না !"

"হ, হ, ঘুমাইয়্যা আছে। কী আনছিস, তাই ক' বান্দীর বাচ্চা !"

ফিস ফিস গলায় রাজাসাহেব বলল, "আইজ রাইতে এই গেরামে সিঁদ কাটতে গেছিলাম। চুরির বেবাক জিনিস আম্মা মাগীরে দিয়া দিছি। খালি এই আংটিটা তুর লেইগ্যা লুকাইয়্যা রাখছিলাম। এই নে—"

ঝড়বৃষ্টির অবিরাম আঘাতে আঘাতে ছই-এর একটা দিক ভেঙে গিয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে ডান হাতখানা বাইরে প্রসারিত করে দিল শঙ্খিনী। তার মুঠির মধ্যে একটি আংটিতে পুরুষ-মনের সকল মাধুর্য, সকল প্রীতি মিশিয়ে গুঁজে দিল রাজাসাহেব, "তুই খুশী তো শঙ্খিনী! তুই খালি হামার উপর বেজার হইয়া থাকস। তুই তো জানস না; তুই বেজার হইয়্যা থাকলে হামার পরানটা কেমুন জানি করে!"

"কেমুন করে! আসমানের পঙ্খী হইয়্যা উড়াল দিতে চায়!" এবার অতিকায় ঘাসি নৌকাটাকে দুলিয়ে দুলিয়ে খিল খিল গলায় হেসে উঠল শঙ্খিনী! আর সেই হাসির বাতাসে রাজাসাহেবের মন থেকে সব মেঘ, সব আশঙ্কা উড়ে উড়ে যেতে লাগল। রাজাসাহেব ভাবলো, দ্বিতীয় পুরুষের সেই সম্ভাবনা শঙ্খিনীর চেতনা থেকে কী একেবারেই মুছে গিয়েছে।

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। শঙ্খিনীর হাতখানা তখনও নিজের মুঠোর মধ্যে নিবিড় বন্ধনে জড়িয়ে রেখেছে রাজাসাহেব।

সহসা শঙ্খিনী বলল, "হামি যে এই বেবাজিয়া নৌকার ছই-এ আটকা থাকি, এই যে এত বেদনা পাই শরীলে (শরীরে), এত দরদ পাই মনে—এই কী তুই চাইস রাজাসাহেব?"

বিস্রস্ত গলায় জবাব দিল রাজাসাহেব, "না তো, কে কইছে?"

"তবে তুই হামারে এই দোজখ (নরক) থিকা নিয়া চল রাজাসাহেব! খালি তুই আর হামি। এখন আন্ধার রাইত। বহরের বেবাক মানুষ ঘুমাইয়্যা রইছে। চল, হামরা পলাইয়্যা যাই। কেউ ট্যার পাইব না। হামরা দুইজনে কিষাণ গো লাখান (মত) ঘর বান্ধুম, হামাগো ছানাপোনা হইব। কত সুখ পামু দুইজনে। তুই হামারে এই কবর থিকা বাঁচা রাজাসাহেব। সারা জনম হামি তুর বান্দী হইয়া থাকুম।" অনুনয়ে, করুণ প্রার্থনায় ছই-এর ঘেরাটোপে শঙ্খিনী নামে একটি বেদেনী-মন, শঙ্খিনী নামে একটি বেদেনীকণ্ঠ আকুল হয়ে উঠল। আর রাজাসাহেবের চমকিত মুঠির মধ্য থেকে তার হাতখানা শিথিল হয়ে ঝরে পড়ল।

শঙ্খিনী বলল, "কী হইল তুর রাজাসাহেব?"

আর্তনাদ করে উঠল রাজাসাহেব, "না না—এই কামটা হামি পারুম না। হামরা বেবাজিয়া। বহর ছাইড়্যা কুথায়ও গিয়া ঘর বানলে (বাঁধলে) বিষহরির গুণাহ্ আইস্যা পড়ব। আল্লা গোসা হইব। খেয়াল নাই, দুফার বেলায় আম্মা তুরে কী করল? এইবার জানতে পারলে তুরে হামারে দুইজনেরেই এক্কেবারে ছালুন বানাইয়্যা খাইব। ইয়া খোদাতাল্লা! এই কামে হামি নাই রে শঙ্খ। পলাইতে হামি পারুম না!"

"তবে যা রে শয়তানের ছাও। হামার কাছে আর কুনোদিনই সোহাগ

ফুটাইতে আসবি না।" বলতে বলতে হাতের মুঠি থেকে রাজাসাহেবের সেই আংটিটাকে রয়নাবিবির খালে ছুঁড়ে দিল শঙ্খিনী।

আর অনাবরণ আকাশের নীচে, এই গুণ্ঠনহীন পাটাতনের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাজাসাহেবের মনে হলো, এই রয়নাবিবির খালের অনেক, অনেক অতলে বাসুকির ফণাটা দুলে উঠেছে। এই জলের দেশ, এই বিশাল জীবজগৎ ভারসাম্য হারিয়ে টলমল করছে।

আট

বরণকুলা আনো সখি, বরণকুলা আনো—
আমরা শ্যামের ঘাটে যাই।
আমরা জল সইতে যাই।
ঘিয়ের পিদীম জ্বালাও সখি, ঘিয়ের পিদীম জ্বালাও,
ধান দিয়া, দূর্বা দিয়া, রামের ওই বরণডালা সাজাও।
আমরা জল সইতে যাই।
সব, ফুল তুলতে যাই।

জনপদকন্যারা এসেছে। এসেছে কৃষাণ-বধূরা। নাগরপুর গ্রামের সীমন্তিনী আর কুমারী মেয়েরা এই দিক্ বাত্তিরে খালের ঘাটে এসেছে জল সইতে। বিয়ে। মানব-মানবীর জীবনে মধুরতম এক বিস্ময়। আর এই বিস্ময়ের আনন্দে সকলের সমান শরিকানা। মেয়েদের সঙ্গে এসেছে জোয়ান ছেলেরা। তাদের হাতে হারিকেন আর পাটখড়ির মশাল।

এয়োরা, ঝিয়ারীরা আর কন্যাকুমারীরা কণ্ঠ মিলিয়ে মিলিয়ে উচ্ছল গানের গন্ধ তুলছে। কয়েকজন প্রথম কলিটি গাইছে:

আইজ রামের অধিবাস,
কাইল রামের বিয়া গো কমলা—

অন্য সকলে বাকি চরণগুলি গেয়ে চলেছে:

আমরা জলে যাই,
সই, আমরা জলে যাই।

দু'পাশে অবারিত ধানবন। গ্রাম্যবধূদের সেই গান শ্রাবণের বাতাসে দোল খেতে খেতে এই রয়নাবিবির খাল, তারপর দু'পাশের ধানবনের উপর ছড়িয়ে পড়ল।

রাজাসাহেব চলে যাবার পর খানিকটা সময় পার হয়েছে। এই সময়টুকুর মধ্যে শঙ্খিনী স্নায়ুতে স্নায়ুতে নানা ভাবনা নাগরদোলার মত বন্ বন্ করে পাক খেয়েছে। অজস্র ভাবনা। এলোমেলো। গ্রন্থিহীন। একটির সঙ্গে আর একটির কোন মিল নেই। সঙ্গতি নেই। শুধু এক দুঃসহ আক্রোশে ইন্দ্রিয়গুলি জ্বালা করে উঠেছে শঙ্খিনীর।

আচমকা এই ছই-এর কারাগারে এক ঝলক মিঠে বাতাস এলো যেন।

বরণকুলা সাজাও লো সই
বরণকুলা সাজাও।

বেবাজিয়া বহরটার ঠিক পাশ থেকেই গান ভেসে আসছে। জলসই-এর গান। বিয়ের আগে অধিবাসের রাত্রে এই গানটি গাওয়া হয়। এই জলের দেশে বহর ভাসিয়ে চলতে চলতে খালের ঘাটে ঘাটে কী নদীর পারে পারে এই গানটি আরও অনেকবার শুনেছে শঙ্খিনী। এই গানটির সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ পরিচয়।

বাইরে থেকে তালা বন্ধ। তবু পরিষ্কার বুঝতে পারছে শঙ্খিনী। জলসই-এর দলটা থেকে কয়েকজন খালে নেমে পড়েছে। জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে, ঢেউ ভেঙে ভেঙে রয়নাবিবির খালটাকে চকিত করে তুলেছে তারা। কয়েকজন পারে দাঁড়িয়ে সাত ঝাঁক উলু দিল। কয়েকটা শাঁখ বাজলো তারস্বরে।

সোরগোল, শাঁখের বাজনা, উলু—সব মিলিয়ে শ্রাবণের এই দিক্ রাত্রি, এই রয়নাবিবির খাল, ধান আর পাটের বন, ছোট্ট জনপদ নাগরপুর মুখর হলো। পুলকিত হলো। আর দূরের বনহিজলের শাখায় একঝাঁক কোড়াল ভীরু গলায় ডেকে উঠল। একজোড়া ইর্মালি পাখি ডানা ঝাপটিয়ে শূন্যে চক্র দিল, তারপরেই আবার শেষ রাত্রির কবোষ্ণ নীড়ে ফিরে এলো। দূরের কোন একজন মহাজন বাড়ি থেকে কুকুরের গলার ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এলো।

খালের পারে একটি উচ্ছল গলার সাড়া পাওয়া গেল, "বেবাক আনন্দ জল সইতে আইস্যা ফুরাইয়্যা ফেলাইলে বাকী থাকব কা ? তরাতরি (তাড়াতাড়ি) বরণকুলাখান খালের জলে ডুবাইয়্যা নে। আবার অধিবাসের বেলা হইয়্যা যাইব। পূব দিকে ভোর হইয়্যা আইল। আলো ফুটবো এইবার।"

একসময় জলসই-এর পালা শেষ হলো। গ্রাম্যবধূরা, কুমারী মেয়েরা, জোয়ান পুরুষেরা ছোট ছোট কোষাডিঙিতে উঠে দূর গ্রামের দিকে মিলিয়ে গেল। বৈঠা দিয়ে জলকাটার ছপ ছপ আওয়াজ, তরুণীকণ্ঠের কলশব্দ, সরস হাসি, সহজ পরিহাস ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে নিশ্চিহ্ন হলো।

এখনও চেতনার মধ্যে জলসই-এর গানটা মৃদু নেশার মত জড়িয়ে রয়েছে শঙ্খিনীর, 'আইজ রামের অধিবাস, কাইল রামের বিয়া গো কমলা—'

ছই-এর ফাঁকফোকরের মধ্য দিয়ে দূরতম আকাশ নজরে আসে। পুবালি চক্ররেখায় ছায়া ছায়া এক আস্তর আলোর ছোপ ধরেছে। বনহিজলের শাখা থেকে ডাহুক আর বনকবুতরের ঝাঁক পাখ্না বিস্তার করে দিয়েছে নিঃসীম শূন্যে।

এতক্ষণে পাটাতনের উপর উঠে বসেছে আতরজান। শ্রাবণের রাত্রিটা একটি নিটোল আর মসৃণ ঘুমে উজিয়ে এসেছে সে। আতরজান বলল, "কী লো শঙ্খ, কখন উঠলি তুই ? সারা রাইত ঘুমাইছিস ক্যামুন ?"

শঙ্খিনীর দু'টি লঘু ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি ফুটলো। ক্লান্ত গলায় সে বলল, "জবর ঘুমাইছি লো আতরজান। এক উয়াসে (নিঃশ্বাসে) হামি রাইত

পোহাইয়্যা ফেলাইছি।"

বাইরে তালা খোলার শব্দ। শঙ্খিনী আর আতরজান উৎকর্ণ হয়ে বসল। ইন্দ্রিয়গুলো ধনুকের ছিলার মত প্রখর হয়ে উঠল তাদের। তালা খুলে ছই-এর মধ্যে এসে দাঁড়ালো গোলাপী।

পুরো একটা দিন এই ছই-এর ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে রয়েছে দু'জনে। কত পল, কত সময়, কত মুহূর্ত পার হয়েছে এর মধ্যে। ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে শ্রাবণের দিন এসেছে, অকৃপণ আলোবাতাস এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে দু'টি বেদেনীর দেহে।

গোলাপী বলল, "আম্মা তুগো যাইতে কইছে।"

"ক্যান?"

"অখনই জড়িবুটি, বিষপাথর আর সাপের ঝাঁপি লইয়্যা বাইর হইতে হইব। রাইত পোহাইয়্যা গেছে কখন!"

তিনটি বেবাজিয়া নারী—শঙ্খিনী, আতরজান আর গোলাপী ছই-এর পাতাল থেকে বাইরের পাটাতনে এসে দাঁড়াল। সামনে রয়নাবিবির খালটা প্রথম রোদের সোহাগে ঝিলমিল করছে। রক্তমাদারের ডালে নিথর হয়ে বসে রয়েছে একটা পান্নারঙের মাছরাঙা। তার ধ্যান-জ্ঞান সমস্ত কিছুই খালের বুকে মাছের একটি উলাসের দিকে কেন্দ্রিত।

খানিকটা পরেই আসমানী, ডহরবিবি, গোলাপী আর শঙ্খিনী ছোট্ট একটি কোষাডিঙিতে এসে উঠল। তাদের মাথায় দুধরাজ, চক্রচূড়, আলাদ গোক্ষুরের ঝাঁপি থরে থরে সাজানো। তাদের কাঁখে জড়িবুটির ডালা, আয়নাচুড়ি আর বিষপাথরের সাজি।

আসমানী বিড় বিড় করে বকে চলেছে। বিরামহীন। যতিহীন। "হারামজাদার ছাও দুইটা অখনও আইল না। কাইল রাইত দুফারে দুইট্টা ভেড়া-ছাগল হাতাইয়্যা আনতে গেছে। অখনও ফির‍্যা আসনের নাম নাই।"

কাল রাত্রে ওসমান আর ইদ্রিস সেই যে ছাগল বাছুরের সন্ধানে বেরিয়েছিল, এখনও তারা বহরে ফিরে আসে নি। তাই আসমানীর বিরক্ত কণ্ঠ থেকে বিড় বিড় ফুলকি ঝরতে শুরু করছে।

গোলাপী আর ডহরবিবি তীক্ষ্ণগলায় টেনে টেনে হাঁকে, "খাঁটি বিষপাথর মা, জরিবুটি। দুধরাজ, শঙ্খরাজ, চক্রচূড়—বেবাক বিষ বিষহরির দোয়ায় উইঠ্যা আসবো। খাঁটি বিষপাথর নিবা মা-আ-আ-আ—"

রয়নাবিবির খালের পারে বৃষ্টিতে সরস হয়ে রয়েছে মাটি। নরম হয়ে রয়েছে। সেই মাটিতে এক সারি অর্জুন গাছ। অর্জুনের শাখায় কয়েকটা শঙ্খচিল রোদের আলোতে পাখনা শুকিয়ে নিচ্ছিল। বেদেনী মেয়েদের শানালো চিৎকারে চকিত হয়ে উঠল তারা। তারপর শ্রাবণের আকাশে পাখা মেলে উড়ে গেল।

দু'পাশে কেয়াকাশের ঝোপ। নল খাগড়ার নিবিড় বন। তারই ফাঁক দিয়ে নজরে আসে, উন্মনা ভুঁইচাপার মত ফুটে রয়েছে কৃষাণীদের চৌচালা।

সতের আর একুশের বন্দের সব ঘর। পরিশ্রমী মানুষের সৌখিন শিল্পবোধ ময়ূরকণ্ঠী টিনের চালে চালে স্থির হয়ে রয়েছে।

গৃহী মানুষের নীড়প্রেম দিয়ে নাগরপুর গ্রাম। তার মধ্য দিয়ে সিঁথির মত চিরে চিরে গিয়েছে রয়নাবিবির খাল। খুশির খেয়ালে ঢেউ-এর মাথায় মাথায় ফেনার ফুলকি ফোটাচ্ছে সে।

হালের বৈঠাটা শক্ত মুঠোয় চেপে স্থির হয়ে বসে ছিল শঙ্খিনী। ইন্দ্রিয়গুলির তারে তারে প্রখর মিড়ে মিড়ে বাজছে জলদ বাজনা। চেতনার ওপর দিয়ে অনেকগুলি মুখের মিছিল, অজস্র ভাবনা সরে সরে যেতে লাগল। তার তরুণী মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে একটি সুন্দর গৃহাঙ্গন, একটি বলিষ্ঠ পুরুষ, মাখনের মত একটি কোমল সন্তান। এই কল্পনাটি, নারীমনের সেই রমণীয় স্বপ্নটি অহরহ তার স্নায়ুগুলিকে দুঃসহ করে তোলে। এই মুহূর্তে শিথিল হাতে হালের বৈঠা টানতে টানতে নাগমতী বেদেনী উদাস হয়ে যায়, তার মন উধাও হয় অজানা-অনামা নিরুদ্দেশে।

একটা গো-বকের মত চিৎকার করে উঠল ডহরবিবি, "আয়নাচুড়ি আছে। নিবি না কী গো মায়েরা, বইনেরা, ঘরের বউরা—নিবা-আ-আ-আ—"

একটু চমকে আবার নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে গেল শঙ্খিনী।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টির তূণ থেকে একটার পর একটা তীর ছুঁড়ছিল আসমানী। শঙ্খিনীর এই উদাস হওয়ার নেপথ্যে কোন্ ভাবনাটি ক্রিয়া করছে, সে খবর জানা আছে তার। এবার গর্জন করে উঠল আসমানী, "বেবাজিয়া মাগীর ঘরের বউ সাজনের ভাবন লাগছে, বৈঠা চালনের মতলব নাই। হারামজাদী, তুই শ্যাষে বিষহরির মাইয়্যার (সাপের) ছোবল খাইয়্যা মরবি। সাচা কথাটা হামি কইলাম। যত বিজাত শখ হইছে তুর!"

শিথিল হাতে এতক্ষণ বৈঠা চালাচ্ছিল শঙ্খিনী। ডিঙির মুখটা স্রোতের খুশিতে অন্যদিকে ঘুরে গিয়েছিল। আসমানীর গর্জন শুনতে শুনতে এবার সতর্ক হয়ে উঠল সে। রয়নাবিবির খালে বৈঠার কয়েকটি চাড় দিয়ে ডিঙির গতিপথ আবার ঠিক করে নিল শঙ্খিনী।

গোলাপী আর ডহরবিবি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, "জরিবুটি নিবা মা, খাঁটি বিষপাথর-র-র-র, দুধরাজ, চক্রচূড়, কালচিতি—বেবাক বিষ মা বিষহরির দোয়ায় উইঠ্যা আসবো।"

জলজঙ্গলের এই ভাসমান দেশ। দেবী বিষহরির আইন রয়েছে সব জায়গায়। এক রশি পথ পারাপার হতে আলাদ গোক্ষুরের ঝকমকে চোখের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হয়। তাই মনসার এই বিষকন্যারা ভাসন্ত নৌকায় ঘুরে ঘুরে একালের লখিন্দরদের পাহারা দিয়ে চলেছে।

"জরিবুটি নিবা গো মা—"

"আয়নাচুড়ি নিবা গো বৌ—"

কোষনৌকাটা খালের খরধারায় এগিয়ে চলেছে। দু' পাশের কৃষাণ বাড়িগুলি ছোট ছোট দ্বীপের মত দেখায়। মাঝে মাঝে হিজল আর মাদারের শাখায়

বয়রা বাঁশ পেতে সাঁকো রচনা করা হয়েছে ।

সামনেই খঞ্জের মত একটা বাঁক ঘুরে রয়নাবিবির খালটা দূরের কোন জনপদের দিকে অদৃশ্য হয়েছে । আর সেই বাঁকের পার থেকেই গানটা ভেসে আসছে :

আইজ রামের অধিবাস,
কাইল রামের বিয়া গো কমলা—

দেহমনের অস্থি-মজ্জা আর সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে উৎকর্ণ করে বসল শঙ্খিনী । এই গানখানা দিক্ রাত্তিরের রয়নাবিবির খালকে চকিত করে তুলেছিল । এই গানখানা অপরূপ এক সংবাদ নিয়ে এসেছে । শ্রাবণদিনের এই মোহন সকালকে বড় ভাল লাগছে শঙ্খিনীর । বড় ভাল লাগছে । কাল সারাটা দিন ছই-এর ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে ছিল সে । হতমান জীবনের সকল অপমান, সকল অগৌরব তাকে দগ্ধ করেছে, তাকে ছত্রখান করেছে । কিন্তু এই অধিবাসের গান ঘরের স্বপ্ন আর গৃহী পুরুষের কামনা দিয়ে নাগমতী বেদেনী সেই শপথকে, সেই অন্তরঙ্গ প্রতিজ্ঞাকে ঋজু করে তুলল । এই মুহূর্তে আবার, আবার মনে হলো শঙ্খিনীর, এই বেবাজিয়া বহর, আসমানী আর জুলফিকার নামে জীবনের দু'টি ভয়ংকর পরিচয় থেকে অনেক, অনেক দূরে কোথাও সে পালিয়ে যাবে । এই গানটা নতুন করে সেই প্রেরণাই যেন নিয়ে এসেছে ।

নৌকাটা আরো অনেকটা এগিয়ে এসেছে । উৎসাহিত গলায় শঙ্খিনী বলল, "আম্মা, এই বাড়িতে শাদী আছে । তই হামারে উই আয়নাচুড়ির ডালাটা দে । দ্যাখ্ কত ট্যাকার মাস বেইচ্যা আসি ।"

আসমানী ধূসর চোখে শঙ্খিনীর দিকে তাকাল । তার দৃষ্টিটা তরপুন হয়ে অস্তিমেদ ফুঁড়ল । না, কোন সন্দেহজনক আভাসই নেই মেয়েটির চোখে-মুখে, এতটুকু বিকার নেই ভাব-ভঙ্গিতে । নিশ্চিন্ত গলায় আসমানী বলল, "এই তো বেবাজিয়ার লাখান কথা বাইর হইচে চোপা (মুখ) থিকা । কামে মন না দিলে চলব ক্যামনে ? উই সব ঘরের বউ সাজনের ভাবন কী হামাগো পোষায় ! যা, ডহরেরে লইয়া আয়নাচুড়ি বেইচ্যা আয় ।"

পারের ভূখণ্ডে কোষাডিঙিটা ভিড়িয়ে, আয়নাচুড়ি, আলতাপাতা, রাঙা ঘুনসির ডালা থরে থরে মাথায় সাজিয়ে ওপরে উঠে এলো ডহরবিবি আর শঙ্খিনী । ডিঙির ওপর বসে রইল আসমানী আর গোলাপী ।

করমচা বনের পাশ দিয়ে আটকিরে ঝোপের মধ্য দিয়ে, কালকাসুন্দে আর দ্রোণফুলের গুচ্ছগুলিকে পেছনে রেখে ছায়ামাখা পথটা এঁকে বেঁকে সুমনের বাড়িতে ফুরিয়ে গিয়েছে । দূরের হিজল শাখায় কাটোরা পাখি খুশি খুশি গলায় ডাকছে । হলদে রঙের এক ঝাঁক ইমলি পাখি চঞ্চল হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে । শ্রাবণের পাখি । বড় মধুর । বড় সুন্দর । এই ছায়াঢাকা পথ, বর্ষার পাখির কূজন, আকাশে থরে থরে মেঘ ··দেখতে দেখতে শঙ্খিনীর মনটা আবিষ্ট হলো । ঘাগরা দুলিয়ে দুলিয়ে সুঠাম দেহে যৌবনের গৌরব তুলে বাড়িটার

উঠানে চলে এলো সে। পেছনে ডহরবিবি।

উঠানের চারপাশে উ'চু মাটির ভিতের ওপর সাতাশের বন্দের ঘর। নীচে শালতক্তার পাটাতন। ওপরে মকরমুখী টিনের চাল। রূপার মত ঝকঝকে টিনে রোদে ঝলকাচ্ছে। কাঠের দেওয়ালগুলিতে বাটালি দিয়ে কেটে কেটে কারুকাজ করা হয়েছে।

গোবরমাটি দিয়ে চত্বরটি নিকানো। মাঝখানে পিটুলি গোলা দিয়ে শ্বেত পদ্ম আর রক্তশালুকের আলপনা আঁকা হয়েছে। তার ওপর ধানদূর্বা ছড়িয়ে রয়েছে। ইতস্তত ছোপ পড়েছে কাঁচা হলুদের। পরিষ্কার বোঝা যায়, একটু আগেই অধিবাস পর্ব শেষ হয়েছে।

তিনটে ঢাকী প্রচণ্ড উৎসাহে পাল্লা দিয়ে বাজাচ্ছে। তাদের গলা আর বুক বেষ্টন করে রেখেছে রূপার মেডেলের মালা। অজস্র মেডেল—কীর্তি আর গৌরবের চিহ্ন। ঢাকের পিঠে সরু কাঠির নিপুণ বোল উঠেছে "কুর্-কুর্—কুর্-কুর্—ধিতাং-তাং—ধিতাং-তাং—"

দুটো ছোকরা বাজনদার কাঁসি বাজাতে বাজাতে বেসামাল হয়ে পড়েছে, "টাং-টাং—কাঁই-না-না, কাঁই-না-না—ট্যাং-ট্যাং—"

নাগরপুর গ্রামের বড় মহাজনের বাড়ি এটা। মহাজনরা বারুই। দেওয়ালে দেওয়ালে নানান কারুকাজে, অনেক সাজে, অজস্র সজ্জায় বাড়িটিতে সমৃদ্ধি ফুটে বেরিয়েছে। ঐশ্বর্য ঝলমল করছে। আজ বড় মহাজনের ছোট ছেলের অধিবাস। কাল বিয়ে।

বাইরমহলের দিক থেকে সানাইয়ের আনন্দিত পোঁ ভেসে আসছে। তার সঙ্গে মধুর বোল তুলে পাল্লা দিচ্ছে ডুগি-ঢোলকের বাজনা।

নাগরপুর গ্রামের কন্যাকুমারীরা, সীমন্তিনী বধূরা বড় গৃহস্থের বাড়ি এসে ভেঙে পড়েছে। জলবাঙলার দিক্‌দিগন্ত থেকে, দূরদূরান্ত থেকে এসেছে প্রিয়মুখ পরিজন, আত্মীয় আর নাইওরীর দল। এই খুশি, জীবনের এই পরম আনন্দের ভাগ সকলে বাটোয়ারা করে নিচ্ছে।

অন্দরমহল থেকে কলকণ্ঠে গানের সুর ভেসে আসছে, 'আইজ রামের অধিবাস, কাইল রামের বিয়া, গো কমলা—'

মাথার ওপর থরে থরে সাজানো আয়নাচুড়ি, আলতাপাতা আর রাঙা ঘুনসির ডালা। দু'টি বেদেনীদেহ উঠানের এক কিনারে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শঙ্খিনী আর ডহরবিবি। শঙ্খিনীর দু'টি চোখ শ্বেতপদ্ম আর রক্তশালুকের আলপনায় অধিবাসের আয়োজন দেখতে দেখতে একেবারেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে।

ঢাকী তিনটে পরিত্রাহি বাজিয়ে চলেছে। যে ভয়ঙ্কর উৎসাহে তারা বাজাচ্ছে, তাতে মনে হয়, ঢাকের চামড়া না ফাঁসা পর্যন্ত তারা থামবে না।

মুখ তুলল শঙ্খিনী। সামনের একটি বাজনদারকে সে বলল, "কার শাদী গো ভাইজান?"

"আমাগো ছোট কর্তার।" কোনদিকে নজর-নিরিখ করার এতটুকু ফুরসত নেই বাজনদারের। বলতে বলতে অখণ্ড মনোযোগে ঢাকের চামড়ায় কাঠি

দিয়ে বোল ফুটাতে লাগলো সে, "হেই ঢাক, কৃষ্ণ কথা ক", "হেই ঢাক, রাধার গান গা।"

ঢাক আর কাঁসি, বাইরমহলের সানাই, অন্দরমহলের কলকণ্ঠ—সব মিলিয়ে বড় মহাজনের বাড়িতে একটা খুশি-খুশি প্রলয় ঘটে চলেছে যেন। যে কোন মুহূর্তে, মনে হয়, এই মহাজন বাড়ি, এই নাগরপুর গ্রাম, দূরের মেঘ, দূরতম আকাশ সপ্ততলের অতল তলায় তলিয়ে যেতে পারে! কী খণ্ড খণ্ড নীহারিকায় চূর্ণিত হতে পারে! তবু মহাজন বাড়ির আনন্দিত হল্লা ভাল লাগছে শঙ্খনীর। বড় ভাল লাগছে।

জুতের ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো বড় মহাজন। ঊর্ধ্বদেহ অনাবৃত, গায়ের রঙ উজ্জ্বল তাম্রাভ। কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ধবধবে থান। নিরুপেক্ষ ভাবে ছাঁটা মাথার চুল। মুখে একটি প্রসন্ন হাসি আঠার মত লেগে রয়েছে।

বড় মহাজনের গলা থেকে মধুর প্রশ্রয় ঝরল, "তোগো জ্বালায় কানের দফারফা হইয়া গেল যে রে রতন, এই মেঘু! এইবার বাবারা ঢাক-কাঁসি থামা। সেই কোন ভোর সকাল থিকা শুরু করছিস!"

হাজার গুণ উৎসাহে ঢাকের ওপর কাঠির আঘাত পড়তে লাগল। কাঁসির স্বর আকাশে চড়ল। পুলকিত গলায় মেঘু ঢাকী বলল, "ক'ন কী বড় কত্তা! ছোট কত্তার বিয়া; এমুন এট্টা শুভদিন, আর ঢাক বাজামু না আমরা! ওরে রসিক হাতে ত্যাল মাইখ্যা কাঁসিতে ঘাই দে। বাজা, বাবা বাজা।"

আচমকা বড় মহাজনের দৃষ্টিটা শঙ্খনী আর ডহরবিবির উপর এসে পড়ল। দু'টি বেদেনীদেহ দেখতে দেখতে ভ্রূ দুটো কাঁকড়া বিছার মত কুঁকড়ে গেল তার, "এই তোরা আবার কারা?"

সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে এলো শঙ্খনী।

সঙ্গে সঙ্গে হুংকার দিয়ে উঠল বড় মহাজন, "থাউক, থাউক। আর আগাইয়া আসতে লাগবো না। ব্যাপার-স্যাপার বেবাক বুঝছি। তোরা তো বাইদ্যানী!"

শান্ত গলায় শঙ্খনী বলল, "হ কত্তা, হামরা শাদী দেখুম। ভাবীজানেরে আয়নাচুড়ি পরামু, আলতাপাতা দিমু।"

বড় মহাজনের গলায় ধাতব গুণ মেশানো রয়েছে। খন খন কণ্ঠে গর্জে উঠল সে "শাদী দেখবি! আয়নাচুড়ি দিবি! তোগো মতলব আমি আর বুঝি নাই! শয়তানের ছাওরা, চুরির তালে ঘুরপাক খাও! এটু এদিক-উদিক হইলে বেবাক হাতাইয়্যা নেওনের মতলব। যা, ভাগ্-ভাগ্—"

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বড় মহাজনের মুখের দিকে তাকাল শঙ্খনী, "না কত্তা, হামাগো কুনো মতলব নাই। খোদাতাল্লার কসম, খোদ বিষহরির কসম। হামরা খালি শাদী দেখুম। তুই হামাগো শাদীটা দেখতে দে কত্তা।"

ইতিমধ্যে ঢাক-কাঁসির পাল্লা থেমে গিয়েছে।

বড় মহাজনের মুখখানা এবার ভয়ানক হয়ে উঠল। পিঙ্গল ভ্রূ-রেখার নীচে

দু'টি চোখ আশ্চর্য হিংস্র দেখাচ্ছে। নির্মম গলায় সে বলল, "এই রতন, এই মেঘু—তোরা এই বাইদ্যা মাগী দুইটারে বাড়ির সীমানা পার কইর‍্যা দিয়া আয়। এমুন এট্টা শুভ দিন! বিয়ার পর ঘরগৃহস্থী পাতবো আমার পোলাটা (ছেলেটা)! আর এই অধিবাসের দিনই বেবাজিয়া মাগীরা আইল। মাগীগো ঘর নাই, দুয়ার নাই, সোংসার নাই। আবার না পোলাটার উপুর শাপ-শাপান্তি আইস্যা পড়ে। তারা, তারা, সবই তোমার ইচ্ছা; ইচ্ছাময়ী তারা—"

তড়িৎ গতিতে কাঁধের ওপর থেকে ঢাক নামিয়ে উঠানে রাখলো রতন আর মেঘু। তারপর ডহরবিবি আর শঙ্খিনীর ওপর আদিম শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল দু'টি পুরুষদেহ। তারও পর টানতে টানতে বাড়ির সীমানা পার করে দিয়ে এলো।

ছায়া ঢাকা, পাখিডাকা নির্জন পথ দিয়ে শঙ্খিনীর আর্তনাদটা ক্ষীণ হয়ে রয়নাবিবির খালের দিকে মিলিয়ে গেল, "হামরা চুরি করতে আসি নাই কত্তা। হামাগো কুনো বেতরিবত মতলব নাই। শাদীটা দেইখ্যা হামরা চইল্যা যামু। ভাবীজানেরে আয়নাচুড়িটা পরাইতে দে কত্তা, আলতাপাতাটা দিতে দে কত্তা—"

করমচা বনের মধ্য দিয়ে, হিজল পাতার ফাঁক দিয়ে জাফরি-কাটা রোদ এসে পড়েছে পথটার ওপর। রক্তমাদারের শাখা থেকে ইমলি পাখির ঝাঁক উড়ে গিয়েছে।

মেঘু ঢাকীর হিংস্র থাবার মধ্যে শঙ্খিনীর নরম মণিবন্ধটা যেন চুরমার হয়ে গিয়েছে। পথ চলতে চলতে তার কানে বাইরমহলের সানাই উদ্দাম হয়ে বাজতে লাগলো। আর অন্দরমহলের সেই গানটা আরো, আরো জোরে প্রচণ্ড হয়ে যেন ইন্দ্রিয়গুলির ওপর বিদীর্ণ হতে লাগলো, 'আইজ রামের অধিবাস, কাইল রামের বিয়া গো কমলা—'

শঙ্খিনী বলল, "এইবার ছাইড়্যা দ্যাও বাজনদার ভাই। ইট্টু দোয়া কর। হামার জবর শাদী দেখনের সাধ। হামারে ইট্টু শাদী দ্যাখতে দ্যাও।"

গর্জে উঠল মেঘু ঢাকী, "বাইদ্যানী মাগীর আহ্লাদ দ্যাখ একবার, সোহাগ দ্যাখ। শাদী দেখব! চুপ মার মাগী!" বলতে বলতে তার গলায় একটি খরধার অট্টহাসি বেজে উঠল। সে হাসিতে এতটুকু প্রশ্রয় নেই। বিন্দুমাত্র স্নেহ নেই। "হাঃ-হাঃ-হাঃ—" সে হাসিতে সামনের রয়নাবিবির খালটা শিউরে উঠল। নাগমতী বেদেনীর নীড়প্রেমের সুন্দর বাসনাটি চমকে উঠল।

নয়

রয়নাবিবির খাল ফুলছে। ফুঁসছে। খেয়ালের খুশিতে ঢেউ-এ ঢেউ-এ ফেনার ফুলকি ফুটছে। স্রোতের খরধারায় আবার এগিয়ে চলেছে কোষ-

ডিঙিটা। খালের দু'পাশে সেই জলছবি। আটকিরা ঝোপ, মোথরার ছায়াকুঞ্জ, বাঁশবন, বিষ কাটালির নিবিড় জঙ্গল। বন-ঝোপ-কুঞ্জের ফাঁকে ফাঁকে সুখী মানুষের, সহজ মানুষের ছোট ছোট ঘর। সাতাশের বন্দর। পঁচিশের বন্দর দোচালা। চৌচালা। অনেক নামের। অজস্র আকারের।

হালের বৈঠাটা মুঠিতে চেপে নিশ্চুপ হয়ে বসে রয়েছে শঙ্খনী।

আসমানী বলল, "কী লো শাঙ্খ, কয় ট্যাকার আয়নাচুড়ি বেচলি? কী লো ডহর, কয়খানা আলতাপাতা গছাইতে পারছস?"

তীক্ষ্ন রেশ ছড়িয়ে ছড়িয়ে হেসে উঠল ডহরবিবি। সেই হাসিতে দুলে দুলে উঠল তার বেদেনীতনু। সে হাসি থেকে বিজুরী খসতে লাগলো। আশ্চর্য! সর্বাঙ্গ দিয়ে হেসে ওঠে ডহরবিবি। হেসে হেসে পাটাতনের ওপর লুটিয়ে পড়ল সে, "হিঃ-হিঃ-হিঃ—বুঝলি আম্মা—"

গর্জে উঠল আসমানী, "মাগীর সোহাগ দেইখ্যা ম্যাজাজ জ্বইল্যা যায়। চুপ মার ডহর। হাসন থামা। কী হইচে তাই ক' দেখি আগে।"

হাসিটা আরো উদ্দাম হয়ে উঠল ডহরবিবির। অকারণ হাসি। অকারণ হাসি। পাটাতনের ওপর লুটিয়ে পড়েছিল সে, এবার আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে লাগলো, "হিঃ-হিঃ-হিঃ—আম্মা, উই শঙ্খনী!"

"মাগীর হাসনের ঠ্যালা দ্যাখ! এট্টা হাসন-পেত্নী! বান্দীর বাচ্চা, যা কওনের, আরে কইয়্যা তারপর হাইস্যা, গড়াইয়্যা, বিষম খাইয়্যা মরিস। ঠ্যাং দুইখান ধইর্যা খালে ফেলাইয়্যা দিমু'খন তুর।" বিধ্বস্ত কয়েকটি দাঁত কড়মড় করে বেজে উঠল আসমানীর।

"আম্মা, উই শঙ্খির তো ঘরের লেইগ্যা পরান উথল-পাথল করে!"

"তা কী হইচে?" নিরোম ভ্রূ-রেখার নীচে দু'টি ঘোলাটে চোখ দু টুকরো অগ্নিপিণ্ড হয়ে জ্বলতে লাগল আসমানীর।

"হিঃ-হিঃ-হিঃ—হইব আবার কী? উই বাড়িতে তো হামরা আয়নাচুড়ি লইয়্যা গেলাম, উই বাড়িতে আইজ আবার শাদী।" খিল খিল হাসি থামিয়ে অলস ভঙ্গিতে পাটাতনের ওপর উঠে বসল ডহরবিবি। তারপর কণ্ঠে রঙ্গ মেশালো, রসের চাপান দিল। তারও পর বলতে শুরু করল, "বুঝলি কী না আম্মা, তুর সোহাগের শঙ্খনী তো ছোট কত্তার বউরে আয়নাচুড়ি দ্যাওনের লেইগ্যা পাগল! কিন্তুক বড় কত্তায় কইল কী জানস?"

"ক্যামনে জানুম লো জিনের ছাও!"

"তবে শোন; বড় কত্তায় কইল, বাইদ্যা মাগীরা, তুগো ঘর নাই, দুয়ার নাই, হাকার পোলাটা (ছেলেটা) ঘর পাতবো, সোংসার পাতবো। তুগো মুখ দেখলে গুণাহ্ হয়। ভাগ্ ভাগ্ তুরা।" বলেই মর্ম জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে সেই খিল খিল হাসি। হেসে উঠল ডহরবিবি, "তার পরেই তো হামাগো খেদাইয়া দিল। হিঃ-হিঃ-হিঃ। এইবার হাসি আম্মা?"

"ঠমক দেখলে দিল জ্বইল্যা যায়। হাস লো হাসন-পেত্নী, হাসতে হাসতে মর্।"

"তুই যখন কইলি আম্মা, তখন মরি। হিঃ-হিঃ-হিঃ—" হাসতে হাসতে পাটাতনের ওপর আবার আছড়ে পড়ল ডহরবিবি।

ডোরার ওপর বসে ছিল আসমানী। এবার শঙ্খিনীর দিকে তির্যক চোখে তাকাল সে, "কী লো শঙ্খিনী, আয়নাচুড়ি বেচতে পারলি?"

নিরাসক্ত গলায় শঙ্খিনী বলল, "না।"

ডোরার ওপর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে শঙ্খিনীর কাছে চলে এল আসমানী। তারপর নিবিড় অন্তরঙ্গ হয়ে বসল। সস্নেহ গলায় সে বলল, "তবেই তুই বোঝ শঙ্খিনী। উরা হামাগো চায় না।"

"কারা?" চকিত হয়ে বলল শঙ্খিনী।

"উরা, উই যাগো ঘর আছে, জরু আছে। গিরস্থী (গৃহস্থী) মাইনষেরা (মানুষরা) হামাগো চিরটা জনম খেদাইয়্যাই দ্যায়। হামরা বেবাজিয়া। ঈই গিরস্থী মাইনষের লগে হামাগো কিছু মিলে না লো শঙ্খ। তুর ভালর লেইগ্যাই কই; উই ঘরের ভাবন তুই ভুইল্যা যা।" বলতে বলতে আসমানীর কণ্ঠটা মন্থর হয়ে এলো। কোন্ এক অলক্ষ্য থেকে বেদনার ছায়া এসে পড়েছে সে কণ্ঠে।

নিরুত্তর বসে রইল শঙ্খিনী। এতটুকু জবাব নেই তাঁর ঠোঁটে। একেবারেই হতবাক, একেবারেই নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছে সে। শুধু কঠিন মুঠিতে হালের বৈঠাটা চেপে ধরেছে শঙ্খিনী। রয়নাবিবির খাল চিরে চিরে কোষ ডিঙিটা একটা তীব্রগামী ফলুই মাছের মত এগিয়ে চলেছে।

ডহরবিবি সমানে হেসে চলেছে। যতিহীন। নির্বিরাম!

গোলাপী তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল, "খাঁটি বিষপাথর নিবা গো মা, জরিবুটি। দুধরাজ, শঙ্খরাজ, কালচিতি,—বেবাক বিষ মা বিষহরির দোয়ায় উইঠ্যা আসবো। খাঁটি বিষপাথর রু রু রু—"

মুধা পাড়ার সামনে একটা নতুন সাঁকো পাতা হয়েছে। বয়রা বাঁশের সাঁকো। একটি রক্তমাদারের শাখায় আর বউন্যা গাছের কাণ্ডে বেঁধে খালের দু'টি কিনারাকে যুক্ত করা হয়েছে। আর সেই সাঁকোটার ঠিক মধ্যবিন্দুতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহব্বত।

মহব্বত বলল, "পথ চিনা ঠিক মত আসতে পারছ বাইদ্যানী?"

সাঁকোর মধ্যবিন্দুতে দু'টি তৃষিত চোখ ঝাঁপিয়ে পড়ল। শঙ্খিনী দেখল, কালকের সেই বাদশাজাদা। ডহরবিবি আর গোলাপী দেখল। আর দেখল আসমানী। দেখতে দেখতে দৃষ্টিটা কুঞ্চিত হলো তার। কিন্তু একটি কথাও বলল না সে। শুধু নিরোম ভ্রূ-রেখার নীচে দু'টি ঘোলাটে চোখের মণিতে সন্ধানী আলো জ্বালিয়ে দু'টি মানব মানবীর ভাবগতিক লক্ষ্য করতে লাগল। হ্যাঁ, মহব্বত আর শঙ্খিনীর দু'জোড়া চোখ পরস্পরকে দেখতে দেখতে মুখর হয়েছে। মুগ্ধ হয়েছে।

কাল সকালের পর আজকের এই এক প্রহর বেলা। কত পল, কত দণ্ড, কত সময়! এর মধ্যে শুধু অসহায় অপমান আর দুঃসহ বন্দিত্ব ছাড়া কিছুই

বরাতে জোটে নি শঙ্খিনীর। সমস্ত মন, সকল ইন্দ্রিয়গুলি অসহ্য হয়েছিল তার। এই বেবাজিয়া জীবনের ওপর, এই পৃথিবীর প্রতিটি অণু-পরমাণুর ওপর প্রবল বিতৃষ্ণায় চেতনাটা নির্বোধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে মহব্বতকে দেখতে দেখতে মনটা প্রসন্ন হয়ে গেল। স্নিগ্ধ হাসিতে মুখখানা ঝলমল করে উঠল শঙ্খিনীর। আবিষ্ট গলায় সে বলল, "আগেই তো হামি কইছি বাদশাহজাদা, যুবতী মাইয়্যার কাছে যুয়ান পুরুষের কুনো ঠিকানা লাগে না। গোন্ধ পাইয়া ঠিক সে হাজির হইব।"

মহব্বত বলল, "আস, নাইম্যা আস কইন্যারা।"

উচ্ছল গলায় শঙ্খিনী বলল, "যামু, নিচ্চয় যামু বাদশাজাদা।" বলতে বলতেই আসমানীর দিকে তাকাল সে, "আম্মা, এই হইল হামার বাদশাজাদা। বাদশাজাদার বাড়িতে যামু?"

বিড় বিড় শব্দ করে অস্পষ্ট কণ্ঠে কী যেন বলল আসমানী। অজস্র রেখাময় মুখ। সেই মুখে একটি বিরক্ত ভ্রুকুটি ফুটে বেরুল তার, "বানু (বাঁধ) লো ডহর। নাওটা বাইন্ধ্যা শঙ্খ মাগীর বাদশাজাদার রাজত্বিটা দেইখ্যা আসি।"

"হিঃ-হিঃ-হিঃ—" খিল খিল গলায় হেসে উঠল ডহরবিবি। সর্বাঙ্গ দোলানো হাসি। হাসতে হাসতে সাঁকোর সঙ্গে রশি দিয়ে কোষাডিঙিটা বাঁধল সে। সাপ আর জড়িবুটির ঝাঁপি পিঠে ফেলে সকলে উঠে এলো উঁচু মাটিতে। তারপর মহব্বতের পেছনে পেছনে চলতে লাগলো।

শঙ্খিনী বলল, "সাঁকোর উপুর খাড়াইয়া কী ভাবতে আছিলেন বাদশাজাদা?"

"তোমার কথা!"

"শোন লো আম্মা, শোন লো ডহরবিবি আর গোলাপী! হামার বাদশাজাদার পরানে খুশবু কত? সাঁকোর উপুর খাড়াইয়া হামার কথা বলে ভাবতে আছিল!"

গোলাপী বলল, "পুরুষ মাইনষের অমুন কথা হামরা মেলা (অনেক) শুনছি।"

শঙ্খিনী আবারও বলল, "কী বাদশাজাদা, সাঁকোর উপুর খাড়াইয়া কী দেখতে আছিলেন? আসমানের ম্যাঘ না খালের ঢেউ? কুনটা?"

রঙ্গভরা গলায় মহব্বত জবাব দিল, "আসমানের ম্যাঘে আর খালের পানিতে তোমার মুখ দেখতে আছিলাম বাইদ্যানী।"

এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল শঙ্খিনী, "শোন, শোন লো তুরা। এমুন কথা কুনো দিনই তুরা শুনস নাই। হামার বাদশাজাদার পরানে সোহাগের কত মৌ!"

ডহরবিবি বলল, "সোহাগের মৌ বুঝুম ক্যামনে?"

"ক্যান, কথার মিঠায় মনের মৌ-র স্বোয়াদ পাইস না?"

পাশ থেকে আসমানী গজ গজ করে উঠল, "থাম, থাম মাগীরা। রসের

কথার ব্যারাম ধরলে আর থামতে চায় না। বেলা হইল দুফার। এই শঙ্খি, তুর বাদশাজাদা না কুন জিনের ছাও, তারে জিগা (জিজ্ঞাসা কর) আর কন্দুর গেলে তার রাজত্বির সীমানা মিলব ?"

মহব্বত হাসল, "বুড়া বাইদ্যানী দেখি রঙ্গরসও জানে।"

গোলাপী সামনে এগিয়ে এলো, "কী যে কও শঙ্খির বাদশাজাদা ; আম্মায় আইজকাইল বুড়া হইছে। শুকাইয়্যা এক্কেবারে কিশমিশ কিন্তুক এককালে রসের আঙ্গুর আছিল।"

রয়নাবিবির খাল থেকে সুপারি বাগিচা আর তালবনের মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ উজিয়ে এসেছে পাঁচ জনে। সামনে মহব্বত, পেছনে আসমানী, শঙ্খিনী, ডহরবিবি আর গোলাপী।

এক সময় ভুঁইয়া বাড়ির উঠানে এসে পড়ল সকলে।

মহব্বত বলল, "তোমরা এট্টু খাড়াও বাইদ্যানীরা। আমি বেবাক আয়োজন করতে আছি।"

একটু পরেই পানের ডাবর, আগুনের মালসা, তামাকের ডিবে আর বিশাল একটি জলচৌকি এনে আসমানীদের সামনে রাখলো।

তারও পর শ্রাবণের বাতাসে বাতাসে সওয়ার হয়ে খবরটা ছড়িয়ে পড়ল। বড় ভুঁইয়ার বাড়ি বেবাজিয়াদের দল এসেছে। নিকারী পাড়া, ধাওয়া পাড়া, মৃধা পাড়া থেকে মানুষ এলো। অজস্র মানুষ। ছেলে-বুড়ো-জোয়ানের বন্যা এসে ভেঙে পড়ল বেদেনীদের চারপাশে।

নতুন কল্কির মাথায় মতিহারী তামাকের চিতা সাজিয়ে হুঁকোতে ভক্ ভক্ বাজনা বাজায় আসমানী। তরিবত করে জনাই পানের খিলি সাজে ডহরবিবি। সেই খিলি চিবিয়ে ঠোঁট রাঙায় গোলাপী। আর নির্বিকার বসে থাকে শঙ্খিনী।

ইতিমধ্যে বড় ভুঁইয়া এসেছেন। সূঁচ দাড়ি, চোখের কোলে সুর্মার নিপুণ রেখা। রেশমী লুঙ্গি। কলিদার চাপকানটা বাতাসে ফুর ফুর করে উড়ছে। পায়ে জরিদার পয়জার। জলচৌকির ওপর জাঁকিয়ে বসতে বসতে বড় ভুঁইয়া হুঙ্কার ছাড়লেন, "হে-হে বাইদ্যানীরা, আমি হইলাম বড় ভুঁইয়া, এই নিয়াদারির মালিক। এইবার তোমাগো রয়ানি গান শুরু কর। তার আগে খেলা দেখাও জাতি সাপের। খেলা দেইখ্যা যেন মেজাজ তোফা হয় !"

গোলাপী ডুগ ডুগ শব্দ তুলে ডুগডুগি বাজায়। স্ফীতোদর একটা বাঁশিতে বিলম্বিত লয়ে পোঁ দিয়ে চলে ডহরবিবি।

পান-তামাকের প্রথম পর্ব শেষ করে আসমানী বলল, "শঙ্খচূড় সাপটা বাইর কর শঙ্খিনী।"

একবার আসমানীর মুখের দিকে তাকাল শঙ্খিনী। তারপর সামনের বেতের ঝাঁপিটা টেনে নিল। ডালাটা খুলতেই সাঁ করে একটা শঙ্খচূড় বেরিয়ে এলো। ফণায় সুশুভ্র শঙ্খের চিত্তির। কালো ডোরাকাটা দেহ। পিচ্ছিল। ঋজু। দু'খণ্ড নীলার মত চোখ দু'টি জ্বলছে শঙ্খচূড়ের।

চারপাশ থেকে বৃত্তের মত ঘিরে ধরেছে মানুষগুলো। শঙ্খচূড়ের ফণা দেখাতে দেখাতে একটা নিরাপদ ব্যবধান রেখে সরে গেল তারা।

শঙ্খিনী অভ্যস্ত কৌশলে হাতের পাতা নাচাতে থাকে। আর শঙ্খচূড়ের ফণাটা তীব্র আক্রোশে দুলতে দুলতে উঠানের মাটিতে আছড়ে পড়ে।

ডহরবিবি বলল, "এক্কেবারে আনকোরা ভুঁইয়া ছাহাব। পরশুদিন ম্যাঘনা নদীর কিনার থিকা আমি ধুলপড়া দিয়া ধরছিলাম এই শঙ্খচূড়টারে।"

শঙ্খচূড়ের নৃত্যের ছন্দে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে দুলছে শঙ্খিনীর সুঠাম তনুটি। সে তনুতে যাযাবর-স্বাস্থ্য উদ্বেলিত হয়ে রয়েছে। খাল-বিল, নদী-অরণ্য থেকে, অকৃপণ রোদ আর বাতাস থেকে কণা কণা যৌবন আহরণ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে শঙ্খিনী।

শঙ্খিনীকে দেখতে দেখতে খাড়া ঝিলিকের মত জলচৌকিটার ওপর উঠে বসলেন বড় ভুঁইয়া। সকাল বেলাতেই এক বোতল নির্জলা মদ গিলেছেন। অস্থিমেদ, স্নায়ুগুলি আর ধমনীতে রক্তের কোটি কোটি কণিকা রিমঝিম করে বেজে চলেছে তাঁর। দেহের মধ্যে রতি নামে যে একটি প্রকট ইন্দ্রিয় রয়েছে, সেটি এই মুহূর্তে ধনুকের ছিলার মত প্রখর হয়ে উঠেছে। দু'টি চোখে নেশার রক্তরাগ আঁকা রয়েছে বড় ভুঁইয়ার। সেই নেশা-আঁকা চোখে শঙ্খিনী নামে এক বিষকন্যার তীক্ষ্ম যৌবন, যৌবনের সকল জৌলুস একটি মধুর মৌতাত হয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। নির্জলা মদের চেয়েও বেদেনীতনুর যৌবন অনেক বেশী খরধার। তার নেশা অনেক, অনেক বেশী উগ্র। বড় ভুঁইয়ার মনে হলো, তাঁর দেহের প্রতিটি কোষে ঝড় ভেঙে পড়ছে।

আর দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের চৌকাঠের ওপর একজোড়া চোখ সম্মোহিত হয়ে রয়েছে। সে চোখ মহব্বতের। মহব্বতের দু'টি চোখে মুগ্ধ বিস্ময় দেখতে দেখতে একেবারেই বিমনা হয়ে গেল শঙ্খিনী। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস কেটে হিংস্র একটা শব্দ উঠল। তড়িৎ গতিতে শঙ্খরাজের ফণাটা ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্খিনীর হাতের পাতায়। চমকে উঠল নাগমতী বেদের মেয়ে। তার অন্যমনা চেতনাকে শাসন করলো শঙ্খরাজের ছোবল। বরাত ভাল, সাপটার বিষদাঁত ভেঙে রাখা হয়েছিল।

পাশ থেকে ধারালো বর্শার আঘাত এসে পড়ল পাঁজরে। বর্শা নয়, আসমানীর কনুই। চাপা গলায় গর্জে উঠল আসমানী, "খালি বাদশাজাদা আর বাদশাজাদা! মাগীর খালি ঘরের ভাবন! হামরা হইলাম বিষহরির মাইয়া! কতবার কইছি, ঘরের ভাবন ভাবলে গুণাহ্ লাগব। এই মাত্তর শঙ্খরাজের ফণা পড়ল তুর হাতে! মা বিষহরি কিন্তুক এই গুণাহে মাপ করব না। খুব সাবধান! মাগী, তুরে বহরে নিয়া হামি শ্যাষ করুম।"

মাথাটা নীচু করে দুর্বিনীত ভঙ্গিতে বসে রইল শঙ্খিনী। আর সাপটাকে ঝাঁপির মধ্যে বন্দী করে ফেলল আসমানী।

অসংলগ্ন গলায় বড় ভুঁইয়া বললেন, কী এক মাতাল আবেশে কণ্ঠটা থর থর করে কাঁপছে তাঁর, "কী হইল আবার, এ বুড়ি বাইদ্যানী! মারামারি

ক্যান ? সাপের নাচন থাউক । এইবার তরিবত কইর‍্যা রয়ানি গান ধর দেখি ।”

আসমানী সমানে গজ গজ করে, “মাগীরে বহরে নিয়া শিক পোড়া দিয়া ছ্যাকা দিমু । তবে হামি আসমানী বাইদ্যানী ! শরীলে (শরীরে) অখনও ত্যাল রইছে, তেজ আছে ! বেবাক ত্যাল, বেবাক তেজ হামি ছুটাইয়্যা ছাড়ুম । জুলফিকারকে দিয়া হামি তুরে বাঁশ-ডলা দিমু ।”

ডহরবিবি সারাটি দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে উঠল, “হিঃ-হিঃ-হিঃ—শঙ্খ আইজ বহরে গিয়া জুলফিকারের বাঁশ-ডলা খাইব । হিঃ-হিঃ-হিঃ—”

আসমানী হুঙ্কার ছাড়ল, “চুপ মার হাসন-পেত্নী ।”

এক কিনারে বসে স্ফীতোদর বাঁশিতে পোঁ দিয়ে চলে গোলাপী । নির্বিকার বাজিয়ে চলেছে সে ।

অলস গলায় বড় ভুঁইয়া বললেন, “কী হইল তোমাগো ! ও বাইদ্যানীরা, অনেক কাল রয়ানি গান শুনি নাই । এইবার গলা খুইল্যা ধর দেখি একখান গান ।”

কুঞ্চিত চোখে শঙ্খিনীর দিকে তাকাল আসমানী, “ধর লো মাগী, ভুঁইয়া ছাহাব কইছে । একখান রয়ানি ধর ।”

মুখচোখ ভয়ানক হয়ে উঠল শঙ্খিনীর ; সুঠাম দেহটি আশ্চর্য উদ্ধত । নির্মম গলায় সে বলল, “হামি গাইতে পারুম না ।”

“গাইবি না !” আসমানীর ঘোলাটে চোখ দু'টি মশালের মত ধক্ করে জ্বলে উঠল ।

হাই তুলে তুলে বারকয়েক তুড়ি বাজালেন বড় ভুঁইয়া ; তারপর নেশাঘন গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, “আহা-হা, ঐ বাইদ্যানী সুন্দরী যখন গাইতে চায় না, তখন থাউক । তোমরাই গাও ।”

এক সময় ডহরবিবি গাইতে শুরু করল । পর্দায় পর্দায় তীক্ষ্ণ হতে লাগল তার কণ্ঠ । চকিত হয়ে উঠল শ্রাবণের এই দিন । মুগ্ধ হলো চারপাশের মানুষগুলি । ডহরবিবি গাইছে :

চান্দ্ রাজা তুমার আগো কেমনতর ঘর ?
কেমনতর কারিগরে বানাইল বাসর !
তুমার মনে নাই কী রাজা বিষহরির ডর ?
হায় বিষহরির দোয়া !

বেদনাময় গমকে গানের রেশ টেনে চলে গোলাপী :

সুজন, দেখ কান্দে ঐ যে সোনার বেহুলা ;
কাইন্দা কাইন্দা পদ্মের চক্ষু হইছে ফুলা ফুলা ;
মনসার কানে কে গো দিছে সোয়া স্যার তুলা !
হায় বিষহরির দোয়া !

গান একটা অজুহাত । সেদিকে বিন্দুমাত্র মনোযোগ নেই বড় ভুঁইয়ার । তার সকল ইন্দ্রিয়, সকল স্নায়ু, দেহমনের সকল রতি দু'টি নেশালাল চোখে কেন্দ্রিত হয়েছে । আর সেই চোখ দু'টি এসে স্থির হয়েছে শঙ্খিনী নামে

বেদেনী-যৌবনের ওপর। গান গাইছে অন্য দু'টি বেবাজিয়া মেয়ে। বুড়ী বেদেনী সেই গানের তদারক করছে। সুর নিয়ে, তাল নিয়ে, গমক নিয়ে ওরা মেতে থাকে। আর গানের অছিলায় যতক্ষণ দৃষ্টিভোজ করা যায় সুতনুকা যাযাবরীর যৌবন, তার তীক্ষ্ম স্বাস্থ্য, তার সুন্দর আর সুঠাম দেহ ; ততটা সময়ই লাভ, ততটা সময়ই মৌতাতে আবিষ্ট হয়ে থাকা যাবে। ভাবতে ভাবতে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন বড় ভুঁইয়া।

আচমকা, একান্তই আচমকা। যৌবনবতী বেদেনীকে দেখতে দেখতে চেতনার পর্দায় পর্দায় খরধার বিদ্যুৎ খেলে গেল বড় ভুঁইয়ার। এই শ্রাবণের দিন ; লবণ ইলিশের খন্দ ; পুরানো পাট বিক্রীর মরসুম। হাতের মুঠিতে, রেশমী লুঙ্গির গোপন গেঁজেতে এখন রাশি রাশি করকরে নোট আর কাঁচা টাকার মধুর বাজনা ছড়িয়ে রয়েছে। সেই ফুরফুরে নোট, সেই কাঁচা টাকার বাজনা, পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের উদগ্র খেয়াল আর এই বেদেনীতনু—সব মিলিয়ে কী একটা সংকেত রয়েছে, কী একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে উঠছে। বড় ভুঁইয়ার কালো কালো দু'টি ঠোঁটে একটি কুটিল আর অর্থময় হাসি শিউরে উঠল।

শঙ্খিনী বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখছিল। চারপাশে ঢেউটিনের চাল। অন্দর-মহল থেকে আউশ ধানের চিঁড়ে কোটার শব্দ ভেসে আসছে। পুবদুয়ারী ঘরের বারান্দায় কয়েকটি ধানের ডোলের আভাস পাওয়া যায়। পাকের ঘরের চালে উঠে গিয়েছে সবুজ লাউলতার আলপনা।

পদ্মা-মেঘনা-ইলশা-কালাবদর—বেহুলা-লখিন্দরের জলবাসরের দেশে, নানা গঞ্জে গঞ্জে, কৃষাণীদের জনপদে-জনপদে জড়িবুটি আর বিষ-পাথর বিক্রী করতে করতে, আলাদ গোক্ষুর-চন্দ্রবোড়া-খরিশের নাচ দেখাতে দেখাতে গৃহীজীবনের অনেক প্রেম দেখেছে শঙ্খিনী, অনেক সোহাগের কথা শুনেছে। আর দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে আঠারো বছরের খরধার জীবনে, তার ধমনীর যাযাবর রক্তে একটি মধুর আর মন্থর স্বপ্ন ছায়া ফেলেছে। সে স্বপ্ন বাদাম তুলে, গুণ টেনে নাগকন্যার মনকে একটু একটু করে নীড়মুখি করেছে। তার তরুণী বাসনার মৌচাকে মৌ জমেছে। সেই মৌ দিয়ে একটি গৃহাঙ্গনকে সুখী করবে সে। রমণীয় করবে। জীবনে একান্ত পুরুষ পাবে সে। পাবে তার উদ্দাম পেষণ, উতরোল সোহাগ। এই ঘরগুলির চালে চালে, দেওয়ালে দেওয়ালে এই মুহূর্তে শঙ্খিনী আবার নতুন করে তার কামনার প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেল।

সহসা, দৃষ্টিটা আবার এসে এক জোড়া রূপমুগ্ধ চোখের ওপর স্থির হলো শঙ্খিনীর। তেমনি নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে মহব্বত। কাল দুপুরের সেই বাদশাজাদা। মহব্বতকে দেখতে দেখতে শঙ্খিনীর মনে হলো, এই সুন্দর গৃহ, এই অঙ্গন, এই ধানের ডোল—এগুলি যদি মহব্বতের হতো। কাল মহব্বত বলেছিল, সে-ও নাকি তাদের মত বেবাজিয়া। ঘর নেই, জরু নেই। জীবনে বড় ভুঁইয়ার পীড়ন ছাড়া আর কিছুই নেই তার। আচমকা একটা সরলরেখায় ভাবনার মতিগতি ঘুরে গেল শঙ্খিনীর। নীড়হীন বাদশাজাদাকে ঘিরে তার কামনার, তার সেই স্বপ্নটি কী চরিতার্থ হতে পারে! সার্থক হতে পারে তার

নোঙর ফেলার বাসনা ! বেদেনী-মনের ভাবনা। তার গতিপথ ঋজু, স্পষ্ট। তার প্রকাশ একান্তভাবেই তীক্ষ্ণধার। ভাবতে ভাবতে একটা স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে পৌঁছল শঙ্খিনী।

এদিকে গোলাপী আর ডহরবিবি একখানা গানের লহর তুলে চলেছে :

কান্দে রাজা, কান্দে পরজা, কান্দে সনকা রানী,
আলগোছে বইস্যা পঙ্খী ফেলায় চৌখের পানি,
কান্দে রাজা, চান্দ আর সনকা জননী,
হায় বিষহরির দোয়া !

এক সময় গান থেমে গেল।

ডুগডুগিটা ঝাঁপির মধ্যে পুরে আসমানী বলল, "রয়ানি গান ক্যামুন লাগল গো বড় ভুঁইয়া। মনের কথাখান সাফা কইর‍্যা ক'ন দেখি। সাবাস আর ইনাম —দুই-ই দিতে লাগব।"

এখনও নাগমতী বেদেনীর বরতনু তার শাণিত যৌবন রক্তের কণায় কণায় ভেঙে ভেঙে পড়ছে বড় ভুঁইয়া সাহেবের। ত্রস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তারপর ঘন ঘন চিবুক নাড়িয়ে তারিফ করলেন, "জবর ভাল। এক্কেবারে বেশখ হইছে। হেঃ-হেঃ-হেঃ—"

বলতে বলতেই উদ্দাম হাসিতে মেতে উঠলেন বড় ভুঁইয়া। একটি মাত্র মুহূর্ত। তার পরেই গলাটা ফিস্ ফিস্ হয়ে এলো তার। যেমন করে অত্যন্ত গোপন সংবাদ নেওয়া হয়, ঠিক তেমনি সতর্ক ভঙ্গিতে আসমানীর কানের মধ্যে মুখখানা গুঁজে দিলেন বড় ভুঁইয়া, "হে-হে বুড়া বেবাজিয়ানী ; উই জুয়ান বাইদ্যানী কে ?"

"উই হইল হামাগো শঙ্খিনী।"

"তোমার মাইয়া না কী ?"

জীর্ণ মাড়ির ওপর হলদে রঙের কয়েকটি বিধ্বস্ত দাঁত। সেই দাঁতগুলি বের করে খল খল গলায় হাসল আসমানী, "শঙ্খিনী যে কার মাইয়া, সেই কথা কী খোদ খোদাতাল্লাই কইতে পারব ভুঁইয়া ছাহাব ? উর মায়ের নাম আছিল্ কুলছুম বেগম। বাজান যে উর কয় গণ্ডা, সেই খবর কইতে পারুম না। তবে উর মা উরে বিয়ান দিয়া এট্টা শিলেটি ডাকুর লগে চাটগাঁয় ভাইগা গেছে।"

কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত পার হলো। এক সময় আসমানী আবার বলল, "হামাগো বক্‌ছিস্ ভুঁইয়া ছাহাব ? হামাগো ইনাম ?"

"ও-হ-হ।"

কোমরের রেশমী গেঁজে থেকে এক রাশ কাঁচা টাকা আসমানীর হাতে গুঁজে দিলেন বড় ভুঁইয়া। তারপর বললেন, "আমি রাইতে তোমাগো বহরে যামু। এই ট্যাকাই শ্যাষ না ; আরও তিন কুড়ি দিমু। ক্যামুন ?"

তিন কুড়ি টাকার প্রলোভন। আসমানীর জরাময় দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে লোভ জ্বলে উঠল। ঘোলাটে চোখ দু'টি তুলে একবার বড় ভুঁইয়ার

দিকে তাকাল আসমানী, "নজর পড়ছে বুঝি শঙ্খিনীর উপুর। তা তো পড়নের কথাই। যেইখানেই যাই, গঞ্জে-গেরামে-বন্দরে—যেইখানেই বহর ভিড়াই, সেইখানেই আপনের লাখান (মত) বেবাক মানুষ গিন্নী শকুনের লাখান মাগীটার উপুর ঝাঁপাইয়া পড়ে। ও তো আর ডহর কী আতরজান না! ও হইল ডানা-কাটা হুরী। উর এক বাজান এংরাজ, এক বাজান বৈষ্টম, এক বাজান বর্মা মুল্লুকের মগ। আরো কত বাজান যে আছে, তার হিসাব হামি জানি না ভুঁইয়া ছাহাব। তবে বেবাক বাজানের রূপ আর যৈবন চুইষ্যা চুইষ্যা শঙ্খিনী এমুন খুবসুরত হইছে ভুঁইয়া ছাহাব।" বিড় বিড় গলায় শঙ্খিনীর রূপ আর যৌবন সম্বন্ধে আলোকদান করে চলল আসমানী।

বড় ভুঁইয়া বললেন, "আর কইও না বাইদ্যানী। আমার বুকের পিঞ্জরের পংখী ডাক ছাইড়্যা গান ধরছে। আরো এককুড়ি ট্যাকা বাড়াইয়া দিলাম। কিন্তুক তোমাগো ঐ শঙ্খিনীরে আমার চাই।"

"নিচ্চয়, নিচ্চয়।"

ঘোলাটে চোখে একটি বঙ্কিম কটাক্ষ ফোটাবার চেষ্টা করল আসমানী, "যাইবেন, নিচ্চয় যাইবেন গো ভুঁইয়া ছাহাব। আপনার লেইগ্যা ফরাস পাইত্যা রাখুম, লণ্ঠন জ্বালাইয়া দিমু গণ্ডায় গণ্ডায়। শরাবের দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) দিমু। ইমলি পাখির মাংসের কাবাব খাওয়ামু। যাইবেন কিন্তুক ভুঁইয়া ছাহাব; না গেলে পরানে জবর দাগা পামু।" আসমানীর বঙ্কিম কটাক্ষ একটু একটু করে মোহিনী হয়ে উঠতে লাগল।

"আর কী দিবা?" নেশালাল চোখে তাকালেন বড় ভুঁইয়া। সে চোখে ঘোর মাতলামি টলমল করছে।

খুশির ফুলকি ফুটল আসমানীর গলায়, "আর দিমু, দিমু এট্টা ডানা-কাটা হুরী। জাপরানী ঘাঘরা পরব শঙ্খিনী, মাদার ফুল দিয়া চুল বানুবো (বাঁধবো), লাল কাচুলি পরবো। ভুঁইয়া ছাহাব, পুরুষ কোন্ কথা, হামারই ভিরমি লাগে উর সাজন গোজন দেইখ্যা। হিঃ-হিঃ-হিঃ—"

প্রখর উত্তেজনায় গলাটা কেঁপে উঠল বড় ভুঁইয়ার, "আইজ রাইতে যামু তোমাগো বহরে।"

"আইজ না ভুঁইয়া ছাহাব; কাইল আইসেন। আইজ শঙ্খিনীর শরীলটা (শরীর) জবর মোন্দ; জবর বেজুত। কাইল সারাদিন কিছুই খায় নাই শঙ্খ। এইবার হামরা যাই গো নবাবজান।"

সাপের ঝাঁপি থরে থরে মাথায় সাজিয়ে, জড়িবুটি-আয়নাচুড়ি, বিষপাথরের ডালা কাঁধে তুলে রয়নাবিবির খালের দিকে এগিয়ে গেল আসমানী, ডহরবিবি আর গোলাপী। সকলের পেছন এলো শঙ্খিনী। তার পাশাপাশি এসেছে মহব্বত।

শঙ্খিনী বলল, "কী গো বাদশাজাদা; হামার মুখের দিকে তাকাইয়্যা রইছেন যে! বেকুব মরদ।"

গন্ধমাতাল মৌমাছির মত মহব্বতের দু'টি চোখ শঙ্খিনীর মুখের চার-

পাশে চক্র দিয়ে ফিরছিল। বিব্রত ভঙ্গিতে দৃষ্টিটাকে চট করে সরিয়ে নিল মহব্বত।

দু'টি ঠোঁটের ফাঁকে তীক্ষ্ম রেখায় হাসি ফুটলো শঙ্খিনীর, "বেকুব না, একেবারেই বলদ। ক্যামুন পুরুষ, হামার মুখখান দেখতে ভাল লাগে, এই সিধা কথাখান কইতে পারেন না? হায় মা বিষহরি, অ্যামুন মরদ লইয়্যা হামার কী হইব!"

কোন জবাব দিল না মহব্বত। নিরুত্তর পাশাপাশি চলতে লাগল।

আসমানী গর্জে উঠল, "এই শঙ্খি, এই মাগী—উই শয়তানটার লগে কুন্ পিরিতের বীজমন্তর পড়তে আছিস?"

শঙ্খিনীর দু'টি চোখে আলাদ গোক্ষুরের ফণা নেচে উঠল। ভয়ানক গলায় সে বলল, "তুর কুন্ কাম সেই খবরে। চুপ মার তুই। হামার মনের কথা এট্টা মানুষের কাছে কইতে পারুম না উর ডরে!"

"আইচ্ছা, শরীলে কত ত্যাল (তেল) হইচে, হামি একবার দেখুম।" ধ্বংসশেষ কয়েকটি দাঁত কড়মড় করে বেজে উঠল আসমানীর।

আসমানী কী রয়নাবিবির খালে কী দূরের আকাশে শ্রাবণের মেঘদল—কোন দিকে ভ্রূপাত নেই শঙ্খিনীর।

খালের জলে কোষাডিঙিটা টলমল করছে। গলুইতে উঠতে উঠতে শঙ্খিনী বলল, "হামাগো বহরে যাইয়েন গো বাদশাজাদা।"

খালের কিনার থেকে আবিষ্ট গলায় মহব্বত বলল, "নিচ্চয়, নিচ্চয়।"

একটু পরেই রয়নাবিবির খালের দূরতম বাঁকে কোষাডিঙিটা অদৃশ্য হলো। বেদেনীদের তীক্ষ্ম কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসছে, "খাঁটি বিষপাথর-র্-র্-র্ নিবা গো মা; জড়িবুটি নিবা গো বইন। দুধরাজ-চক্রচূড়-কালচিতি—বেবাক বিষ মা বিষহরির দোয়ায় উইঠ্যা আসবো। বিষ পাথর-র্-র্-র্—"

মুধাপাড়ার নতুন সাঁকোটার মধ্যবিন্দুতে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মহব্বত। তার দু'টি মুগ্ধ চোখে, তার তরুণ মনের সকল কামনা আর বাসনার একটি মুখের ছায়া দুলছে। সে মুখ শঙ্খিনীর।

দশ

অতিকায় ঘাসি নৌকার পাটাতনে দাঁড়িয়ে রয়েছে আতরজান। সারা দেহে অজস্র আঘাতের চিহ্ন, রক্ত জমে জমে কালো হয়ে গিয়েছে। জুলফিকারের হিংস্রতা শিলালিপির মত ফুটে রয়েছে আতরজানের শরীরে।

পাটের ক্ষেতে, ধানের বনে দোল খেয়ে নামছে শ্রাবণের রোদ। আকাশে বালিহাঁসের পাখার মত ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। এক ঝাঁক মরসুমী পাখি উড়ে উড়ে চলেছে। তাদের পাখায় পাখায় শুধু অকারণ খুশি। শ্রাবণের আকাশে ঠিকানাহীন আনন্দে উড়ে যাবার নেশায় পেয়েছে তাদের।

তীক্ষ্ণ চোখে রয়নাবিবির খালের দূরতম বাঁকটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে আতরজান।

এক সময় সেই বাঁকে আসমানীদের ছোট্ট কোষডিঙিটা ফুটে বেরুল। তারপর স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে ঘাসি নৌকার পাশে এসে ভিড়ল।

সন্ত্রস্ত গলায় আতরজান বলল, "তরাতরি (তাড়াতাড়ি) আয় আম্মা, সর্বনাশ হইয়া গেছে।"

আসমানীর বয়সজীর্ণ মুখে একটি সংশয়ের ছায়া এসে পড়ল, "কী হইচে?"

আতরজানের কণ্ঠটা এবার ফিস্ ফিস্ করে উঠল, "চিল্লাইয়া কওন যাইব না। ভিতরে আয়, নিজের চৌখে দেখতে পাবি। তরাতরি, তরাতরি।"

পলকপাতের মধ্যে ঘাসি নৌকার গলুইতে কোষডিঙিটা বেঁধে ওপরে উঠে এলো আসমানী। তারপর ছই-এর দরজা দিয়ে নৌকার গর্ভে ঢুকে গেল। আর ঢুকেই চোখের মণিতে শঙ্খচূড় সাপের ছোবল খেল যেন।

দু'টি হারিকেন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে দু'পাশে। সেই হারিকেনের অনুচ্ছ্বাস আলো একটি রক্তাক্ত দেহ প্রতিফলিত হয়েছে। সে দেহ ওসমানের। পাটাতনের ওপর ঋজু রেখায় শোয়ানো হয়েছে ওসমানকে। কোমর আর তলপেটের সন্ধিতে একটা সড়কির ফলা আমূল গেঁথে রয়েছে তার। রক্তের বন্যায় ঘাসি নৌকার পাটাতন ভেসে গিয়েছে।

একপাশে একটা শিলামূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ইদ্রিস।

কাঁপা-কাঁপা গলায় আসমানী বলল, "কী ব্যাপার? কী হইচে রে ইদ্রিস?"

ইদ্রিস বলল, "কাইল রাইতে ছাগল-বাছুর হাতাইয়া আনতে হামরা তো গেরামে ঢুকলাম। এক গিরস্থের (গৃহস্থের) বাড়িতেও গেলাম। কিন্তুক গিরস্থ (গৃহস্থ) সুমুন্দির পুতেরা জবর চতুর। ঘুমায় নাই উয়ারা, সজাগ আছিল। আর এমুন বরাত আম্মা, গায়ে হাত দেওনের লগে লগে বউয়ার ভাই ছাগলে তো চিল্লাইয়্যা উঠল। আর গিরস্থ বাইর হইল সড়কি লইয়্যা।"

"তারপর?"

"তারপর গিরস্থে সড়কি দিয়া ওসমাইন্যারে সোহাগ করল। হিঃ-হিঃ-হিঃ—" গোরস্থানের শিয়ালের মত খিক্ খিক্ করে হেসে উঠল ইদ্রিস।

"চুপ মার বান্দীর ছাও! অমুন খিকির খিকির কইর‍্যা হাসলে এক্কেবারে কালিজা ফাইড়্যা ফেলুম!"

ইদ্রিস বলল, "এই চুপ মরিলাম আম্মা। কিন্তুক জানস আম্মা, জবর খাসা আছিল ছাগলটা। তোফা গোস্ত হইত। চুক্-চুক্—" ব্রহ্মতালু আর জিভের সহযোগে একটি লুব্ধ শব্দ করল ইদ্রিস।

ধ্বংসশেষ কয়েকটি দাঁত কড়মড় করে বাজল আসমানীর। জীর্ণ মুখখানা খিঁচিয়ে গর্জন করে উঠল সে, "চুপ শয়তানের বাচ্চা। হামি ইদিকে ভাইব্যা ভাইব্যা বেদিশা হইয়্যা যাইতে আছি আর হারামজাদা জিনের গোস্ত গিলনের

লেইগ্যা জিভ্যা লক্ লক্ করে। অমুন জিভ্যায় পোড়া শিকের ছ্যাকা দিমু।"

কিছু সময়ের বিরতি।

ইতিমধ্যে ডহরবিবি এসেছে পাটাতনের মধ্যে। ওসমানকে দেখতে দেখতে সব কথা শুনতে শুনতে খিল খিল হাসিতে ভেঙে ভেঙে পড়তে লাগল সে, "হিঃ-হিঃ-হিঃ—"

হুংকার দিল আসমানী, "এই যে হাসন-পেত্নীটা আইছে! যা, যা উই খালের জলে ডুইব্যা মর, না হইলে গলায় রশি দে। হাসির ব্যারাম মাগীর!"

হাসিটা এবার আরো উদ্দাম হয়ে উঠল। ডহরবিবির দেহটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, "হাসুম না; কইস কী তুই আম্মা! ওসমাইন্যা সড়কির ঘাই (আঘাত) খাইয়্যা আইল; আর হামি হাসুম না! হিঃ-হিঃ-হিঃ—"

আসমানীর রেখাবহুল মুখে একটি বিরক্ত ভ্রূকুটি ফুটে বেরুল, "হাসন-পেত্নীটা একদিন হাসতে হাসতেই মরবো। এইবার উই কিনারের নৌকায় ভাগ ডহরবিবি। কাম আছে!"

"হামারও কাম আছে।" জাফরানী ঘাগরার গ্রন্থিটা ঠিক করে বাঁধতে আলগোছ গলায় বলল ডহরবিবি। সারা মুখে একটি সোহাগের ভঙ্গি ফুটেছে তার।

"তুর আবার কুন কাম?"

"হায় রে আম্মা, উই বেকুব ওসমাইন্যা হামারে এট্টা কথা কইছিল কাইল রাইতে।"

"কী কথা?"

"হামারে মোরগা খাওয়াইব কইছিল ওই ওসমাইন্যা। অনেককাল মোরগা খাই নাই। জিভ্যাটারে তোয়াজ করন লাগবো, মোরগা দিয়া শিককাবাব খাওনের জবর সাধ জাগছে পরানে।"

"ওসমাইন্যা এইদিকে মরে, আর উইদিকে হারামজাদী মাগীর পরানে যত বেজাত সাধ। অমুন সাধ সড়কি মাইর‍্যা সিধা কইর‍্যা দেওনের কাম। যা, যা, এই নৌকা থিকা ভাগ।"

"হিঃ-হিঃ-হিঃ—আম্মা, তুর কথা শুনলে হামার পরান উথল-পাথল কইর‍্যা হাসি আসে। হাসে যৈবনমতী বাইদ্যানী। হামার পরানে দুই চাইরটা বেজাত সাধ থাকবো না তো থাকবো উই কিষাণী গেরামের মিঠা মিঠা বউগো পরানে! হায় লো বেকুব আম্মা, যৈবন তো তুর নাই। যৈবন থাকলে বাইদ্যানী মাগীর কী সাধ সোহাগের হিসাব থাকে, না থাকন ভাল? হিঃ-হিঃ-হিঃ—" হাসতে হাসতে কাঁচুলির গ্রন্থি শিথিল হলো, ঘাগরার বন্ধন অসতর্ক হলো ডহরবিবির।

টেনে টেনে আসমানী নির্মম গলায় বলল, "যৈবনের ঠসক কত? যৈবনমতী পেত্নীর ঠসক দেখলে হামার দোজখে যাইতে ইচ্ছা করে!"

"তাই যা আম্মা, এই বহরে থাইক্যা কোন্ কাম ? শরীলে (শরীরে) যৈবন নাই, চামড়া শুকাইয়্যা গেছে, পরানে পিরিতের খুশবু নাই, কোমর ব্যাকছে ধনুকের লাখান (মত)। বাইদ্যা বহরে যৈবনমতী মাগীগো বেহেশ্‌তে থাইক্যা আর কী করবি। দোজখেই যা আম্মা, দোজখেই যা। হিঃ-হিঃ-হিঃ—"

"অনেক হাসন হইচে ডহর। এইবার না ভাগলে জুলফিকারকে হামি ডাকুম কিন্তুক।"

প্রচুর রক্ত ক্ষরিত হয়েছে। ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে অবসাদ জড়িয়ে রয়েছে আঠার মত। স্নায়ুগুলো ঝিম্ ঝিম্ করছে। ক্লান্ত দু'টি চোখের পাতা মেলে, দৃষ্টিতে মিট্ মিট্ আলো জ্বেলে ডহরবিবির ভাবগতিক লক্ষ্য করছিল ওসমান। এবার ডুকরে উঠল সে, "কাইল রাইতে সড়কির ঘাই (আঘাত) খাইচি ডহর, তাই তুর লেইগ্যা মোরগা আনতে পারি নাই। শরীলটা (শরীর) ভাল হইলেই তুরে মোরগা খাওয়ামু। তুই আর কারু লগে জোড় পাতাইস না কিন্তুক—"

"হিঃ-হিঃ-হিঃ—যৈবনের দর দেখছিস আম্মা! যৈবনমতী বাইদ্যানীর লেইগ্যা কবরের মড়া তরি (পর্যন্ত) লাফাইয়া উঠে। হিঃ-হিঃ-হিঃ—" হাসির দমকে দমকে, অস্থি-মজ্জা-মেদ-পেশীর সুঠাম বেদেনীতনু দুলে দুলে উঠতে লাগল ডহরবিবির।

একটু পরেই ছই-এর বাইরে অদৃশ্য হলো ডহরবিবি।

আসমানী বলল, "এই ইদ্রিস—"

"কী আম্মা ?" আসমানীর নিঃশ্বাসের সীমানায় ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো ইদ্রিস!

"তুই আর যুশেফ ওসমাইন্যারে লইয়্যা অখনই রওনা হ'। সিরাজদীঘার বন্দরে তুরা থাকবি। হামরা পরশু বিহান বেলায় যামু। চৌকিদার আসবো, দফাদার শ্যাষে ওসমাইন্যার এই সড়কির ঘাই (আঘাত) দেখলে বেতরিবত ঝামেলা শুরু হইব। ট্যাকা দিতে দিতে, সুমুন্দির পুতেগো ঘুষ দিতে দিতে এক্কেবারে ফৌত (ফতুর) হইয়্যা যামু। নে, উইঠ্যা পড় শয়তানের ছাও।"

অনেকটা অন্তরঙ্গ হয়ে বসেছিল ইদ্রিস। আসমানীর কথাগুলো শুনতে শুনতে একটা উল্কার মত ছিটকে ছই-এর আর এক কোণে সরে গেল সে।

ভয়ানক গলায় আসমানী বলল, "কী হইল তর ? অমন ঝটকা মাইর‍্যা সইর‍্যা গেলি যে !"

"হামি অখন উই সিরাজদীঘায় যাইতে পারুম না। কাইল সারা রাইত ছাগল-বাছুর হাতাইয়্যা আনতে গিয়া একদানা ভাত পড়ে নাই প্যাটে ; এট্টু ঘুম আসে নাই চৌখে। অখন হামি কিছুতেই যাইতে পারুম না।" মুখে-চোখে একটা প্রখর বিদ্রোহ ফুটে বেরুল ইদ্রিসের।

"যাবি না ?" ঘোলাটে চোখ দুটো দাবাগ্নি হয়ে জ্বলল আসমানীর।

"না !" ইদ্রিসের একটি হিংস্র চোখে উদয়নাগের ফণা নেচে উঠল।

“কিছুতেই অখন হামি যামু না। সাফা হিসাব কইয়্যা দিলাম; মাইর্যা ফেললেও যামু না।”

“যাবি না! আইচ্ছা!” ভ্রূকুটিটা ক্রূর হয়ে উঠল আসমানীর, “বেবাজিয়া মরদের বিষদাঁত ভাঙ্গনের ফুসমন্তর হামার জানা আছে।” তীক্ষ্ণ গলায় আসমানী ডাকল, “জুলফিকার।”

ছই-এর ফাঁকে একটা করাল মুখের ছায়া পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয়াল গর্জন। গর্-র্-র্-র্। জুলফিকার।

একটু আগে ইদ্রিসের দৃষ্টিতে যে উদয়নাগের ফণাটা নেচেছিল, কী এক ভোজ-বাজীতে সেই ফণা অদৃশ্য হয়েছে। জুলফিকার! ঐ একটি নামের মহিমা দিয়ে ইদ্রিসের ফণা থেকে সব বিষ নিঙড়ে নিয়েছে আসমানী। ঐ নামের শাসন দিয়ে শুধু ইদ্রিসেরই নয়, এই বেবাজিয়া বহরের সব গর্জন, সব বিদ্রোহ, সব অসন্তোষকে স্তব্ধ করে দেয় সে।

আশ্চর্য স্তিমিত গলায় ইদ্রিস বলল, “জুলফিকারের আর প্রয়োজন নাই, হামি অখনই যামু আম্মা।”

কয়েকটি বিধ্বস্ত দাঁত মেলে হাসল আসমানী। উদ্দাম হাসি। সে হাসিতে মনে হলো, জীর্ণ দেহটি থেকে হাড়গোড় ছিটকে ছিটকে খসে পড়বে তার, “হ্বিক্-হ্বিক্-হ্বিক্—ইরেই কয় দাওয়াই! হ্বিক্-হ্বিক্-হ্বিক্—”

একটু পরেই একটা কোষডিঙির পাটাতনে ওসমানকে শুইয়ে দিল ইদ্রিস। একটা জারুল কাঠের বৈঠা থাবায় তুলে নিল যোশেফ। সেই বৈঠার ফলায় রয়নাবিবির খালের খরধার ঢেউগুলি ফালা ফালা হয়ে যেতে লাগল।

পলকপাতের মধ্যে কোষডিঙিটা সামনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এগারো

এখন দুপুর।

রয়নাবিবির খালটা ফুলছে, দুলছে, ফুঁসছে। ঢেউ-এ ঢেউ-এ তরঙ্গিত হচ্ছে শ্রাবণের রোদ। দু'পাশে অবারিত ধানবন। মেঘরঙা আমনচারার ফাঁকে ফাঁকে ফসলবতী আউশ। আউশের মঞ্জরীতে মঞ্জরীতে সোনালী লাবণ্য ঝিকমিক করছে।

ছই-এর গর্ভলোক থেকে বাইরের আকাশে নজরটা ছড়িয়ে দিল শঙ্খিনী। দু'টি চোখে যেন দৃষ্টির প্রেরণা নেই। আসল চোখের সামনে শ্রাবণের আকাশ, সেই আকাশে হীরার মালার মত সাদা বকের ঝাঁক, রয়নাবিবির খাল কী ধানবন, কিছুই নেই। একটি নিরাকার চেতনা, সেই চেতনায় কতকগুলি কথা, কয়েকটি মুখ, কতকগুলি ঘটনা, কতকগুলি সঙ্গোপন সুরের আলাপ এই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল শঙ্খিনীর।

কবে কোন্ দিন নাগমতী বেদেনীর তনুদেহে একটি মনের জন্ম হলো; সেই মনে তীব্র কামনারা, তীক্ষ্ণ বাসনারা কোরকের মত কবে ফুটে উঠল; আবার কবে একদিন জলবাঙলার জনপদে জনপদে, গ্রামে-গঞ্জে চক্রচূড়ের নাচ কী রয়ানি গান গাইতে গাইতে, কৃষাণীদের নীড়প্রেম দেখতে দেখতে সেই কামনা-বাসনার কোরকটি একটি কনকপদ্মের মত একটু একটু করে দল মেললো, সে কথা জানা নেই। জানা নেই, বেবাজিয়া বহরে নোঙরহীন ঠিকানাহীন নেশায় চলতে চলতে একটি নীড়ের স্বপ্ন, একটি গৃহী পুরুষের কল্পনা কবে কোন্ দিন তার যাযাবর বাসনাকে মুগ্ধ করেছিল, তার বেদেনী-কামনাকে উদ্বেল করে তুলেছিল। জানা নেই, কবে কোন্ দিন শঙ্খিনী আবিষ্কার করলো, সে শুধু নাগমতী বেদের মেয়েই নয়, নিয়তকালের সুখ-সাধ্য নীড়-পুরুষ-সন্তানের স্বপ্ন দিয়ে গড়া এক চিরন্তন নারী।

শ্রাবণের এই অলস দুপুরে, রোদ-পাখি-মেঘের এই রমণীয় পটভূমিতে শঙ্খিনীর আঠার বছরের চেতনা কোন হিসাবে সায় দিতে চায় না। নারী-পুরুষের সুখ-কূজনে, আর সুন্দর প্রেমে যে নীড় চকিত হয়, সেই নীড়ের কথা ভাবতে ভাবতে শঙ্খিনীর মনে হলো, গৃহীজীবনের নেপথ্যে শুধু সোহাগই নেই, শুধু অমৃতের আস্বাদই নেই। অন্তত বেবাজিয়া মেয়ে যখন গৃহাঙ্গনের স্বপ্ন দেখে, তখন সে স্বপ্নের পেছনে সুধা থাকে না, থাকে মারণবিষ। থাকে জুলফিকারের থাবায় বোড়াসাপ আর কেয়াকাঁটার শাসন, থাকে আসমানীর ভ্রূকুটি। থাকে অপঘাতের আতঙ্ক।

আজ বড় মহাজনের বাড়ি গিয়েছিল শঙ্খিনী। সেই অপরূপ গানটা বিচিত্র আকর্ষণে তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। 'আইজ রামের অধিবাস, কাইল রামের বিয়া গো কমলা—'। বিয়ে দেখতে চেয়েছিল সে। সীমন্তিনী বধূর মণিবন্ধে পরিয়ে দিতে চেয়েছিল আয়নাচুড়ি। কিন্তু বড় মহাজন তার সকল তৃষ্ণাকে আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। আলপনা-আঁকা অধিবাসের অঙ্গন থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। শুধু আজই নয়, শুধু বড় মহাজনই নয়, আরো অনেক, অনেকবার গৃহী পৃথিবী তার কামনাকে, তার সুন্দর পিপাসাকে অপমানিত করেছে। আঘাতে আঘাতে রক্তাক্ত করে দিয়েছে।

ভাবনাটা ঠিক একটা নির্দিষ্ট সরলরেখায় চলছে না শঙ্খিনীর। আচমকা চেতনার ওপর আর একটি ছায়া এসে পড়ল তার। চমকে উঠল শঙ্খিনী।

আজ শঙ্খচূড়ের নাচ দেখাতে দেখাতে বড় ভুঁইয়ার নেশালাল চোখ দুটির ওপর তার দৃষ্টি এসে পড়েছিল। সে চোখে যে ইঙ্গিত ঝকমক করছিল, তা বুঝতে বিন্দুমাত্র ভুলচুক হয় নি শঙ্খিনীর। এই জলবাঙলায়, এক চক্ররেখা থেকে আর এক দিগন্তে বেবাজিয়া বহরে ভাসতে ভাসতে এমন অজস্র নেশাভরা চোখ দেখেছে শঙ্খিনী। সে সব চোখের ভাষা পাঠ করতে করতে, তার আঠার বছরের বেদেনী-যৌবন বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। তার তরুণ তনুকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। সে দেখেছে ফিস্ ফিস্ গলায় আসমানী বড় ভুঁইয়ার কানে এক মন্ত্রদান করছিল। নিশ্চয়ই কোন মসনবী আওড়াচ্ছিল না আসমানী।

শঙ্খিনীর অভিজ্ঞ ইন্দ্রিয়গুলি নির্ভুল বলে দিতে পারে, ঐ ফিস্ ফিস্ করার নেপথ্যে যে রহস্যটি আছে, সে রহস্যটি হলো আজ কী কাল রাত্রিতে আদিম কামনা নিয়ে তাদের বহরে পদপাত হবে বড় ভুঁইয়ার। একটি হিংস্র শ্বাপদের মত তার যৌবনের ওপর ঝাঁপিয়ে, তার বরতনু দলিত করে, তার সুন্দর কামনাগুলিকে হত্যা করে ফিরে যাবে বড় ভুঁইয়া।

তবু শ্রাবণের এই দুপুরকে বড ভাল লাগছে শঙ্খিনীব। অজস্র বতিক্ষুব্ধ বাত্রির পর, অনেক গ্রাম-গঞ্জ, শহব-বন্দব পাড়ি দিয়ে এই নাগরপুর গ্রামের একটি দৃষ্টিতে সে আরতির সন্ধান পেয়েছে আজ। সে দৃষ্টি সেই বাদশা-জাদার। তার সাপ নাচানো দেখতে দেখতে চোখ দু'টি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল মহব্বতের। আর সেই মুগ্ধ চোখে তারই কামনার স্পষ্টবাক্ প্রতিচ্ছায়া দেখেছিল শঙ্খিনী। ভাবতে বড ভাল লাগছে, তার বাসনা কী এই পুরুষটিকে ঘিরে চরিতার্থ হবে? সার্থক হবে? উত্তর জানা নেই। তবু এই ধানবন, এই রোদ-আলো, এই অফুরন্ত বাতাসকে ভাল লাগছে। বড় ভাল লাগছে। আঠার বছরের ধুক ধুক বুকে এত ভাল লাগা এতদিন কোথায় অদৃশ্য ছিল?

কখন যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বাজাসাহেব। খেয়াল ছিল না। সহসা শঙ্খিনীর দৃষ্টি এসে পড়ল তাব মুখে। রাজাসাহেবের চোখ দু'টিও তার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে রয়েছে। এলোমেলো ভাবনার অতলান্ত থেকে উঠে এসে একজোড়া মুগ্ধ পুরুষচোখ দেখতে দেখতে মনটা সুরভিত হয়ে গেল নাগমতী বেদের মেয়ের।

উচ্ছল গলায় শঙ্খিনী বলল, "কী রাজাসাহেব, হামারে অত কী দেখতে আছিস? হামি কী মণ্ডা না মেঠাই! হামি তো এট্টা বাইদ্যানী মাগী। যেমুন কইর‍্যা হামার দিকে তাকাইয়্যা রইছিস, যেন গিল্যা খাবি। হিঃ-হিঃ-হিঃ—কী রে বেবাজিয়া মরদ, ব্যাপার কী?"

অন্তরঙ্গ হয়ে এলো শঙ্খিনী। তারপর ডান হাতের তর্জনী দিয়ে রাজা-সাহেবের চিবুকটা দুলিয়ে দিল।

প্রথমে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল রাজাসাহেব। নাগকন্যার মন এক বিচিত্র রহস্য। সে রহস্যের কূল-কিনারা নেই। সে রহস্যের থই নেই, বাঁও নেই। সে রহস্যের হদিস মেলে না। বেবাজিয়া পুরুষ সে রহস্যে দিশাহারা হয়ে যায়। কাল রাত্রে এই উচ্ছলা শঙ্খিনীই কী সোনার আংটিটা রয়নাবিবির খালে ছুঁড়ে ফেলেছিল? সে যেন আর এক যাযাবরী, এই শঙ্খিনীর এক বিপরীত প্রতিরূপ।

রাজাসাহেবের কণ্ঠ থেকে রঙ্গরস ঝরল, "হায়-হায়-হায়! কইস কী তুই শঙ্খিনী! তুই মণ্ডাও না, মেঠাইও না। তুই হলি এক্কেবারে চাকভাঙ্গা খাঁটি মধু। স্বোয়াদ কইর‍্যা কইর‍্যা খাইতে সাধ যায়, কিন্তুক তুরে জবর ডরাই লো শঙ্খি!"

এখনও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রয়েছে রাজাসাহেব। বেবাজিয়া পুরুষের এই

মুগ্ধ দৃষ্টি শঙ্খিনীকে বিভ্রান্ত করে দিল। এই মুহূর্তটির কী এক ইন্দ্রজাল রয়েছে যেন। রাজাসাহেবই হোক আর মহব্বতই হোক, সকল পুরুষের মোহিত দৃষ্টিতে যেন একই প্রার্থনা ফুটে থাকে। এই মুহূর্তে রাজাসাহেবকে দেখতে দেখতে যেন মহব্বতকে ভোলা যায়। গাঢ় গলায় শঙ্খিনী বলল, "এই রাজাসাহেব।"

"কী?"

"সারা জনম খালি হামার যৈবনবতী শরীলটার (শরীরটার) দিকে তাকাইয়্যাই থাকবি রাজাসাহেব ?"

বিভ্রান্ত গলায় রাজাসাহেব বলল, "না।"

শঙ্খিনী তাকাল রাজাসাহেবের দিকে। কত দিন, কত মাস, কত বছর তারা পাড়ি দিয়েছে এই বেবাজিয়া বহরে। তারা দু'জন, শঙ্খিনী আর রাজাসাহেব। একদিন এই বেদেবহরে ছোট্ট দু'টি কুঁড়ির মত মায়ের কোলে ফুটে উঠেছিল দু'জনে। একটু একটু করে তাদের শিশুদেহে কৈশোর এলো। কৈশোর পেরিয়ে যৌবন। এল জৈব কামনা, অজৈব বাসনা। শঙ্খিনী ভাবল, তার কামনা আর বাসনারা, তার রম্য যৌবন রাজাসাহেব নামে একটি দুর্বার পুরুষ-প্রেমকে আশ্রয় পেলে সতেজ কোন তেলাকুচ লতার মত বেয়ে বেয়ে উঠতে পারত। রাজাসাহেবই তো তার জীবনের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ পুরুষ। তার দেহমনের পর্দায় পর্দায় কোন্ ভাষা আছে, তার রঙ্গভরা কণ্ঠে কোন্ কৌতুক আছে, তার পাথরপেশী বুকের নীচে কোন্ গোপন গুঞ্জন রয়েছে, সে সবই জানে শঙ্খিনী।

আচমকা শঙ্খিনী বলল, "হামার দিকে তাকাইয়্যা থাকবি না তো কী করবি ?"

"কী করুম ?"

"হায় রে বেকুব বেবাজিয়া ; হামার দিকে তাকাইলে তুর পরানে উথল-পাথল বান ডাকে না ?"

"ডাকে তো !' '

"হায় মা বিষহরি, বেতমিজ মরদে কয় কী শোন ! হামারে দেখলে উর পরানে বলে উথল-পাথল বান ডাকে ! হায় মা বিষহরি ! হায় রে খোদাতাল্লা !"

কোন জবাব দিল না রাজাসাহেব। নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইল।

খুশি খুশি গলায় শঙ্খিনী বলল, "কী রে, কথা কইস না ক্যান ? জিভ্যায় কী ঠাটা (বাজ) পড়ছে !"

"কী কমু ?"

"আইজ হামার পরানটা জবর খোশবান আছে রে রাজাসাহেব। আইজ যা ক'বি তাইতেই মেজাজ খুশবু হইয়্যা যাইব। আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল শঙ্খিনী। তারপর রাজাসাহেবের তীক্ষ্ণ চিবুকটা ধরে নীচে নামিয়ে আনল। তারও পর ফিস্ ফিস্ গলায় বলল, "কাইল রাইতে আংটিটা ফেলাইয়্যা দিচ্ছি বইল্যা গোসা হইছিস ?"

রাজাসাহেবের অভিমানী কণ্ঠ থেকে একটিমাত্র একাক্ষর শব্দ বেরুল, "হুঁ—"

একটা পাহাড়ী প্রপাতের মত হেসে উঠল শঙ্খিনী, "হায় মা বিষহরি, বান্দার আবার রাগরঙ্গও আছে! অভিমান হইচে বুঝি।"

"হুঁ।"

"সেই অভিমান ভাঙ্গতে ঢপের দলের কৃষ্ণের লাখান (মত) মানভঞ্জনের পালা গাইতে লাগবে বুঝি!"

"হুঁ।"

"হুঁ! হায় মা বিষহরি, বেবাজিয়া মরদে কয় কী শোন!" দু'টি দূরায়ত চোখে কপট বিস্ময় ফুটিয়ে, সুঠাম ছন্দে ঘাড় বাঁকিয়ে, আঙুলের মুদ্রায় মুদ্রায় মধুর লাস্য ফুটিয়ে হাতখানা গালে রাখে শঙ্খিনী। তারপর বলে, "এই রাজাসাহেব, আইজ তুরে হামি মাতাইয়্যা দিমু।"

"ক্যামনে?"

"ইট্টু বাইরে যা বেশরিফ মরদ। হামি ছই-এর মধ্যে থিকা আইতে আছি অখনই।"

ছই-এর মধ্য থেকে বাইরের পাটাতনে বেরিয়ে গেল রাজাসাহেব।

বাইরের পাটাতনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রাবণের আকাশ, রয়নাবিবির খাল, মরসুমী পাখির ঝাঁক দেখতে দেখতে মনটা আশ্চর্য লঘু হয়ে গেল রাজাসাহেবের। আশ্চর্য প্রসন্ন হলো। এই ক'টা দিন ধরে শঙ্খিনীর যেন কী হয়েছিল। নাগমতী বেদেনীর মনের ওপর নীড়-প্রেমের সঙ্গে মহব্বতেব ছায়া এসে পড়েছিল। বড় অপরিচিত হয়ে গিয়েছিল শঙ্খিনী। রাজাসাহেবের মনে হলো, এই মুহূর্তে শঙ্খিনীর চেতনা থেকে মহব্বতের সেই ছায়া সরে গিয়েছে। কুহকিনী, রঙ্গিণী, সেই চিরকালের নাগকন্যা আবার ফুটে বেবিয়েছে শঙ্খিনীর তীক্ষ্ম কৌতুকে, খিল খিল হাসিতে, সুঠাম লাস্যে, বাঁকা ভ্রূভঙ্গে। আবার এই ক'টা দিনের দুর্যোগের পর নতুন করে অন্তরঙ্গ হয়েছে শঙ্খিনী। আবার সোহাগের সীমানায় এসে পড়েছে। এই ভাল। এই কৌতুকবতী শঙ্খিনীকে সে চেনে, সে জানে। চিরদিনের জানা এই নাগমতী শঙ্খিনীর কথা ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা মধুর হয়ে গেল রাজাসাহেবের।

ছই-এর মধ্যে আর কেউ নেই। চারিদিকে একবার চনমনে নজরটা ঘুরিয়ে আনল শঙ্খিনী। সকলেই আসমানীর নৌকায় ভিড় জমিয়েছে। ডহরবিবি, গোলাপী, আতরজান—সকলেই চলে গিয়েছে।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল শঙ্খিনী। তারপর মেহেদী ঘাগরাটার গ্রন্থি শিথিল করে পাটাতনের এক কোণায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। রক্তলাল কাঁচুলিটা তুঙ্গ বুকের কুম্ভযুগলকে তেমনি উদ্দাম ভাবেই জড়িয়ে রইল।

সামনেই সপ্তনাগের চূড়াচক্রে বিষহরি মূর্তি। তার পাশে থরে থরে সাজানো সাপের ঝাঁপি, বিষপাথরের ডালা আর জড়িবুটি-আয়নাচুড়ির সাজি। সেগুলি

পেরিয়ে ছই-এর এক কিনারে বেতের একটা চিনাই পড়ে রয়েছে। সেই চিনাইটাকে পাটাতনের মাঝখানে নিয়ে এল শঙ্খিনী। তারপর ডালাটা তুলে একটা রাঙা ডুরে শাড়ি বের করে আনল। বের করল সোহাগ-সিন্দুর আলতার শিশি, মাদার ফুলের রেণু, বউ-আয়না, শ্বেতচন্দন আর কাঠের চিরুনি। একটি নিভৃত লজ্জার মত এই তনুসজ্জার উপকরণগুলিকে বেতের চিনাইতে লুকিয়ে রাখে শঙ্খিনী। সোহাগ-সিন্দুর, আলতার শিশি দেখতে দেখতে মধুর শরমে ঘেমে উঠল যাযাবরী। সারাটি দেহে, অস্থিমজ্জার প্রতিটি মধুমান কোষে আবেশের রোশনাই জ্বলতে লাগল তার।

বাইরের পাটাতন থেকে রাজাসাহেব বলল, "কী করতে আছিস শঙ্খ ?"

"তুই ক' দেখি হামি কী করতে আছি !"

"ক্যামনে কমু ?"

"হায় রে বেকুব মরদ, এই মন লইয়্যা পিরিত করস ! হামি কখন কী করি, সেই কথাটা যদি আগে থিকা না বুঝতে পারলি তাব কেমুন মহব্বতের নাগর হইছিলি ?"

"তুই কী শুইয়্যা আছস ?"

কপট রোষে ফুঁসে উঠল শঙ্খিনী, "চুপ মার বান্দা। এক্কেবারেই বেশরীফ !"

"তবে কী করস ? মুরগার কাবাব খাইস ?"

"উঁহু !"

"তবে নির্ঘাত সাপের বিষদাঁত ভাঙতে আছিস। এইবার ঠিক হইচে।"

"সাপের বিষদাঁত না, তুর যে এট্টা বলদ-দাঁত আছে, সেইটা ভাইঙ্যা দিমু।"

বিব্রত গলায় রাজাসাহেব বলল, "তুর যে কত রঙ্গ, তার হিসাব কী হামি জানি ! কী যে করতে আছিস, কমু ক্যামনে ?"

"হামার রঙ্গের হিসাব জানস না ! আবার পিরিতও করন চাই হামার লগে। যা, যা বখিল উই আম্মা আসমানীর লগে পিরিত জমা গিয়া !"

এবার ককিয়ে উঠল রাজাসাহেব, "এমুন কথা কইস না শঙ্খিনী। ছই-এর মধ্যে আইস্যা দেখুম, কী করতে আছিস ? কী লো শঙ্খিনী ?"

নিজের নগ্ন অঙ্গশ্রীর দিকে তাকিয়ে চকিত হয়ে উঠল শঙ্খিনী, "হায় মা বিষহরি, শয়তানের ছাওটায় কয় কী শোন ! ছই-এর মধ্যে আইতে চায় ইবলিশটায় ! হামি বলে বেআব্রু হইয়া রইছি !"

খিক খিক শব্দ করে হেসে উঠল রাজাসাহেব, "আসুম লো শঙ্খ !"

সন্ত্রস্ত গলায় গর্জে উঠল শঙ্খ, "খবদ্দার আসবি না ইবলিশ। আইলে জানে খাইয়্যা ফেলুম।"

"তুই যখন চাইস না, তখন আসুম না।"

কিছু সময়ের বিরতি। এক সময় আবার শঙ্খিনী বলল, "এই রাজা-সাহেব—"

পাটাতন থেকে একটি বিমর্ষ শব্দ ভেসে এলো, "কী ?"

"গোসা হইলি না কী ?"

"না।"

"তবে হামারে হিজলফুল আইন্যা দে আর গোলাপীরে ডাইক্যা দে।"

"ক্যান ? হিজলফুল আর গোলাপীরে দিয়া কী হইব ?"

"উই যে ইট্টু আগে কইলাম, তুরে মাতাল কইর‍্যা দিমু। সেই লেইগা হিজলফুল আর গোলাপীরে হামার কামে লাগব।"

একটু পরেই শঙ্খিনীর নৌকায় এলো গোলাপী। আর ছই-এর ফাঁক দিয়ে একরাশ হিজলফুল পাটাতনে ছুঁড়ে দিল রাজাসাহেব।

সোহাগ-সিঁদুর, বউ-আয়না, আলতার শিশি, মাদার ফুলের রেণু—তনুসজ্জার নানা উপকরণ দেখতে দেখতে দৃষ্টিটা বিস্মিত হয়ে গেল গোলাপীর। সে বলল, "কী লো শঙ্খিনী, এইগুলি দিয়া কী হইব ?"

"কী আবার হইব ? এইগুলি দিয়া শরীল (শরীর) সাজাইয়া পুরুষেরে মজামু, মাতামু।"

"পুরুষ ! কোন্ পুরুষ ? রাজাসাহেব ?"

"হায় লো বাইদ্যানী মাগী, রাজাসাহেবরে মজাইতে আবার শরীলেরে (শরীরকে) সাজাইতে হয় না কী ? উই শয়তানটা তো অ্যামনেই মাইত্যা রইছে !"

সুঠাম দেহটিকে এই হিজলফুলে, এই সোহাগ-সিঁদুরে, এই আলতার রঙে মজাবার কথা ভাবতে ভাবতে চেতনার মধ্যে সহসা মৌমাছি গুনগুন শুরু হলো শঙ্খিনীর। শুধু রাজাসাহেবই নয়। যদি প্রয়োজন হয়, যদি রাজাসাহেব তার প্রার্থনাকে আবার আঘাত দিয়ে ফিরিয়ে দেয়, তা হলে, তার জীবনের দ্বিতীয় পুরুষটিকে মুগ্ধ করতে হবে। বাদশাজাদা আসবে তাদের বহরে। মহব্বত আসবে। তাকে এই বেবাজিয়া বহরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে এসেছে শঙ্খিনী। মনটা এক খুশি-খুশি সৌরভে ভরপুর হলো নাগমতী বেদের মেয়ের।

গোলাপী আবারও বলল, "কী লো শঙ্খ, কইলি না যে, কার লেইগ্যা তুই এমুন সাজন গোজন লাগাইছিস ? সেই ভাইগ্যমান (ভাগ্যবান) মরদটা কে লো ?"

"তুই ক' দেখি যুশেইফ্যার পিরীতের মাগী !"

"নিঘঘাত উই বড় ভুঁইয়ার লেইগ্যা।"

"বড় ভুঁইয়া !" শঙ্খিনীর কণ্ঠটা চমকে উঠল।

"হ, উই যে যার বাড়িতে হামরা আইজ সাপের নাচ দেখাইয়্যা রয়ানি গাইয়্যা আইলাম, তার লেইগ্যা বুঝি এই সাজন-গোজন।"

চোখের মণি দু'টো ঝিক মিক করে জ্বলতে লাগলো শঙ্খিনীর। চোয়াল দুটো বজ্রের মত প্রখর হয়ে উঠেছে। তুঙ্গ বুক খরতালে উঠছে নামছে। ভ্রূরেখার ওপর একটি উত্তেজনা ফুঁসছে। দু'টি ঠোঁট খড়্গের মত বেঁকে

গিয়েছে। ঘাসি নৌকার ছইটাকে কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠল শঙ্খিনী, "কী কইলি বান্দীর ছাও, উই বড় ভুঁইয়া বখিলটার লেইগ্যা হামি সাজতে আছি! আমার কাছে উই শয়তানের বাচ্চা আইলে উর গায়ে একটা খৈজাতি সাপ ছাইড়্যা দিমু। বাইদ্যানী মাগীর যৈবন দেখছে ইবলিশেরা, রস দেখছে, রঙ্গ দেখছে। কিন্তু অখন তরি (পর্যন্ত) গোসা দেখে নাই। হামি সেই গোসা দেখাইয়্যা ছাড়ুম। তবে আমার নাম শঙ্খিনী।"

শঙ্খিনীর কুপিত মুখখানার দিকে তাকিয়ে আর কোন কথা বলল না গোলাপী। পাটাতনের ওপর নিরুত্তর বসে রইল।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেল।

এক সময় রয়নাবিবির খাল থেকে সাজিমাটি দিয়ে মুখ মেজে এল শঙ্খিনী। রাশি রাশি চুলের মেঘে ছড়িয়ে দিল সুরভিত তেল। কপালের মধ্যবিন্দুতে কাঁচপোকার টিপ আঁকল। ভুলে গেল বড় ভুঁইয়ার কথা। সব ক্ষোভ, সব রোষ মুছে গেল মন থেকে। শুধু ভাবল শঙ্খিনী, এই দেহের প্রতিটি অঙ্গকে অমৃতস্বাদ করতে হবে। মনের অতলে গুন্ গুন্ গুঞ্জন জাগছে। রাজাসাহেব নামে প্রথম পুরুষটিই হোক আর মহব্বত নামে তার বাদশাজাদাই হোক—একটি পুরুষমনকে কুহকিত করে একজোড়া পুরুষ-চোখকে মুগ্ধ করে, সেই সুন্দর কামনাটির হাত ধরে এই বহর থেকে উধাও হবে শঙ্খিনী। তাই এই বরতনুকে সাজাতে হবে। রমণীয় করতে হবে।

সোহাগী গলায় শঙ্খিনী বলল, "গোলাপী—হামার চুলটা এট্টু বাইন্ধ্যা দে লো সোহাগী।"

কাঠের চিরুনি দিয়ে শঙ্খিনীর দীঘল চুলগুলিকে একটি সুন্দর কবরীতে সংবরণ করল গোলাপী। সামনে একখানা বউ-আয়না নিয়ে সুর্মার নিপুণ রেখা আঁকল শঙ্খিনী। বিন্দু বিন্দু শ্বেতচন্দনের আলপনা টানল কপালে। রক্তমাদারের রেণু সারা মুখে ছড়িয়ে দিল। তারপর তুঙ্গ কবরীর ফাঁকে ফাঁকে বনহিজলের ফুল সাজাল একটি একটি করে। তার পর পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়াল শঙ্খিনী। একটা রক্তাভ কাঁচুলি ছিল ঊর্ধ্বাঙ্গে। সেটি খুলে ফেলল সে। অনাবৃত বেদেনীতনু। সুঠাম। অপরূপ।

অপলক চোখে শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে রইল গোলাপী।

একটি মাত্র মুহূর্ত। পলকপাতের মধ্যে সবুজ রেশমের কাঁচুলি দিয়ে বক্ষকুম্ভ দু'টি সাজাল শঙ্খিনী। ক্ষীণ মেখলা থেকে মেহেদি রঙের ঘাগরা দুলিয়ে দিল। শঙ্খমণি সাপের রাশি রাশি হীরকদাঁত দিয়ে মালা গেঁথেছিল। গলায় দোলাল সেই হার। নাকে পোখরাজের বেসর। কানে রক্তপাথরের বনফুল। মণিবন্ধে গোছায় গোছায় আয়নাচুড়ি। কোমরে কুঁচিলা সাপের হাড়ের গোট! পায়ে ঝুমঝুম কাঁসার মল।

নিজের সুন্দর দেহটির দিকে বার বার তাকিয়ে দেখল শঙ্খিনী। তারপর মেহেদি ঘাগরার ওপর রাঙা ডুরে শাড়িটাকে তুলে নিল। অনেক কাল আগে কুমিল্লায় এক কৃষাণ-গ্রামে তাদের বহর নোঙর ফেলেছিল। সেই গ্রামেরই কুমার

বাড়ির এক ছোট্ট শ্যামলী বউ-এর কাছে শাড়ি পরা শিখেছিল শঙ্খিনী। ঠিক তেমনি প্রক্রিয়ার শাড়িটিকে কুঁচি দিয়ে, ফেরতা দিয়ে সারা দেহের ওপর লতিয়ে লতিয়ে সাজাল সে। তারও পর ডাকল, "গোলাপী—"

"কী?"

"এইবার তুই যা গিয়া।"

শঙ্খিনীর দিকে একবার তাকিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল গোলাপী। গোলাপী বাইরের পাটাতনে অদৃশ্য হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কপালের মধ্যবিন্দু থেকে কাঁচপোকার টিপটিকে মুছে ফেলল শঙ্খিনী। সেখানে একটি সিঁদুরের বিন্দু আঁকল সে, ক্ষুদ্র সিঁথিতে সিঁদুরের রেখা টানল। তারপর ছোট্ট পায়ের পাতা-দু'টি ঘিরে সোহাগ-আলতার আলপনা আঁকল।

বাইরের ডোরা থেকে রাজাসাহেবের গলা ভেসে এলো, "এতক্ষণ ধইর‍্যা ছই-এর মধ্যে কী করতে আছিস লো শঙ্খিনী? কতক্ষণ খাড়াইয়্যা রইছি। খাড়াইয়্যা খাড়াইয়্যা মাজা হামার ধইর‍্যা গেল।"

শঙ্খিনী বলল, "এই তো যাইতে আছি।"

চকিত হয়ে কপালের ওপর ডুরে শাড়ির ঘোমটা টানল শঙ্খিনী। হাতের মুঠিতে বউ-আয়না ধরা ছিল। সেই আয়নায় একটি কল্যাণী বধূর ছায়া পড়ল। ছায়া পড়ল একটি শরমবতী মুখের। সিঁদুরে-ঘোমটায়, চন্দন-চর্চায় সে মুখ অপরূপ। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আবিষ্ট হয়ে গেল শঙ্খিনী।

অসহিষ্ণু গলায় রাজাসাহেব বলল, "মরছিস না কী লো শঙ্খিনী? চিল্লাইয়্যা চিল্লাইয়্যা যে হামার গলাটা ফাইড়্যা গেল।"

"এই তো যাই।"

বউ-আয়নাটা পাটাতনের ওপর নামিয়ে রেখে বাইরে বেরিয়ে এলো শঙ্খিনী। শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নির্নিমেষ দৃষ্টির ওপর দিয়ে অনেকটা সময় পার হয়ে গেল রাজাসাহেবের। শঙ্খিনীর সারা দেহ থেকে যাযাবরী মুছে গিয়েছে। মুছে গিয়েছে নাগমতী বেদের মেয়ে। একটু একটু করে সে দেহে জন্ম নিয়েছে কে এক রূপকন্যা। সিঁদুরে-চন্দনে-আলতায় কে এক তিলোত্তমা ফুটে বেরিয়েছে সে দেহে। ফুটে বেরিয়েছে এক কল্যাণী বধূ।

রাজাসাহেবের মনে হলো, এ শঙ্খিনীকে সে চেনে না। পলক পড়লেই অসত্য একটা স্বপ্নের কুয়াশায় সে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বিস্মিত গলায় রাজাসাহেব বলল, "অ্যাক্কেবারে শরমবতী বউ হইয়্যা গেছিস দেখি! কী লো শঙ্খিনী? কী সোন্দর তুই? কী তোফা?"

রাজাসাহেবের দিকে তাকিয়ে শঙ্খিনীর চোখের পক্ষ্মদু'টি লজ্জার ভারে আনত হয়ে আসছে। দেহের প্রতিটি বিন্দুতে রাশি রাশি সঙ্কোচ জমেছে। বেদেনীর সুঠাম গ্রীবা থেকে, বাঁকা কটাক্ষের ঠমক থেকে, তীক্ষ্ন হাসির গমক থেকে এই মুহূর্তে বিজুবী মুছে গিয়েছে, অদৃশ্য হয়েছে কৌতুক আর রঙ্গরাগ। চেতনার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে জড়িয়ে রয়েছে সলজ্জ সঙ্কোচ আর

বিচিত্র এক কুণ্ঠা। এই লজ্জা, এই সংকোচ, এই কুণ্ঠার স্বাদ জীবনে আজ প্রথম। এক অনাস্বাদিত অনুভূতির আস্বাদে প্রতিটি দেহকোষ মধুমান হয়ে গিয়েছে শঙ্খিনীর। জীবনে এই প্রথম শরমবতী বধূ সেজে বড় ভাল লাগছে তার। বড় ভাল লাগছে।

রাজাসাহেব আবারও বলল, "বউ সাইজ্যা হামার মাথাটা ঘুরাইয়্যা দিছিস শঙ্খ। তুই যে কইছিলি, হামারে মাতাইয়্যা দিবি, ঠিকই মাতাইয়্যা দিছিস হামারে।" বলতে বলতে অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে এলো রাজাসাহেব। দাঁড়াল শঙ্খিনীর একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে। "বউ সাজলে এমুন সোন্দর দেখায় তুরে!"

বধূসাজের এই সুন্দর স্বীকৃতিতে মনটা পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে শঙ্খিনীর। সে স্বীকৃতি দিয়েছে রাজাসাহেব। রাজাসাহেবই বিমুগ্ধ হওয়া প্রথম পুরুষ। মনের মধ্যে সেই বাসনাটি আবার দল মেলল শঙ্খিনীর। মনে হলো, এই মুহূর্তে রাজাসাহেবই সত্যি। একান্ত ভাবেই সত্যি। মহব্বত নামে জীবনের সেই দ্বিতীয় পুরুষটির ভাবনা দূরতমই থাক।

আবিষ্ট গলায় শঙ্খিনী বলল, "হামারে তুর পছন্দ হইছে রাজাসাহেব?"

দু'টি বাহুর বেষ্টনে শঙ্খিনীকে বন্দী করতে করতে রাজাসাহেব বলল, "পছন্দ আবার হয় নাই! তুরে হামার বুকের পিঞ্জরে ভইর‍্যা রাখতে সাধ যায়।"

পুরুষ বাহুর বন্ধনে থর থর করে কাঁপছে সুঠাম দেহ। নাগমতী বেদেনীর তনুমন এই মুহূর্তে পুলকে-চমকে শিহরিত হয়ে উঠছে। তার এই দেহটির ওপর দিয়ে অজস্র রতিক্ষুব্ধ রাত্রি বয়ে গিয়েছে। গঞ্জে-গ্রামে, শহরে-বন্দরে, যেখানেই তাদের বহর 'পারা' ফেলেছে, সেখানেই রাত্রির অন্ধকারে এসেছে পীর-মোল্লা, ভুঁইয়া-মুচ্ছুল্লি, এসেছে ঠাকুর-গোঁসাই, মহাজন আর ব্যাপারীর মিছিল। আসমানীর মুঠিতে এক রাশ রুপালী টাকা গুঁজে, নখে নখে, দাঁতে দাঁতে তার আঠারো বছরের কুমারী যৌবনকে ফালা ফালা করেছে কামার্ত পুরুষেরা। দলে-পিষে তার অস্থিমজ্জা, তার সুন্দর প্রত্যঙ্গ দিয়ে সাজানো এই সুন্দর দেহটিকে ছত্রখান করে দিয়েছে। প্রতিটি রক্তকণায় পুরুষ স্পর্শের অজস্র অভিজ্ঞতা শঙ্খিনীর। সে স্পর্শ কামের পীড়নে কলঙ্কিত। রতির তাড়নায় সে অভিজ্ঞতা কলুষিত। সে স্পর্শ এতটা কাল তার দেহমনকে, তার যৌবনকে, সেই যৌবনের সকল বাসনা আর কামনাগুলিকে দগ্ধ করেছে। ছারখার করেছে।

এর আগেও অনেকবার রাজাসাহেবের স্পর্শ, তার নিবিড় সঙ্গ, তার দেহের ঘ্রাণ পেয়েছে শঙ্খিনী। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজাসাহেবের এই আশ্লেষটি কী মধুর! এই বাহুর বন্ধনী কী স্নিগ্ধ! পুরুষের স্পর্শ যে এত সুস্বাদু, এত রমণীয়, তা কী জানত শঙ্খিনী? পুরুষের বাহুতে শুধু যে পীড়নই নেই, পেষণই নেই, সে বাহুতে যে সুধা আছে, সে বাহুতে যে অমৃত আছে তা কী আগে বুঝেছিল যাযাবরী? পরম আবেশে দেহের পেশীগুলি শিথিল হয়ে

আসছে। বিলোল হচ্ছে দৃষ্টি। বিবশ হচ্ছে চেতনা। শঙ্খিনীর মনে হলো, শ্রাবণের এই দুপুর কী মনোরম! চিরকালের চেনা এই রাজাসাহেব কত অপরিচিত! রাজাসাহেবের বিশাল বুকের মধ্যে বরতনুটিকে সমর্পণ করল নাগমতী বেদের মেয়ে।

ফিস্ ফিস্ গলায় শঙ্খিনী বলল, "রাজাসাহেব হামার এট্টা কথা রাখবি?"

শঙ্খিনীর জীবনের প্রথম পুরুষটির গলায় দোলা লাগল। রাজাসাহেব বলল, "আজই তুই যেই কথা ক'বি, সেই কথা হামি রাখুম। তুর লেইগ্যা প্রেয়োজন হইলে হামি জান তরি (পর্যন্ত) দিতে পারি!"

পাথরপেশী যাযাবর। রাজাসাহেবের বুকের মধ্যে নিবিড় হয়ে মিশতে মিশতে, কোমল দেহটিকে রাজাসাহেবের বুকে বিলুপ্ত করতে করতে শঙ্খিনী বলল, "সাচা (সত্য) কইস, হামার লেইগ্যা তুই বেবাক করতে পারস?"

"সাচা (সত্য)! ইয়ার থিকা বড় সাচা হামার জীবনে কই নাই! তুই আইজ জবর নয়া। হামরা এতটা কাল এই বহরে রইল্যাম। তুরে দিনে রাইতে কত ফির দেখছি কিন্তুক বউ সাজলে যে তুই এমুন মিঠা হ'বি, এমুন অচিন হ'বি, এমুন নয়া হ'বি, তা কী আগে জানতাম শঙ্খ!"

"হামার শরীলটা (শরীর) ছুইয়্যা কসম খা, হামি যা কমু তাই করবি।"

"শরীল (শরীর) আর নয়া কইর‍্যা কী ছুমু (ছোঁব) তুর, তুই তো হামার বুকের মধ্যেই মিশ্যা রইছিস।" রাজাসাহেবের মোটা মোটা ঠোঁটে মৃদু হাসির ঢেউ দুলল। "কসম খাইলাম, তুই যা ক'বি, তাই করুম আইজ। নিঘ্‌ঘাৎ করুম।"

"তবে আইজ রাইতেই হামরা বহর ছাইড়্যা যামু। তুই আর হামি—আর কেউ না। বহরে যখন বেবাকে ঘুমাইয়্যা পড়ব, তখন তুই আর হামি পলাইয়্যা যামু অনেক, অনেক দূরে। আসমানী আর জুলফিকারের তিরসীমানার বাইরে। কিষাণী গেরামে গিয়া ঘর বান্ধুম। তুই চাষ-ক্ষেতি করবি, ছানাপোনা হইব হামাগো। কী সুখ, কী মজা!"

রাজাসাহেব নামে জীবনের প্রথম পুরুষটির দেহমনে বাসনা আর কামনার ফুল ফোটাতে ফোটাতে নিজের অতল তলায় তলিয়ে গেল শঙ্খিনী।

আশ্চর্য! শ্রাবণের এই দুপুরে কী এক ইন্দ্রজাল রয়েছে! রয়েছে বিচিত্র এক কুহক!

রাজাসাহেব বলল, "যামু। তরে লইয়্যা ঘরই বান্ধুম। আইজ আর কারুরে ডরাই না হামি। আম্মারে না, জুলফিকাররে না, বিষহরিরে না, তুই কাছে থাকলে কারুরে ডর নাই হামার। তুরে এতকাল দেখছি, তুর লেইগ্যা পরানে মহব্বতের রস জমছে, পিরিতের মৌ জমছে, কিন্তুক এমুন কইর‍্যা মোচড় দিয়া কুনোদিনই ওঠে নাই বুকটা। বউ সাইজ্যা তুই হামার কাছে খাড়াইলে এমুন কইর‍্যা যে মাইত্যা উঠুম, সেই হিসাব কি আগে আছিল পরানে? আইজ তুর লেইগ্যা হামি বেবাক করতে পারি শঙ্খ, বেবাক পারি। তিন পহর রাইতে

আসুম এই নায়ে। তুই সজাগ থাকিস শঙ্খ। তুরে লইয়্যা সেই সময় পালামু।”

ওপরে শ্রাবণের আকাশ ; সেই আকাশে খণ্ডছিন্ন মেঘমালা ভাসছে। নীচে রয়নাবিবির খাল ফুলছে, ফুঁসছে। চারপাশে, ধানবনে, পাটের অরণ্যে, তীরতরুর পাতায় পাতায় মেঘভাঙা সোনালী রোদ জ্বলছে।

বড় ভাল লাগছে দু'টি মানব-মানবীর। ভাল লাগছে রাজাসাহেবের। ভাল লাগছে শঙ্খনীর। নাগমতী বেদেনী ভাবছে ; অনেক, অনেকদিন পর তার বধূসজ্জার সকল গৌরব আর শরম দিয়ে, গর্ব আর সঙ্কোচ দিয়ে রাজাসাহেবকে জয় করেছে সে। দুর্বার বেবাজিয়া মনকে সকল সংস্কার থেকে সরিয়ে একান্ত করে পেয়েছে সে। আজ দূরে থাক মহব্বত। আজ বিস্মরণে মুছে যাক দ্বিতীয় পুরুষের সম্ভাবনা। জীবনে তার আর প্রয়োজন নেই। মহব্বত নামে নাগরপুর গ্রামের এক বিভ্রান্তি অদৃশ্য হোক। মিলিয়ে যাক।

আজ এই সিঁদুরের আলপনা এই রাঙা ডুরে শাড়ি, এই আলতার শিল্প, শ্বেতচন্দনের বিন্দুগুলি সফল হয়েছে। সার্থক হয়েছে। শঙ্খনী কী জানত, একটি ঘোমটা, দূরায়ত চোখে কিছু লজ্জা, সিঁদুরে আলতায় এক কুহক রয়েছে! সে কী জানত, এই ক'টি নগণ্য উপকরণে একটি দুর্জয় বেবাজিয়া পুরুষকে বিবশ করা যায়! নিবিড় করে পাওয়া যায়!

বার

খালের ওপারে, ধানবন পেরিয়ে একসারি মাদার গাছ। রক্তলাল মঞ্জরীতে ছেয়ে গিয়েছে শাখাগুলি। মাদার সারির পাশেই এক ঝোপ স্বাস্থ্যবতী বেতের লতা। বেতঝোপ থেকে একঝাঁক ডাহুক বেরিয়ে এলো।

দুপুর পার হয়ে গিয়েছে একটু আগেই। এখন বিকেলের সন্ধিকাল। এ-পাশের ধানক্ষেতে আউশ ধান কাটছে কৃষাণীরা। অরঘজ ধানের সোনালী মঞ্জরীগুলি রোদপাতে ঝিকমিক করছে। পাথরকাটা কৃষাণ দেহ। কালো কালো পেশীতে তরঙ্গিত বুক। কোমর সমান জলে দাঁড়িয়ে কাঁচি চালাচ্ছে সমানে।

রয়নাবিবির খালের দুরবাঁকে ‘ভেসাল’ জাল পেতেছে জেলেরা। ‘ভেসালে’র বাঁশে শঙ্খচিল! পায়ের চাপে চাপে ত্রিকোণ জালটা অতল থেকে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে উঠছে অজস্র মাছ। বর্ষার রুপালী ফসল। ছওলা, গরমা, চাঁদা, কালভাউস—অনেক উঁচুতে উঠে শেষবারের মত সূর্য প্রণাম করছে।

রাজাসাহেবের দু'টি বাহুর বন্ধনে এখনও নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে শঙ্খনী। মধুর ভাবনায় সুরভিত হয়ে গিয়েছে তার মন। অপরূপ আনন্দে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে যাযাবরী, আবিষ্ট হয়েছে। আজ সকল অন্বেষণের শেষে একটি পরম প্রাপ্তি হয়েছে তার। তিন প্রহর রাত্রে রাজাসাহেব আসবে তার

নৌকায়। তাকে নিয়ে জীবনের কোন প্রসন্ন দিগন্তে উধাও হয়ে যাবে।

মধুর ভাবনাটি কিন্তু বেশীক্ষণ স্থায়ী হলো না। অতিকায় ঘাসি নৌকাটা আচমকা দোলা খেয়ে নড়ে উঠল। পাশের নৌকার গলুই থেকে এই নৌকাটার পাটাতনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে আসমানী। আসমানীর গলায় শঙ্খচিল ডাকল, "শঙ্খ, এই শঙ্খ, এক্কেবারে সব্বনাশ হইয়্যা গেছে। তরাতরি (তাড়াতাড়ি) আয় তুই। ডহর আর গোলাপীরে পাঠাইয়্যা দিছি। ইদিকে চৌকিদার আইছে, দফাদার আইছে বহরে।"

আসমানীকে দেখতে দেখতে রাজাসাহেবের দু'টি বাহুর বেষ্টন শঙ্খিনীর দেহ থেকে ঝরে গেল। এক পাশে সরে দাঁড়াল শঙ্খিনী।

এতক্ষণ নজরে পড়ে নি। এবার ঘোলাটে চোখের মণিতে দু'টি ফণা তুলে তাকাল আসমানী। শঙ্খিনীর সারা শরীরে কমনীয় বধূসজ্জা। শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে আসমানীর বিধ্বস্ত দাঁতগুলি কড়মড় করে বেজে উঠল। কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠল আসমানী, "বেহায়া, এট্টু শরম নাই মাগীর শরীলের (শরীরের) কুনোখানে। অখনও তুর ঘর বান্ধনের সাধ যায় নাই! জুলফিকাররে দিয়া তুর শরীলে এই যে বোড়া সাপ ঘষাইলাম। তবু তুর পরানে ডর নাই! তুরে লইয়্যা যে হামি কী করুম!"

আশ্চর্য শান্ত গলায় শঙ্খিনী বলল, "কিছুই করতে লাগব না। চৌকিদার আইছে, দফাদার আইছে। তাগো খেজমত (সেবা) কর গিয়া আম্মা।"

সমস্ত মুখে একটি কদর্য ভঙ্গি ফুটলো আসমানীর, "চৌকিদার-দফাদার হামারে দেখলে মজবো না কী? যুয়ান মাগী, তুই থাকতে হামি যামু ক্যান লো শয়তানের ছাও।"

এবার আর্তনাদ করে উঠল শঙ্খিনী, "হামি পারুম না আম্মা! হামি পারুম না! যেইখানেই যাই, যেই গেরামেই বহর ভিড়াই, চৌকিদার আর দফাদার আইস্যা শরীলটারে এক্কেবারে ভাইঙ্গ্যা দিয়া যায়। এই গুণাহ্, মনের লগে এই বেতমীজ গোস্তাকি হামি আর পারুম না আম্মা।"

আশ্চর্য! শঙ্খিনীর কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়াল আসমানী। তার কণ্ঠ থেকে স্বাভাবিক বিষের বদলে আকস্মিক মধু ঝরল, "হামি তুর কী হই শঙ্খিনী!"

"আম্মা।"

"তুরে হামি কত ভালবাসি সেই খবর তো রাখস না! তুরে মারি, তুর গায়ে বোড়া সাপ ঘষি, বেবাক তুরে ভালর লেইগ্যা। তুরে কথা দিলাম, হিন্দুগো লাখান (মত) বউ সাজাইয়া তুরে হামি শাদী দিমুই। কিন্তুক অখন যদি উই চৌকিদারগো তুই না সামলাইস তো বেবাকরে ফাটকে যাইতে হইব! জানস তো, কাইল রাইতে রাজাসাহেবরা কিছু জিনিস হাতাইয়া আনছে গেরাম থিকা। আয়, আয়—তুই হামার আম্মা, হামার সোহাগী মাইয়া, হামার চোখের মণি।" কঙ্কালবাহু দিয়ে পরম মমতায় শঙ্খিনীর গলা জড়িয়ে ধরল আসমানী।

অবিশ্বাসী গলায় শঙ্খিনী বলল, "তুই হামারে শাদী দিবি তো আম্মা! হামার ঘর হইব। সোয়ামী হইব! পোলা হইব!"

বিধ্বস্ত দাঁতগুলি দিয়ে নীচের ঠোঁটটাকে ফালা ফালা করে ফেলল আসমানী। তারপর বিড় বিড় করে বলল, "বেবাক হইব, বেবাক হইব। শাদীর আগেই পোলা পাবি। আয়, অখন আয় হামার লগে।"

এবার রাজাসাহেবের দিকে তাকাল আসমানী। পাটাতনের এক কিনারে শিলামূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। আসমানী গর্জে উঠল, "তুরে না কত ফির নিষেধ কইর‍্যা দিছি রাজাসাহেব ; কত ফির কইছি, শঙ্খিনীর কাছে গিন্নী শকুনের লাখান (মত) ছোক ছোক করবি না। আবার যে তুই আইছিস ?"

"না, না—" রাজাসাহেবের মুখের মধ্যে শব্দ দু'টি ঘুরপাক খেতে লাগল।

"হারামজাদা, বান্দীর পুত—তুই এই কাচা মাগীটার মাথা চিবাইয়্যা খাইতে আছিস! ফুসুর ফুসুর কইর‍্যা ঘর বান্ধনের মন্তর দেও! কলিজা ফাইড়্যা রক্ত খামু তুর!" অতিকায় একটা গৃধিনীর মত রাজাসাহেবকে তাড়া করে এল আসমানী।

অদ্ভুত কারিৎকর্মা! পলকপাতের মধ্যে পাটাতনের ওপর থেকে খালের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাজাসাহেব। সে দিকে আগ্নেয় চোখে তাকিয়ে আসমানী হুঙ্কার ছাড়ল, "কাছিমের ছাও শুওর।"

শঙ্খিনীর সারাদেহে বধূসজ্জা। নাগমতী শঙ্খিনী, না এক নিরুপমা গ্রাম্য-বধূকে টানতে টানতে একেবারে শেষ প্রান্তের নৌকাটিতে নিয়ে এলো আসমানী।

ছই-এর মধ্যে একখানা জলচৌকির ওপর রাজাসন নিয়েছে দফাদার সেকেন্দর মৃধা। তার চার পাশে বৃত্তাকারে বসেছে জনকয়েক চৌকিদার। নীল চাপকানের ওপর চামড়ার বেল্ট। সেই বেল্টের মধ্যবিন্দুতে পিতলের চাপরাশ ঝকমক করছে। সেই চাপরাশে চৌকিদারির মহল্লা খোদিত রয়েছে। পিতলের ঝকঝকে চাপরাশ। মর্যাদার চিহ্ন। গৌরবের ঘোষণা।

দফাদার সেকেন্দর মৃধার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, এই মুহূর্তে সে যে কোন মানুষকে চরম দণ্ডাদেশ দিয়ে বসতে পারে। ছই-এর ভেতর একটা ভয়াল পরিমণ্ডল থম থম করছে।

পাটাতনের ওপর পানের ডাবর, মতিহারী তামাকের ডিবে, একরাশ ডাবা হুঁকো আর আগুনের মালসার রাজকীয় আয়োজন।

ডহরবিবি কলকির মাথায় তামাকের চিতা সাজিয়ে সাধনা শুরু করল, "খান দফাদার ছাহাব। তামুক খাইয়্যা মেজাজটারে তাজা করেন। হামারা বেবাজিয়া ; কী বরাত হামাগো। আপনাগো লাখান (মত) বাদশাজাদারা হামাগো বহরে আইছেন!"

অপাঙ্গে ডহরবিবির মুখের দিকে তাকাল সেকেন্দর মৃধা। একটি মুহূর্তের মধ্যে তীক্ষ্ণ-মুখ দাড়িকে তীক্ষ্ণতর করে, একটা চোখ কুঁচকে, আর

একটি চোখে সন্ধানী আলো জ্বেলে, লালরঙের ফেজ টুপিটাকে ঘন ঘন নেড়ে ডহরবিবির রূপ জরিপ করল সে। খুবসুরত? না, না,—ডহরবিবির দিকে তাকিয়ে শরীফ মেজাজটা বদখত হয়ে গেল তার। হুঙ্কার দিয়ে উঠল সেকেন্দর মৃধা, "হারামজাদী বাইদ্যানী, ঐ সব মিঠা কথায় আমার মনের চিড়া ভিজব না। এই কয়দিনে যা চুরি করছিস, বেবাক বাইর কর। না হইলে পিছমোড়া কইর‍্যা বাইন্ধ্যা গুষ্টিসুদ্ধ সদরে চালান দিমু।"

বেবাজিয়া বহরটাকে ঘিরে রেখেছে অজস্র কোষাডিঙি। কাল রাত্রিতে যে সব কৃষাণ বাড়িতে সিঁদ কাটা হয়েছিল, সেই সব বাড়ি থেকে অনেক মানুষ এসেছে। তাদের সোরগোলে রয়নাবিবির খালটা চমকে চমকে উঠছে। তাদের সমস্বর কণ্ঠে একই দাবি, একই ঘোষণা। খোয়া জিনিসগুলি যেমন করেই হোক, এই মুহূর্তে ফেরত পাওয়া চাই। সকলের দৃষ্টি বেবাজিয়া বহরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

ইতিমধ্যে পরিপাটি করে একটা জনাই পান সেজেছে গোলাপী। সুগন্ধি মসলার ভুর ভুর সৌরভ উঠছে। পানের খিলিটি হাতে তুলে এগিয়ে এলো বেবাজিয়া মেয়ে। কটাক্ষকে বিলোল করে, সারা দেহে একটি তীক্ষ্ণ লাস্য ফুটিয়ে গোলাপী বলল, "উই তামুক খাবেন না দফাদার ছাহাব। উই ডহরবিবির তামুকে মৌতাত নাই। উই তামুক টানলে বুক জ্বলবো, প্যাট ফুলবো। রাইতে ঘুম হইব না; মোন্দ খুয়াব দেখতে দেখতে পরান উথল-পাথল হইব। তার থিকা এই হামার হাতের পানের খিলি পান। ইহার মইধ্যে ভুর ভুর মসলার গন্ধ আছে, হামার ফুর ফুর মনের খুশবু আছে। খান, খান দফাদার ছাহাব।"

কৌণিক দৃষ্টিতে গোলাপীর যৌবনও জরিপ করল সেকেন্দর মৃধা। কাঁচুলির স্বচ্ছ আবরণের নীচে একজোড়া তুঙ্গ কুম্ভ। বেদেনীর সেই যুগলকুম্ভ একেবারে বুকের কাছাকাছি এসে ঠেকেছে। ধমনীর ওপর এক ঝলক মাতাল রক্ত আছড়ে পড়ল। আশ্চর্য! এতটুকু বিচলিত হলো না সেকেন্দর মৃধা। মুখের একটি রেখাও বিভ্রান্ত হলো না তার। বৃত্তাকারে বসে রয়েছে চৌকিদারেরা। এই সব উজির আমীরদের কাছে বিকলন ঘটলে, এতটুকু বিচলিত হয়ে পড়লে আর ইজ্জত থাকবে না। দুটি থাবায় শক্ত মুঠি পাকিয়ে, পেশীতে পেশীতে, শিরায় শিরায়, রক্তে রক্তে যে অসংযম উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, তাকে শাসন করল দফাদার সেকেন্দর মৃধা।

রয়নাবিবির খাল থেকে চিৎকার ভেসে আসছে, "কই গো দফাদার। চোরাই মাল বেবাক ফিরত চাই। না হইলে থানায় খবর দিমু।"

"বনফুল-গোট-বেসর—এতগুলি ট্যাকার মাল চুরি হইল। এট্টা কিনারা আইজের মইধ্যে না করলে জবর ল্যাঠা আছে। সিধা কথা কইয়্যা দিলাম।"

একটা উগ্র গলা শোনা গেল, "সারা রাইত এই সুমুন্দির পুত দফাদার আর চৌকিদারেরা ঘুমায়! আর গেরামে এট্টার পর এট্টা চুরি লাইগ্যাই রইছে। বেবাকে মিল্যা দস্তখত কইর‍্যা একখানা আর্জি পাঠাইয়া দিমু সদর থানায়।

তখন বউয়ার ভাইরা বুঝব, কত ধানে কত চাল !”

কর্তব্য সম্বন্ধে এবার সচেতন হয়ে উঠল সেকেন্দর মৃধা। গোলাপীর দিকে গর্জন করল সে, “যা মাগী, ঐ কিনারে যা। বাইদ্যানী বেবুইশ্যা। বুকের ঠসক দেখাইয়্যা আসল ব্যাপার চাপা দেওনের মতলব ! এক্কেবারে দুই ঠ্যাঙ ধইর‍্যা ফাইড়্যা ফেলুম না ! কী চুরি করছিস, তাই আগে বাইর কর। সেই বুড়ী মাগী গেল কই ?” বলতে বলতে গোলাপীর পাঁজরে একটা সশব্দ লাথির ইনাম দিল দফাদার সেকেন্দর মৃধা। পাটাতনের এক কোণে ছিটকে পড়ল গোলাপী।

দফাদারের নারীদেহ সম্বন্ধে সরস দুর্বলতা রয়েছে। চৌকিদারেরা এ-ব্যাপারে অতিমাত্রায় ওয়াকিবহাল। প্রথম দিকে দফাদার দরবেশ থাকে। তারপর একটু একটু করে সেই দরবেশের আবরণটা খসিয়ে একটা লোলুপ শ্বাপদ আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু গোলাপীকে লাথি মারার সঙ্গে সঙ্গে রসভঙ্গ হয়ে গেল। দৃষ্টিগুলো বিস্মিত হয়ে গেল চৌকিদারদের। সত্যই পয়গম্বর বনে গেল না কী দফাদার সেকেন্দর মৃধা !

গ্রামে এরকম বেবাজিয়া বহর নোঙর ফেললে নারীমাংসের ছিটেফোঁটা উচ্ছিষ্ট তাদের বখরাতেও পড়ে। কিন্তু দফাদার যদি এমন পীর বনে যায়, তবে জীবনের রসালো মাদকতার স্বাদ কোথায় পাওয়া যাবে ! ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা বিষাক্ত হয়ে উঠলো চৌকিদারদের। বেবাজিয়া বহর এসেছে ; অথচ নারীমাংসের উৎসবটি মুঠির মধ্যে এসেও ছিটকে গেল। ফসকে গেল !

বিচিত্র বিস্ময় ! এমন একটা ভয়াবহ মুহূর্তে ছই-এর দরজায় দু'টি নারীদেহের ছায়া পড়ল। আসমানী আর শঙ্খিনী !

যে মুখখানা থেকে এতক্ষণ অনর্গল ধারায় খেউড় বর্ষিত হচ্ছিল সেকেন্দর মৃধার, সেই মুখ থেকেই এবার সকল শব্দ ঝরে গেল ! কয়েকটি হতবাক্ মুহূর্ত পার হলো। একমুখ লালা সড়াত করে জিভের ওপর টেনে নিল সেকেন্দর মৃধা। চৌকিদার, দফাদার—এই ছই-এর মধ্যে অজস্র জোড়া চোখে যেন বাজ পড়েছে। দৃষ্টিগুলি বল্লম হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শঙ্খিনী নামে এক বেদেনীর বরতনুতে ! ঝাঁপিয়ে পড়েছে তার বিনীত বধূসজ্জার ওপর।

জুলফিকার, ইয়াছিন, রাজাসাহেব, গৈজদ্দি—কেউ নেই কোথায়ও। একটা আকস্মিক ভোজবাজির কুহকে বেবাজিয়া বহরটা থেকে পুরুষের চিহ্ন একেবারেই মুছে গিয়েছে।

চারপাশে ডহরবিবি, গোলাপী, আতরজান, এমনি আরো কয়েকটি যাযাবরী বসে রয়েছে। দরজার ওপর আসমানী আর শঙ্খিনী। যে দিকে তাকানো যায় কেবল বেদেনী আর বেদেনী। যতদূর নজর চলে, ততদূর কেবল জাফরানী ঘাগরা, ধারালো রঙের কাঁচুলি, বিলোল কটাক্ষ, তীক্ষ্ণ হাসির বিজুরী। নাগকন্যাদের হাতের পাতায় মেহেদি মাখা, ঠোঁটে পানের রসের বাহার, চোখে সুর্মার যাদুকরী রেখা।

কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে বেবাজিয়া মেয়ের বউ সাজার দৃশ্যটুকু

একেবারেই অভিনব ঠেকল সেকেন্দর মৃধার চোখে। শঙ্খনীকে দেখতে দেখতে তার বাদশাহী প্রতাপটুকু মুছে গেল। সব মিলিয়ে, এই হাসি-সুর্মা-মেহেদি, এই রঙ-রূপরস, তার ওপর নাগমতীর বধূবেশ—সব একাকার হয়ে চেতনার মধ্যে কী এক বিপর্যয় যেন ঘটে গেল সেকেন্দর মৃধার। থতমত গলায় সেকেন্দর বলল, "শোন বেবাজিয়ারা, হে-হে—বুঝলা কী না, কাইল এই গেরামে চৈন্দটা বাড়িতে চুরি হইয়্যা গেছে। হে-হে—বুঝলা কী না, যাগো জিনিস খোয়া গেছে, তারা সন্দ করতে আছে—এ কাম তোমাগোই। হে-হে, আমাগো আসনের ইচ্ছা আছিল না।"

পরিষ্কার আভাস পাওয়া যায়, দফাদারের কণ্ঠ থেকে সব গর্জন, সব হুঙ্কার উধাও হয়েছে। কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে তার চোখ দুটো শকুনের মত পাক খেয়ে খেয়ে শঙ্খনীর দিকে ধাওয়া করে যাচ্ছে।

এবার উজির-আমীরদের সভায় সাড়া পড়ে গিয়েছে! চৌকিদারাদের মধ্যে চিমটি কাটার ধুম পড়েছে। এও কী সম্ভব! এও কী বিশ্বাস্য! রাতারাতি এই রতিরিপুর দুনিয়াটা একেবারে মক্কাশরীফ হয়ে গেল না কী! ভাবতে ভাবতে দিশাহারা হয়ে গিয়েছিল চৌকিদাররা। আশ্চর্য! ঐ হারামজাদা দফাদারটা পর্যন্ত হাজী সাহেবের মত পবিত্র মসনবি আওড়াচ্ছিল। যাক, শুভ লক্ষণ দেখা দিয়েছে। খোদাতাল্লাহ্ বড় মেহেরবান। সেকেন্দর মৃধার লুব্ধ চোখজোড়ায় পরিচিত ভাষ্য পাঠ করেছে চৌকিদাররা। খোদাতাল্লাহ্ বড় এলেমদার। নইলে তাদের মত শরীফ মেজাজের লোকেদের এই বদখত দুনিয়ায় বসবাস করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ত।

সেকেন্দরের দৃষ্টির লিপি নির্ভুল পাঠ করে ফেলল শঙ্খনী। পাশ থেকে ক্রমাগত কনুইর বর্শা চালাচ্ছে আসমানী। অনেক কিছু তালিম দিয়ে নিয়ে এসেছে সে। একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলে অনিবার্য ফাটকবাস আছে বরাতে।

আর্ত দু'টি চোখ তুলে আসমানীর দিকে তাকাল শঙ্খনী। আসমানীও নির্নিমেষে তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার ধূসর চোখের মণিতে কালনাগের ফণা দুলছে।

এক মুহূর্তের দ্বিধায় মনটা দুলল। একটু ইতস্তত করল শঙ্খনী। তারপরেই দু'টি দুরায়ত চোখে তরল লাস্য ছড়িয়ে চটুল গলায় সে বলল, "আসেন গো দফাদার ছাহাব, হামার নায়ে আসেন। হামাগো বহরটা ইট্টু ঘুইর‍্যা দেখেন। মেজাজটা তোফাই লাগব।"

"হে-হে, এই তো এইখান থিকাই বেবাক দেখতে আছি। চুরির ঝামেলা লইয়্যা বেফয়দা তোমাগো বহরে আসনের ইচ্ছা আছিল না। কিন্তুক ঐ কিষাণীগো লেইগ্যাই আসতে হইল। হে-হে—না হইলে আসতাম না।"

"হামাগো বহরে আসবেন না, ইটা কেমুন কথা! ফরাশ পাইত্যা আপনের লেইগ্যা দুইটা রাইত বইস্যা কাটাইছি। হায়-হায়-হায়—দফাদার ছাহাব, পরানে এমুন দাগা দিলেন! আপনের লেইগ্যা সারাটা দিন, সারাটা রাইত

ঘুমাই নাই, কত খুয়াব দেখছি আপনের। হায় মা বিষহরি, শ্যাযে এমুন এট্টা বেদরদী কথা কইলেন। বহরে আসবেন না হামাগো! হায়-হায়-হায়!"

বিব্রত গলায় সেকেন্দর মৃধা বলল, "না-না, এই আর কী, এই আসুম, এই ঠিক করলাম—হে-হে, বুঝলা কী না! বাইদ্যানী বউ, তোমার কাছে না আইস্যা—হে-হে—"

সমস্ত দেহ থেকে একটি বিভ্রম চকিতে ছড়িয়ে এগিয়ে এলো শঙ্খিনী। তারপর মধুর গলায় বলল, "আসেন দফাদার ছাহাব, হামার কাছে আসেন।"

একবার সন্দিগ্ধ চোখে শঙ্খিনীর দিকে তাকাল দফাদার সেকেন্দর মৃধা। বেবাজিয়া বহর সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন সে। জীবনে অনেক নারীদেহের উত্তাপ দিয়ে অজস্র বাসর রচনা করেছে সেকেন্দর। নারীতনুর আস্বাদ সে জানে। কিন্তু এই বেদেনীরা সাংঘাতিক। নিমেষের মধ্যে হয়ত ঘাগরা কী কাঁচুলির কোন গোপন ভাঁজ থেকে এক উদয়নাগের বাচ্চা নিয়ে গায়ের ওপর ছুঁড়ে মারবে। তারপরেই খিল খিল হাসিতে ভেঙে ভেঙে পড়বে। কিংবা উন্দাম কৌতুকে একখানা আধহাত ছুরির ফলা পাঁজরের মধ্যে আমূল ঢুকিয়ে দেবে। একবার তো সেই রোশনপুরে একটা বেবাজিয়া খুনী ধরতে গিয়ে হাত খানেকের জন্য ল্যাজার আঘাতটা বুকের ওপর এসে পড়ে নি। প্রাক্-পুরুষের কেউ হয়ত হজে গিয়েছিল, সেই পুণ্যের খাতিরে সে যাত্রা বাজানের দেওয়া মহাপ্রাণটা নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছিল সেকেন্দর। আর ফিরেই ইমান আলী ফকিরের দরগায় সিন্নি দিয়েছিল। ল্যাজার ফলাটার কথা মনে হলে, চেতনাটা এখনও শিউরে ওঠে। আজও ঘুমের ঘোরে খারাপ খুয়াব দেখে লাফিয়ে উঠে সেকেন্দর মৃধা।

অনেক, অনেকটা সময় ধরে দু'টি চোখের মণি দিয়ে শঙ্খিনীকে যাচাই করল দফাদার। নাঃ, বেদেনীর এই বধূবেশ, দু'টি দুরায়ত চোখ, কী সুন্দর হাসিতে কোন কারসাজিই নেই। সন্দেহজনক কোন আভাসই নেই। দৃষ্টিটা প্রসন্ন হলো সেকেন্দর মৃধার।

শঙ্খিনী আবারও বলল, "আসেন গো নবাবজান। হামার নৌকায় গিয়া দুই চাইরটা রসের কথা কমু। মন খোশবান হইব, ম্যাজাজ তাজা হইব।"

এবার সেকেন্দরের গলা থেকে রঙ্গ ঝরল, "হে-হে, জবর তরিবতের কথা কইছ সোন্দরী। এমুন কাম করি যে দুই দন্ড রসের কথা কওনের সময় নাই। এই তো, সন্ধ্যার সময় চররসুলপুরে এট্টা খুনের মামলার তদ্বিরে যাইতে হইব। এই জনমে আর সুখ নাই, অরুচি ধইর‍্যা গেল এই দফাদারির কামে।"

একদিকে সংশয়, আর একদিকে দুর্নিবার আকর্ষণ। বেবাজিয়া নারীর এক থাবায় আলাদ গোক্ষুরের ফণা, আর এক থাবায় ফেনিল সুরাপাত্র। কাঁচ-পোকা যেমন নিশ্চিত টানে চলে আসে তেলাপোকার কাছে, তেমনি একটি প্রত্যক্ষ অথচ দুর্নিবার আকর্ষণে বেবাজিয়া বহরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেকেন্দর মৃধারা।

শঙ্খিনী আবারও উচ্ছল হলো, "আসেন, আসেন নবাবজান।"

"যামু তোমার লগে ?"

"নিচ্চয়, নিচ্চয়। হামার লগে না গেলে পরানের কথা কমু ক্যামনে ? পরানের কথা কী এত মাইনষের সামনে চিল্লাইয়্যা কওন যায়! একা একা ফরাশের উপুর বইস্যা কানে কানে সেই কথা কমু। আসেন, আসেন।"

"তবে চল সোন্দরী। আমার ডানাকাটা জলপৈরী।" জলচৌকিটা থেকে পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়াল দফাদার সেকেন্দর মৃধা।

আবার চৌকিদারদের আসরে চিমটি কাটার ধুম পড়েছে। সুসময় তবে আসন্ন। এই মুহূর্তটির জন্য তারা ইন্দ্রিয় উৎকর্ণ করে বসেছিল।

আচমকা, একান্তই আচমকা, এই বিশাল ঘাসি নৌকার মধ্যে একটা বাজ নেমে এলো যেন। এবার সেকেন্দর মৃধা চৌকিদারদের দিকে দৃষ্টিটা ছুঁড়ে মারল, "তোমরা সব অখন যাও। আমি একাই বেবাজিয়া বহর তল্লাসী কইর‍্যা ফিরুম।"

বেদেনীতনুর রূপ আর যৌবন, লাস্য আর কটাক্ষ দিয়ে উদ্দাম ফূর্তি মাইফেলের যে খোয়াবটা এতক্ষণ লালন করছিল চৌকিদাররা, একটি প্রচণ্ড আঘাতে সেটা বুদ্বুদের মত ফেটে চৌচির হয়ে গেল। চৌকিদাররাও উঠে দাঁড়াল। তাদের চোখে দুর্যোগের আভাস।

একটু শঙ্কিত হলো দফাদার সেকেন্দর মৃধা। সকলে জোট পাকিয়ে সদর থানায় তার বিরুদ্ধে একটা কেলেঙ্কারি না করে বসে! অবশ্য নিজের ওপর অখণ্ড আত্মবিশ্বাস আছে তার। তবু সব দিক সামাল দিয়ে কাজ করতে হয়। চাকরিটা আজ আর ডানা-মেলে-দেওয়া ময়ূরপঙ্খী নয় যে সব ঝড় তুফানের বাধা ডিঙিয়ে চলে যাবে। আজ সেটা একটা ভাঙা বজরা। যে কোনও সময় ভরাডুবির আশঙ্কা রয়েছে। চাকরিটা থাকার জন্য এই মহল্লায় তার অবাধ প্রতাপ। নইলে আবার নিড়ানি নিয়ে ধান-কলাইর ক্ষেতে গিয়ে নামতে হবে। ইয়া আল্লাহ্। তোবা তোবা।

ফিস ফিস গলায়, কোরান শরীফের 'সুরা' আওড়াবার ভঙ্গিতে সেকেন্দর মৃধা বলল, "তোমরা অখন যাও। বেশী মানুষ থাকলে ঝামেলা হইব। আমি বেবাক বন্দোবস্ত কইর‍্যা আসতে আছি। তোমাগো বখরা মাইর যাইব না। তোমরা কিষাণীগো লইয়্যা গেরামে যাও। এইখানে বেফয়দা চিল্লাইয়্যা তো কোন লাভ নাই!"

বিড় বিড় করে বকতে বকতে চারজন চৌকিদার বেদেবহর থেকে কোষ-ডিঙিতে নেমে গেল।

"শালার বেবাক কিছু একা মারার মতবব।"

"হ, হ—উই বাইদ্যা মাগীটারেও ভোগ করব। আইচ্ছা, সময় আইলে আমরাও দেখুম। হে খোদা, রহিমতুল্লা, একবার মুখ তুইল্যা তাকাও ; আমারে দারোগা বানাও ; যা চাও, তাই ছদ্‌গা (উৎসর্গ) করুম তোমার নামে। ঐ দফাদার শালারে শিখাইয়্যা দিমু একেবারে। হে খোদা, ঘর জরু বেবাক বেচুম ; তুমি খালি কও, কী পাইলে তুমি খুশী হইবা ? আমারে

দারোগা বানাও। হে আল্লা।" আবেগভরে বলল একজন।

আর একজন সরস টিপ্পনী কাটল, "ঘরও বেচবি, আবার জরুও বেচবি! জরু বন্দক দিলে আমি রাখতে রাজী আছি। হিক্-হিক্-হিক—" কুৎসিত শব্দ করে হেসে উঠল আর একজন।

জ্বলন্ত চোখে তাকাল আগের জন।

অবশ্য তাদের এই ফিস্ ফিস্ মস্নবি আওড়ানো সেকেন্দর মৃধার কানে পৌঁছল না। আর কোনদিনই তা পৌঁছবে না।

একটু পরেই রয়নাবিবির খালের দূরতম বাঁকে চৌকিদার আর কৃষাণীদের কোষডিঙিগুলি মিলিয়ে গেল।

ঘাসি নৌকার স্বল্পালোকে সেকেন্দর মৃধা তাকাল আসমানীর দিকে, "হে-হে—বুঝলা কী না বুড়া বাইদ্যানী, তোমাগো বহরটা এট্টু তল্লাস কইর‍্যা দেখুম। হে-হে, গেরাম থিকা অনেক ট্যাকার মাল উধাও হইচে! হে-হে—"

"তার আর কাম নাই দফাদার ছাহাব। হামারই ভুল হইয়্যা গেছিল, আপনে হামাগো বহরে আইছেন, আপনের এট্টা সোম্মান আছে না? সেই সোম্মান হামাগো রাখতে লাগব না?" বলতে বলতে ধূসর-রঙ ঘাগরাটার কোন গোপন গ্রন্থি থেকে এক রাশ কাঁচা টাকা বের করে সেকেন্দর মৃধার মুঠিতে গুঁজে দিল আসমানী। এই বেদে বহরের দলনায়িকা সে।

অজস্র কাঁচা টাকা। এক মুঠো রুপালী পুলক। তুড়ি দিয়ে দিয়ে টাকাগুলি বাজিয়ে একটা জীর্ণ গেঁজের মধ্যে গুনে গুনে ফেলতে লাগল সেকেন্দর মৃধা। আচমকা, একান্তই আচমকা একটা চোখ বুঁজে গেল তার, আর একটি চোখ কুঞ্চিত হলো। ভ্রূদুটো খান্ খান্ হয়ে ভাঙলো। সমস্ত মুখে কে যেন মাকড়সার জাল বুনল। বিরস গলায় দফাদার বলল, "উঁহু, মোটে বিশটা ট্যাকা। উয়াতে হইব না। এত ট্যাকার মাল চুরি গেছে গেরাম থিকা। আমার সন্দ হয়, এই বহর তল্লাস—হে-হে, বুঝলা কী না!"

শঙ্খিনীর দু'টি চোখে অর্থময় নজর রাখল আসমানী।

একটু বিভ্রান্ত হলো শঙ্খিনী। তারপরেই দফাদার সেকেন্দর মৃধার নিঃশ্বাসের সীমানায় ঘন হয়ে দাঁড়াল সে। তার কণ্ঠ থেকে মধুর লাস্য ঝরে ঝরে পড়তে লাগল, "বহরটা তল্লাস কইর‍্যা দেখনের সাধ হইচে! নিচ্চয়, নিচ্চয় দেখবেন। কিন্তু নবাবজান, হামার লগে আসেন। ইট্টু পান তামাক খান। ইট্টু মিঠা পানি! হিঃ-হিঃ-হিঃ—" খিল খিল হাসি মদির হলো শঙ্খিনীর। কটাক্ষ মাদক হলো।

চেতনার মধ্যে কী এক বিপর্যয় ঘটল সেকেন্দর মৃধার। স্নায়ুগুলি বিচলিত হলো। একেবারে বুকের সামনে এক যৌবনবতী বেদেনী। তার দেহের ঘ্রাণ, তার কুহকিত দৃষ্টি, তার রমণীয় বধূসাজ, তার সোহাগ-সিঁদুর, আলতা, মাদার ফুলের রেণু, রাঙা ডুরে শাড়ির ছন্দ—সব মিলিয়ে রক্তে রক্তে আফিম ফুলের নেশা ছড়িয়ে গেল সেকেন্দর মৃধার। বেদেনীর উষ্ণ নিঃশ্বাস পড়ছে বুকে। ইচ্ছা হলে নাগমতী বেদের মেয়ের দেহ দু'টি বাহু দিয়ে বেষ্টন

করা যায়। আর ভাবতে পারছে না সেকেন্দর। শুধু মনে হচ্ছে, এই বেদেবহর তার থাবায় এমন মধুর, এমন নেশাময় একটি বেদেনী বউ উপহার দেবে, তা কী সে জানত! সবই খোদাতাল্লাহ্‌র মর্জি!

একটু পরেই ছই-এর মধ্যে এলো ডহরবিবি। তার হাতে কাঠের পানপাত্র। সেই পাত্রটি দেশী মদে টইটম্বুর। ডহরবিবির হাত থেকে পানপাত্রটি নিজের মুঠিতে তুলে নিল শঙ্খিনী। তারপর বিলোল চোখে তাকাল। তারও পর সেই সোনালী তরল সেকেন্দরের ঠোঁটের সামনে তুলে ধরল, “খান নবাবজান। এক ঢোক গিললে পরানের যত আকুলি-বিকুলি, যত রসরঙ্গ তুফানের লাখান (মত) বাইর হইয়্যা আসব। খান, খান।”

রোমশ একখানা থাবা বাড়িয়ে পানপাত্রটাকে আঁকড়ে ধরল সেকেন্দর মৃধা, “চল গো বাইদ্যানী। আইজ তোমার লেইগ্যা দোজক হউক আর জন্নাত হউক আর আসমান-জমিনের যেইখানেই হউক আমি যামু। চল, যেইখানে বাসর পাতবা। চল, যেইখানে হামাগো শা-নজর (শুভদৃষ্টি) হইব। হাঃ-হাঃ-হাঃ—” মাতাল গলায় হেসে উঠল দফাদার সেকেন্দর মৃধা।

এবার শঙ্খিনীর দু'টি চোখের মণিতে কুটিল মেঘের ছায়া পড়ল। ইন্দ্রিয়গুলি সন্ত্রস্ত হলো নাগমতী বেদেনীর। শঙ্খিনী ভেবেছিল, কিছুটা তামাসা, কিছুটা লাস্য, বাঁকা কটাক্ষ, খিল খিল হাসি আর শাণিত কৌতুকের যৌতুক দিয়ে সেকেন্দরের ফণাকে বিবশ করবে সে। ভেবেছিল, সারা দেহের বিভ্রম দিয়ে দফাদারকে মাতিয়ে মাতিয়ে এই বেবাজিয়া বহরকে সে নিরাপদ করবে। নির্বিপদ করবে।

কুহকবতী বেদেনী খৈজাতি-শঙ্খনাগ-চন্দ্রবোড়ের সঙ্গে তার অহরহ সহবাস। রাশি রাশি নীল গরল নিয়ে তার সংসার। তার বাণিজ্য। সেকেন্দরের চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল শঙ্খিনী। সে চোখে দু'টি ভয়াল ফণা ফুঁসছে। কালচিতি, দাঁড়াস, উদয়নাগ, তক্ষক—পৃথিবীর কোন সাপের সঙ্গে সেকেন্দরের চোখের সাপ দুটোর মিল নেই। কিন্তু পুরুষচোখের ঐ সাপ দুটোর সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয় শঙ্খিনীর। ধমনীর ওপর একরাশ ভীরু রক্ত উছলে পড়ল বেদেনীর। আজকের বধূসজ্জিনী শঙ্খিনী ঐ সাপ দু'টিকে বশ করার মন্ত্র জানে না। তাদের বিষদাঁত ভেঙে দেবার কৌশলও তার অজানা। নাগমতী মেয়ে নির্ভুল জানে, খানিকটা কালো বিষ না ঢেলে সেকেন্দরের চোখের ফণা দুটো তাকে রেহাই দেবে না। ভয়ে, আতঙ্কে থর থর করে বুকের ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা চমকে চমকে উঠতে লাগল যাযাবরীর।

কখন যে ছই-এর বাইরে চলে গিয়েছিল আসমানী, এতক্ষণ সে খেয়াল ছিল না শঙ্খিনীর। ক্যাঁচ করে একটা শব্দ উঠল। বাইরে থেকে ছই-এর ঝাঁপ বন্ধ করে দিয়েছে আসমানী।

গলুইর ওপর দাঁড়িয়ে বিচিত্র খুশিতে মনটা হিংস্র হয়ে উঠল আসমানীর। মাত্র কুড়ি টাকা আর এক রঙ্গিনী বেদেনীর দেহ, সেই দেহের উত্তাপ, সেই দেহের যৌবনের বিনিময়ে যদি নাগরপুর গ্রামে অজস্র সোনার বেসর-বনফুল-

গোট-পৈছা, চোরাই বাসন-কোসনের একটা নিরাপদ সুরাহা হয় তো মন্দ কী? শঙ্খিনীর সুঠাম তনুটির তীর শাণিয়ে অনেক দিগ্বিজয় করেছে আসমানী। তাই উদয়নাগের ফণায় একটি মণিপদ্মের মত তাকে পাহারা দিয়ে চলেছে সে। এই বেবাজিয়া বহরে তাকে দৃষ্টি-বন্দী করে রাখে।

তন্বী লতার মত সুঠাম দেহ। রাঙা শাড়ির আড়ালে সেই দেহটি বেয়ে কালঘাম ছুটলো! শঙ্খিনী আর একবার চমকালো। তার ওপর দিয়ে অনেক পশুমুহূর্ত উড়ে গিয়েছে। অনেক লোলুপ রতি, অনেক লালসার পীড়ন বয়েছে। কিন্তু এই বধূসাজের শঙ্খিনী, এই মুহূর্তে ঘোটক-জাতীয় পুরুষের লালসার মশালে নিজেকে সঁপে দিতে পারছে না। এই অশুচিতে, এই ক্লেদে, জীবনের এই ভয়াল গ্লানিতে আর ডুবতে পারছে না। সে আজ ক্লান্ত, শ্রান্ত। অনেক রতিক্ষুব্ধ রাত্রি পেরিয়ে আজ পুরুষকে প্রথম ভয় পেল বেদের মেয়ে।

আর একবার সেকেন্দর মৃধার দিকে তাকাল শঙ্খিনী। আরো, আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে, আরো অন্তরঙ্গ হয়ে, বুকের কাছে নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেকেন্দর। শিউরে তিন পা পিছিয়ে গেল শঙ্খিনী। তারপর আর্তনাদ করে উঠল, "আপনে এইবার যান দফাদার ছাহাব। আপনে যান, যান। মেহেরবানি কইর‍্যা যান। হামার জবর ডর করতে আছে। মেহেরবানি করেন দফাদার। খোদা আপনেরে দোয়া করব।"

"মেহেরবানি!" ভ্রূ দুটো কুঁচকে অট্টহাসি হেসে উঠল সেকেন্দর মৃধা, "হাঃ-হাঃ-হাঃ—মেহেরবানি, মেহেরবানি তো তুমি করবা। কাছে আস সোন্দরী! অমন ইচা (চিংড়ি) মাছের লাখান (মত) ছটকাইয়্যা গেলে চলে রসবতী!"

কস্তুরীমৃগী যেমন বাঘের ছায়া দেখে চকিত হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি ছটফট করে উঠল শঙ্খিনী। নিভন্ত গলায় সে বলল, "আপনে যান দফাদার ছাহাব। আপনে আমার ধর্মের বাজান।"

এক নিঃশেষ চুমুকে কাঠের পানপাত্রটা শূন্য হয়ে গিয়েছে। নেশার প্রাথমিক প্রহারে মাথাটা টলমল করছে সেকেন্দরের। এই মুহূর্তে তার রঙিন নেশার মৌতাতে শঙ্খিনীর সুঠাম দেহটি ছাড়া পৃথিবীর সকল জিজ্ঞাসা, সকল পরিচয় একেবারেই মিথ্যে। একেবারে অবাস্তব। বিশৃঙ্খল গলায় আবার অট্টহাসি বাজলো সেকেন্দরেব, "রসবতী, এই আবার কেমুন রঙ্গ! আমার লগে বাসর পাতবা কইল্যা! কিন্তুক এই আবার কেমুন মশকরা! আমারে যে ধর্মের বাজান কও! কী গো বাইদ্যানী? তোমার রঙ্গের যে বাঁও পাই না, কিনারা পাই না! কত যে ঠসক জান! হাঃ-হাঃ-হাঃ—"

"রঙ্গ না, মশকরা না। এই কী রঙ্গের সময় দফাদার ছাহাব।" ককিয়ে উঠল শঙ্খিনী।

"কী যে কও রসবতী! এ তো রসরঙ্গের সময়। আর আমার লগে তো রঙ্গের আর মশকরার সম্পক্কই পাতাইছ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—"

অনেকটা এগিয়ে এসেছে সেকেন্দর। এসেছে নির্ভুল পদক্ষেপে। এসেছে

একটি নারী দেহভোগের হিংস্র কামনায় তাড়িত হয়ে। শিকারী চোখে শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেকেন্দর, একেবারেই নিষ্পলক।

চিৎকার করে উঠল শঙ্খিনী, "আপনে যান, যান দফাদার ছাহাব। হামি আর একজনের ঘরের বউ। হামার কাছে মোন্দ মতলব লইয়্যা আসবেন না। যান, যান। ধম্মের বাজান, আপনের পায়ে ধরি হামি। দোয়া করেন! মেহেরবানি করেন।"

"তোমরা বেবাজিয়া মাগী। তোমাগো বুঝতে খোদ জনমদাতা খোদারও চাইর জনম লাগব। ডানাকাটা হুরী, কী যে তামাশা কর! বার বার বাজান কও ক্যান? আমি কী তোমার বাজান হইতে চাই! আমি কী হইতে চাই তা কী বোঝ না নাগরী! হাঃ-হাঃ-হাঃ,—" কদর্য রসিকতায় ভেঙে ভেঙে পড়ল সেকেন্দর মৃধা।

আশ্চর্য শান্ত গলায় শঙ্খিনী বলল. "হামি যে আর একজনের বউ। আইজ রাইতে হামার শাদী হইব।" নাগমতী বেদেনীর চোখে একটি মুগ্ধ পুরুষের ছায়া দুলছে। সে ছায়া রাজাসাহেবের। তার চেতনায় রাজাসাহেবের মধুর প্রতিশ্রুতি টলমল করছে। আজ দিক রাত্তিরে তার নৌকায় আসবে রাজাসাহেব। তাকে নিয়ে পলাতক হবে। ফেরারী হবে। কোন কৃষাণ-গ্রামে, কোন বনস্পতির ছায়াতলে নীড় বাঁধবে তারা। তারা সুখী হবে। খুশী হবে।

"হাঃ-হাঃ-হাঃ—। রাইতে শাদী হইব আব একজনের লগে! তার আগে আমার লগেই শাদী হউক। আর একজনের বউ! কী গো বাইদ্যানী রসবতী, এক্কেবারে হিন্দুগো সীতা-সতী হইয়্যা গেলা! অখন যে যাইতে কও, তা কী হয়? এন্দুর আইস্যা ফিরন যায় না। রস করনের সময় মনে আছিল না! হাঃ-হাঃ-হাঃ—" মাতাল গলায় দুলে দুলে হেসে উঠল সেকেন্দর মৃধা। আরো এগিয়ে এলো সে। তার চোখে, নখে, তার থাবায়, বাহুতে, দাঁতে আদিম অরণ্য-দিন কাঁপছে।

একটু পরেই কস্তুরীমৃগীর ওপর বাঘ ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রাণঘাতী চিৎকার করে উঠল শঙ্খিনী।

একসময় শঙ্খিনীর বধূবেশকে অপমানিত করে, ছত্রখান করে, তার রমণীয় স্বপ্নে রাশি রাশি জ্বালা ছড়িয়ে ছই-এর বাইরে এলো সেকেন্দর মৃধা।

বিচিত্র আসমানীর মন। গলুইর ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ সে ভাবছিল, শঙ্খিনীর যে নীড়প্রেম কামনা আর বাসনার সরস মাটিতে একটি বীজ দানার মত অঙ্কুরিত করেছে তাকে, সেই অঙ্কুরটিকে দলিত করার জন্য সেকেন্দর মৃধার প্রয়োজন ছিল। সবই খোদাতাল্লাহ্‌র দোয়া। সবই বিষহরির মর্জি। হিংস্র আনন্দে আসমানীর হিসাবহীন বয়সের মনটা ভরে গেল।

ইতিমধ্যে দফাদার এসে দাঁড়িয়েছে সামনে।

আসমানী হাসল। তারপর রহস্যময় গলায় বলল, "কী দফাদার ছাহাব, মেজাজ খোশবান হইছে তো আপনের!"

সেকেন্দর মৃধা বলল, "হ, হ, বুড়ী বাইদ্যানী। জবর খুশী হইচি। ডরের কিছু নাই। আই কেউ তোমাগো বহরে বিরক্ত করতে আসব না। এইবার আমি যাই।"

"আবার আইসেন দফাদার ছাহাব। আপনেই হামাগো খোদা। আপনের দোয়ায় হামরা বাইচ্যা রইছি এই আসমানের নীচে। আপনে মেহেরবান—"

কোন জবাব দিল না সেকেন্দর মৃধা। টলমল মাথা নিয়ে নেশালাল চোখে একবার তাকাল আসমানীর দিকে। তারপর এলোমেলো পায়ে গলুই থেকে পাশের কোষাডিঙিতে নেমে গেল।

এখন গোধূলির আকাশ থেকে কোন তীরন্দাজ রাশি রাশি সোনার তীর ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে। অনেকদূরে রক্তমাদারের শাখায় একঝাঁক প্রবাসী পাখি জলসা বসিয়ে দিয়েছে। ধানবন থেকে সোনালী আউশের ভরা নিয়ে চলেছে কৃষাণী নৌকার মিছিল। তীরতরুর শাখায় শাখায়, পাতায় পাতায় বেলাশেষের ফাগ লেগেছে।

পাখির কূজনে, দূরবাঁকের 'ভেসাল' জাল গুটাবার ভঙ্গিতে, কৃষাণদের ঘরে ফেরার ব্যস্ত আয়োজনে বেলাশেষের সঙ্গীতটি শ্রান্ত মিড়ে মিড়ে বেজে চলেছে।

উল্লসিত পা ফেলে ফেলে ঝাঁপের মুখে এসে দাঁড়াল আসমানী। ভিতর দিকে গিন্নী-শকুনের মত গলা বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটা চমকে উঠল তার।

আলুথালু বধূবেশের নীচে একটি বহুভুক্ত বেদেনীতনু থর থর করে কাঁপছে। ফুলে ফুলে কাঁদছে অশ্রুমতী শঙ্খিনী। পেষণে-ঘর্ষণে-পীড়নে জর্জরিত এক যাযাবরী।

তবে কী সেই নীড়প্রেম, শঙ্খিনীর কামনা-বাসনার সেই অঙ্কুরটি একেবারেই দলিত হয় নি! এখনও কী তাতে প্রাণের স্পন্দন ধুকধুক করে বাজছে। কে জানে? একটা শিলামূর্তির মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আসমানী।

তের

রয়নাবিবির খালে আর একটা রাত্রি নামল।

পাটবনের ওপারে দপ্ দপ্ আলেয়া জ্বলে। ধানপাতার ফাঁকে ফাঁকে সবুজ জোনাকি। অযুত, অর্বুদ মিটমিট আলো। দূরে, কোন ছায়াতরুর বন থেকে শিয়ালের চিৎকার ভেসে আসছে। ভেসে আসছে সোনাব্যাঙের ঐকতান। শ্রাবণের রাত্রি নামছে। আকাশ থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরছে অন্ধকার। আকাশে অতন্দ্র নক্ষত্রের বাসর। নীচে রয়নাবিবির খালটা ফুলছে, ফুঁসছে, দুলছে।

নাগরপুর গ্রাম থেকে হু-হু বাতাসে সওয়ার হয়ে আসছে মাকুর শব্দ,

পাইতনার আওয়াজ, আসছে ঝাঁক ঝাঁক হাতুড়ির কঠিন ধ্বনিতরঙ্গ। সুখী আর সহজ রোজনামচা। একটি শ্রীময় জনপদের মিলিত জীবন-বন্দনার আভাস ভেসে ভেসে আসছে।

বেবাজিয়া বহরেও রাত্রি নামল।

পাঁচখানা নৌকায় ডাবা হ্যারিকেন জ্বালানো হয়েছে।

মাঝখানের নৌকাখানার নাম 'পান্‌হা ঘর'। এই 'পান্‌হা ঘরে' বিষহরির মূল পীঠস্থান। এই ঘরের মধ্যে কোন অশুচিতা করে না বেদেরা। মনের সমস্ত কলুষ, সমস্ত কুশ্রী ভীষণতা চৌকাঠের ওপাশে নির্বাসিত করে এ ঘরে আসে তারা। এ ঘরে ঢোকার আগে মনকে একাগ্র করে নেয় বেবাজিয়ারা। চেতনাকে শুচিস্নান করায়।

বেদেদের বিশ্বাস, এই ঘরের মধ্যে কোন গুণাহ্ করলে দেবী বিষহরির রোষের আগুনে এই জলবাঙলার সব বেদে-সংসার ছারখার হয়ে যাবে। এখানে চটুল হাসির, মাদক অশ্লীলতার জন্য কোন ক্ষমা নেই, করুণা নেই। এই ঘরের সকল অপরাধকে মৃত্যু দিয়ে শোষণ করতে হয়।

সামনে শ্বেতপাথরের ফলকের ওপর বিষহরির মূর্তি। সপ্তনাগের চূড়াচক্রে তাঁর সিংহাসন। মাটি দিয়ে মূর্তিটিকে নিজেরাই রচনা করে নিয়েছে বেবাজিয়ারা। দেবীর মাথার ওপর বরুণ ছত্র ধরেছে কালীয় নাগ। গজমতী হয়েছে উদয় নাগ। মণিবন্ধে বলয় হয়েছে খৈজাতি। দেবীর সুডৌল বক্ষকুম্ভ কাঁচুলি হয়ে ঢেকেছে চক্রচূড় আর শঙ্খনাথ। তক্ষক আর লাউডগা, খরিশ আর কালাচিতি বুনে বুনে ঘাগরা রচনা করেছে বেদেরা। কটিতট থেকে সেই ঘাগরা দুলিয়ে দিয়েছেন দেবী। আঙুলে আঙুলে অঙ্গুরী হয়েছে সুতোশঙ্খ। পায়ে জড়িয়ে জড়িয়ে মল হয়েছে দাঁড়াশ। কর্ণভূষণ হয়ে দোদুল-দুল দুলছে সাদাচিতির ফণা। চোখে তাঁর বিষের কাজল। নীল গরল ঝরছে নিঃশ্বাসে।

সামনের ধূপাধার থেকে ধোঁয়া উঠছে। সে ধোঁয়ার ওপারে দেবীমূর্তি কী ভীষণা! কী অহিভূষণা! কী ভয়ঙ্করী!

এ ঘরেই সারারাত কাটায় আসমানী। আর ঝাঁপের ওপাশে একটা অনুগত জানোয়ারের মত বিশাল শরীরটা এলিয়ে পড়ে থাকে জুলফিকার।

প্রত্যেক সন্ধ্যায় বিষহরির নামে 'ছদ্‌গা' (উৎসর্গ) হয় এখানে। আজও সেই 'ছদ্‌গা' শুরু হয়েছে।

নাগমতী বেদেনীরা পরিষ্কার ঘাগরা আর আঙিয়া পরে এসেছে। দেবীমূর্তির চারপাশে নিবিড় হয়ে বসেছে।

দু'টি স্নিগ্ধ প্রদীপ জ্বলছে। ধূপাধারে গন্ধধূপ পুড়ছে। সৌরভে ভরে গিয়েছে দেবীস্থান।

দেবীদৃষ্টির সমুখে দু'টি কলাপাতা। সেই পাতায় দু'টি নতুন মাটির মালসা। দুটোই পরিপূর্ণ। একটি থেকে দেশী মদের উত্তেজক গন্ধ উঠছে। আর একটিতে বিন্নিধানের খৈ, কাঁচা দুধ আর সবরী কলা। ধূপের গন্ধ, মদের গন্ধ, দুধের গন্ধ—সব মিলিয়ে একটা মিশ্রিত গন্ধ স্থির হয়ে রয়েছে 'পান্‌হা

ঘরে'র মধ্যে। নিষ্করুণ শুচিতায় থমথম করছে দেবীপীঠ।

এক সময় সপ্তদীপে আরতি শেষ করল আসমানী। তারপরেই উঠে দাঁড়াল গোলাপী। এবার নগ্ন হয়ে ধুনচি নাচের পালা। সকল বসন ঝরিয়ে, ভূষণ খসিয়ে, দেহকে বিবসনা করে, মনকে নির্বাসনা করে বিষহরিকে বরণ করতে হয়। বেদে-বহরের এ এক প্রচলিত প্রথা।

গম্ভীর দৃষ্টিতে গোলাপীর দিকে তাকাল আসমানী, "তুই উঠতে আছিস ক্যান? শঙ্খ কই?"

রোজ এই ধুনচি নিয়ে নাচে শঙ্খিনী।

গোলাপী বলল, "শঙ্খিনী তো আসে নাই। সেই লেইগ্যাই তো হামি উঠছি। তুই কইলে, হামি অখনই শঙ্খিনীরে ডাইক্যা আনুম।"

এক মুহূর্ত কী ভাবল আসমানী। তারপর প্রবল বেগে মাথাটা ঝাঁকাল। তারও পর গাঢ় গলায় বলল, "কাম নাই। উরে আইজ ডাকতে হইব না। আইজ উর শরীলটা (শরীরটা) জবর বেজুত। আইজ তুই-ই নাচ লো গোলাপী।"

আঙিয়া, ঘাগরা, আয়নাচুড়ি, পৈছা—দেহের সকল আবরণ খুলে খুলে পাটাতনের এক কিনারে স্তূপাকার করে রাখল গোলাপী। তারপর বিশাল ধুনচিখানা দু হাতের অঞ্জলিতে তুলে নিল। তন্বী লতার মত তার শ্রীঅঙ্গ, তার সুঠাম তরঙ্গগুলি দুলতে লাগল। দেবীমূর্তির সামনে নগ্নতনু বেদেনী নিষ্কাম হয়ে নাচতে লাগল। ধুনচি থেকে গন্ধধূপের রাশি রাশি ধোঁয়া বিষহরিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

শুচিময় গলায় গাইতে শুরু কবল ডহরবিবি:

চান্দ বাজার দাপট গেল বাতাসে মিশিয়া—

বাকি সকলে সমস্বরে গাইল:

হায় বিষহরির দোয়া!
বেউলা সতী কান্দে শোন আলুথালু হইয়া—
হায় বিষহরির দোয়া!
কালনাগিনী খাইল আজি সোনার লখাইরে—
হায় বিষহরির দোয়া!
সোনার অঙ্গ ভাসাইল সাঙ্গুনীর নীরে—
হায় বিষহরির দোয়া!
তাহার দোয়ায় সূর্য ওঠে পুবের আকাশে—
হায় বিষহরির দোয়া!
পরান পাইয়া ভেলায় বইস্যা লখাই হাসে—
হায় বিষহরির দোয়া!

এক সময় গান শেষ হলো। ধুনচিখানা পাটাতনের ওপর নামিয়ে টলতে টলতে বসে পড়ল গোলাপী। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তার চোখ দু'টি রক্তপদ্ম।

মদের মালসাটা হাতে তুলে এক নিঃশেষ চুমুকে শূন্য করে ফেলল

আসমানী। একপাশে নিশ্চুপ বসে ছিল আতরজান। মদের মালসাটা দেখতে দেখতে তার ঝলসানো মুখে দু'টি চোখ মাছের আঁশের মত চক্‌চক্‌ করতে লাগল।

ঘাগরা আর আঙিয়া দিয়ে আবার যৌবন বন্দী করেছে গোলাপী।

একটু পরেই 'পান্‌হা ঘরে'র বাইরে বেরিয়ে এলো সকলে।

বাইরের গলুইতে চুপচাপ বসে ছিল রাজাসাহেব আর জুলফিকার। তাদের চারপাশে অন্ধকারের ঘেরাটোপ।

খুশি খুশি গলায় রাজাসাহেব বলল, "আম্মা দফাদার আর চৌকিদারেরা তো গেছে গিয়া। আর তো ডরের কিছু নাই। আইজ হামরা মদ আর মোরগা খামু।"

অন্য সময় হলে বীভৎস গলায় গর্জে উঠত আসমানী। কিন্তু আজ কণ্ঠটা তার প্রসন্ন শোনাল। শোনাল আশ্চর্য উদার, "খাবি তো খা না ইবলিশেরা।"

"হামরা মদ খামু।"

"হামরা মদ খামু।"

অনেকগুলি বেবাজিয়া কণ্ঠে ক্ষ্যাপা ঝড় ভেঙে পড়ল।

একটু পরেই চক্রচূড়ের ঝাঁপি থেকে, আয়নাচুড়ির ডালা থেকে, জীর্ণ বালিশের মধ্য থেকে অজস্র মদের বোতল বেরিয়ে এলো। দফাদারেরা চলে গিয়েছে। সব দুর্বিপাক অদৃশ্য হয়েছে। শুরু হলো নেশার উৎসব। মদের পার্বণ।

অজস্র দেশী মদের বোতল শূন্য হয়ে গেল। শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত চেটে চেটে গলার সীমানা পার করে দিচ্ছে বেবাজিয়ারা। পাঁচখানা নৌকায় হল্লা শুরু হয়েছে। নেশালাল চোখ নিয়ে, বন বন মাথা নিয়ে, থর থর পা নিয়ে সকলে টলছে, দুলছে। ঘাগরার গ্রন্থি খুলে হাঁটুর কাছে ঝুলে পড়েছে আতরজানের। কাঁচুলি উড়ে গিয়েছে ডহরবিবির। আঙিয়া ছিঁড়েছে গোলাপীর।

জুলফিকারকে জড়িয়ে তারস্বরে কান্না শুরু করে দিয়েছে রাজাসাহেব। তার চেয়ে আরো, আরো জোরে চেঁচিয়ে হাসছে হালের মাল্লা রজবালি। কয়েকজন বেসামাল হয়ে পাটাতনের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছে। শুধু প্রবুদ্ধ দরবেশের মত নিশ্চল বসে রয়েছে জুলফিকার। কোন দিকে একবিন্দু বিচলিত ভ্রূক্ষেপ নাই তার। একখানা অতিকায় হাত দিয়ে একবার রাজাসাহেবকে সরিয়ে দিল সে। তার পরেই নির্বিকার ভঙ্গিতে একটির পর একটি দেশী মদের বোতল গলার মধ্যে ঢেলে দিতে লাগল।

হল্লা আর চিৎকারে, অশ্লীলতম খিস্তি আর খেউড়ে মনের মধ্যেকার আদিম রিপুটিকে মুক্তি দিয়েছে বেবাজিয়ারা।

একসময় বহর থেকে ডিঙি বেয়ে পারের দিকে চলে গেল সকলে। ওপরে বনহিজলের পাতার সামিয়ানা। তার নীচে আসর পাতলো যাযাবরেরা।

আকাশে খণ্ডছিন্ন মেঘের মিছিল। সেই মেঘের ফাঁকে ফাঁকে মিটমিট

তারার বাসর।

বনহিজলের ছায়াতলে অগ্নিকুণ্ড রচনা করল বেদেরা। তারপর সেই কুণ্ডটির চারপাশে অন্তরঙ্গ হয়ে বসলো।

টলমল পায়ে পাক খেয়ে খেয়ে নাচতে শুরু করল গোলাপী, ডহরবিবি, সোহাগী, আরো অজস্র যৌবনবতী বেদেনী। সেই উদ্দাম লাস্যলীলার বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই। টলতে টলতে নাগমতী মেয়েরা পুরুষদের শরীরে এসে পড়েছে। মাদক দেহের ঘ্রাণে পুরুষের বুকের মধ্যেকার সেই আদিম রিপুটাকে উত্তেজিত করে তুলেছে তারা।

একসময় গোলাপী দুলতে দুলতে রাজাসাহেবের বুকের ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর ভক্‌ করে এক ঝলক বমি করে ফেলল। অন্য সময় হলে কী হতো তা অজানা নয়। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে রাত্রি এখন ঘন হয়ে নামছে। এখন, এই অন্ধকারে ঝকঝকে সভ্যতার রঙ মুছে গিয়েছে। এখন জীবনের অর্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এখন পৃথিবীর আস্বাদ সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিক এমনি মুহূর্তগুলিতে বেবাজিয়াদের রক্তে রক্তে আদিম অরণ্য কেঁপে ওঠে।

গোলাপীর উপহারটুকু সারা শরীরে মাখামাখি হয়ে গিয়েছে। অম্ল-দুর্গন্ধে ইন্দ্রিয়গুলি আছন্ন হয়ে আসছে। তবু দু হাতের কঠিন বেষ্টনে গোলাপীর সুঠাম দেহটিকে বুকের মধ্যে গুটিয়ে নিল রাজাসাহেব। জড়ানো জড়ানো গলায় সে বলল, "কে? শঙ্খিনী না কী?"

ছোট্ট একটা বথারি পাখির মত বুকের মধ্যে হেসে উঠল গোলাপী, "হিঃ-হিঃ-হিঃ—কী যে কইস রাজাসাহেব! নেশা বুঝি জবর জমছে! কী রে বেবাজিয়া মরদ; নেশার ঘোরে হামারেই শঙ্খ দেখস না কী?"

কোন জবাব দিল না রাজাসাহেব।

একপাশে একটা গোসাপের মত বসে বসে ঢুলছিল মিয়ামাঝি ছন্নাদ। তার তামারঙ মুখখানার ওপর দিয়ে অগ্নিকুণ্ডের আলোটা পিছলে পিছলে যাচ্ছে। ঢুলুছিল আর রাজাসাহেব ও গোলাপীর ভাবগতিক নেশা ডুবু-ডুবু চোখে দেখছিল সে।

গোলাপী এলোমেলো গলায় গান গাইছে:

কালো চোখের মদ খাইয়াছি,
হইয়াছি উন্মন।
আর মদ খাইয়াছি হামার বধূরে
পেরথম যৈবন।
ক্যামনে ভাঙ্গুম হামি সেই—
বধুয়ার মান।
চোখের পাতায় চুমা দিমু,
ঠোঁটে সাচি পান।

গাইতে গাইতেই রাজাসাহেবের মোটা মোটা ঠোঁটে একটা সশব্দ চুমু দিল

গোলাপী। একটু আগে বমি করেছিল। এবার সেই বিজাতীয় তরল লেগে গেল রাজাসাহেবের মুখে।

দেখতে দেখতে রক্তের কণিকাগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠল মিয়ামাঝি ছন্নাদের। এতক্ষণ শিকারী বাঘের মত ওৎ পেতে বসে ছিল, এবার ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। রাজাসাহেবের দু'টি বাহুর বেষ্টনী থেকে গোলাপীকে ছিনিয়ে নিজের বুকের ওপর তুলে নিল ছন্নাদ।

কোন কথা বলল না রাজাসাহেব। শুধু দু'টি ভয়ঙ্কর চোখ মেলে তাকাল সে। তার দৃষ্টিতে নিশ্চিত হত্যা ঝিলিক মারল। তার পরেই পলকপাতের মধ্যে ঘটল ঘটনাটা। পাশ থেকে একটা শূন্য মদের বোতল তুলে নিল রাজাসাহেব। তারপর সব জোর দিয়ে বোতলটাকে ছুঁড়ে মারল সে। নির্ভুল লক্ষ্য। ছন্নাদের কপাল ফুঁড়ে রক্তের ফোয়ায়া ছুটল।

ক্রুর গলায় রাজাসাহেব বলল, "হামার শঙ্খরে কাইড়া নিয়া যাইস, শয়তানের ছাও।"

আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল ছন্নাদ, "কুথায় শঙ্খ! ইবলিশের ছাও, নেশার দাপটে গোলাপীরে শঙ্খ দেখে! হায় রে বাজান, হায় রে আম্মা, হায় মা বিষহরি, সুমুন্দর পুতে হামার জান কোতল কইর‍্যা দিল।"

অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে আদিম জীবনলীলা কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। তার পরেই ঘটে গেল ঘটনাটা। দুটো দলে ঝাঁক বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়ল বেবাজিয়ারা। তাদের মধ্যে যারা প্রচণ্ড উৎসাহী, তারা কোষডিঙি বেয়ে বহর থেকে সড়কি-বল্লম নিয়ে এলো।

রয়নাবিবির খালের পারে, রক্তমাদারের ছায়াতলে একটা খণ্ডযুদ্ধ আসন্ন হলো।

মাঝখানে খানিকটা ফারাক রেখে দু'টি দল দাঁড়িয়ে পড়ল। দু পক্ষের পাঁয়তারা আর ঘন ঘন গর্জনে শ্রাবণের রাত্রি কেঁপে কেঁপে উঠল।

"আব্বা-আম্মার শাদী দেখছিস সুমুন্দির পুতেরা? ইদিকে আয়, দেখাইয়া দিই।"

"আয়, আয়, কলিজা ফাইড়্যা রক্ত খাই।"

দু'টি দলের মধ্যে নিরাপদ ব্যবধান। নেশায় পৃথিবীর সব কিছু তলিয়ে গেলেও, সড়কির আধহাত লম্বা ফলার মহিমা সম্বন্ধে বেবাজিয়াদের প্রাথমিক জ্ঞানটুকু লোপ পায় নি। সড়কির সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে দু'টি দলই সমানে চিৎকার করে চলল।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল না। খালপারের ভূখণ্ড মাথাফাটা রক্তে চিহ্নিতও হতে পারত। সড়কি কী বল্লমের অনার্য ফলাগুলো হৃৎপিণ্ড এফোঁড়-ওফোঁড় করে রক্তের তৃষ্ণাও মেটাত। কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা।

এতক্ষণ একপাশে বসে বসে দেশী মদের আকণ্ঠ সাধনা করছিল জুলফিকার। চারদিকের দুনিয়া সম্বন্ধে একেবারেই নির্বিকার, একেবারেই

নির্লিপ্ত সে। বেবাজিয়াদের হল্লায় তারও ধ্যানভঙ্গ হলো! একটা বাজপাখির মত যুযুধান দু'টি দলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল জুলফিকার। তারপর রাজাসাহেব আর ছন্নাদের ঝাঁকড়া মাথাদুটো কঠিন থাবায় মুঠি পাকিয়ে শূন্যে তুলে দু পাশে ছুঁড়ে দিল। তারও পর গর্জন করে উঠল সে। গর্—র্র্র্-র্—

চিৎকার থামল। দু দলে সন্ধি হলো। অগ্নিকুণ্ডের চার পাশে আবার নিবিড় হয়ে বসল বেবাজিয়ারা। নিরোম ভ্রূরেখার নীচে দু'টি পিঙ্গল চোখ। সেই চোখদু'টিতে ভয়ংকর দৃষ্টি ফুটিয়ে বেবাজিয়াদের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল জুলফিকার। তারপর দুলতে দুলতে মদের বোতলগুলির দিকে এগিয়ে গেল।

ইতিমধ্যে দশটা বোতল সাবাড় করেছে জুলফিকার। আশ্চর্য! তার পায়ের জোড়ে এতটুকু কাঁপন লাগে নি। মাথাটা একটুও টলছে না তার। মদের নেশায় এই বেবাজিয়া বহরে চরম সিদ্ধিলাভ হয়েছে জুলফিকারের।

একটু আগেই কদর্য খেউড় গাইছিল বেদেরা। কিন্তু এই মুহূর্তে কী এক ভোজবাজিতে তারা ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। রীতিমত মসনবী আওড়াতে শুরু করেছে সকলে।

একজন বলল, "বেফয়দা নিজেগো মধ্যে কাইজ্যা কইর‍্যা কী হইব? তার থিকা আয় ফুর্তি করি।"

"হ, হ—ঠিক কইছস।" আর একজন উৎসাহিত গলায় সায় দিল।

কিন্তু যাকে নিয়ে এই দুর্যোগ, এই খণ্ডযুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠেছিল, সেই গোলাপী এখন তার কটুগন্ধি বমির মধ্যে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেদিকে একটি পলক নজর নেই কারো।

আবার অন্তরঙ্গ হয়ে এ ওর গলায় মদের বোতল উপুড় করে দিচ্ছে। ছন্নাদ আর রাজাসাহেব হামাগুড়ি দিতে দিতে দু পাশ থেকে এসে মুখোমুখি বসেছে। এবার আর দ্বৈরথ নয়, সপ্রেম দৃষ্টিতে রাজাসাহেবের মুখের দিকে তাকাল ছন্নাদ। তারপর গলাটা জড়িয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল, "আয় রাজাসাহেব, হামরা ইট্টু কান্দি। তুই মাগী না মরদ! শরীলটা (শরীর) তুই চাম্পাফুলের লাখান (মত) মনে হয়। ডানা কাটা হুরী হইয়া গেলি না কী রাজাসাহেব! কী হইব এইবার? হায় খোদাতাল্লা! হায় বিষহরি!" আরো, আরো জোরে ফুসফুস ফাটিয়ে ফাটিয়ে কেঁদে উঠল ছন্নাদ।

রাজাসাহেবের বুকের ওপর এক ঝলক বমি করেছিল গোলাপী। সেই অম্লতরলের মধ্যে স্নান করতে লাগল ছন্নাদ।

খিল খিল হাসি. নেশালাল কটাক্ষ, টলমল মাথা, শিথিল ঘাগরা, নারীতনুর বিভ্রম এক সময় কেমন যেন স্তিমিত হয়ে এলো সব। আদিম লাস্যলীলার পান-পাত্র মাতাল চুমুকে নিঃশেষ করে দিয়েছে বেবাজিয়ারা। অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে শূন্য মদের বোতলের মত এ ওর গায়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

দূর আকাশে থরে থরে মেঘ জমেছে। গহন হচ্ছে। কুটিল হচ্ছে।

খড়্গধার একটা বিজুরীও চমকে গেল। কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে উদ্দাম নেশা দিয়ে, রিপুর তাড়না দিয়ে যে পৃথিবী বেদেরা রচনা করেছে, সেখানে প্রকৃতির এই ভ্রুকুটি নিতান্তই নিরর্থক। আকাশের সামিয়ানার নীচে, শ্রাবণ রাত্রির অন্ধ তিমিরে দুর্বার প্রাণশক্তির এই মানুষগুলি জীবনের প্রাথমিক পরিচয়ে ফিরে যেতে যেতে স্তিমিত হয়ে গিয়েছে।

বেবাজিয়ারা আবার চকিত হয়ে উঠল। কোষডিঙি বেয়ে বহর থেকে আম্মা আসমানী এসেছে। সঙ্গে করে এনেছে অনেকগুলি মুরগি। নেশালাল চোখে চোখে একটি লোভার্ত বিদ্যুৎ খেলে গেল বেদেদের, নাগমতী বেদেনীদের। সমস্বর গলায় সোরগোল করে উঠল সকলে।

"আম্মা আসছে, আম্মা আসছে।"

"মোরগা আসছে, মোরগা আসছে।"

"হামরা খামু, হামরা খামু। মোরগা খামু।"

বমির সমুদ্রে নিশ্চেতন হয়ে পড়েছিল গোলাপী। এবার সে চোখে মেলল। আর রাজাসাহেবের গলাটা জড়িয়ে ছন্নাদ আবো, আরো জোরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল। ফুসফুসটা না ফাটা পর্যন্ত এ কান্না তার থামবে না।

পা দু'টি দড়ি দিয়ে বাঁধা। এমনি একটি মুরগিকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছুঁড়ে দিল আসমানী। নিরীহ প্রাণীটা শ্রাবণের রাত্রি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে উঠল। আর খল খল শব্দ করে নিষ্ঠুর গলায় হেসে উঠল বেবাজিয়ারা। অজস্র জোড়া লোভাতুর দৃষ্টির সামনে ঝলসে ঝলসে যেতো লগল মুরগিটা।

দফাদারেরা চলে গিয়েছে। তাই এই হত্যার পার্বণ। তাদের বহর নিরাপদ হয়েছে। নির্বিপদ হয়েছে। তাই এই মৃত্যুর উৎসব।

একখণ্ড বাঁশের টুকরো দিয়ে আগুনের মধ্য থেকে ঝলসানো মুরগিটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করল আতরজান। তার ঝলসিত মুখে দু'টি কপিশ চোখের মণি ঝকমক করছে। বেবাজিয়ারা মুরগিটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল! তাদের রসনা একটি লোভনীয় স্বাদের কল্পনায় সরস হয়ে উঠেছে। সজল হয়েছে। একটু জুড়ালেই পাখনা-পালক সব ছাড়িয়ে প্রাণীটার ইহকালের সদগতি করবে, এমন একটা পবিত্র সংকল্পে উদগ্র হয়ে উঠেছে বেবাজিয়ারা।

কিন্তু তার আগেই ঘটে গেল ঘটনাটা। একটা মোটা রোমশ থাবা আতরজানের কাঁধের ওপর দিয়ে পলকপাতের মধ্যে মুরগিটাকে শূন্যে তুলে নিয়ে মিলিয়ে গেল জুলফিকার। জুলফিকারের থাবাটার পেছন পেছন কতকগুলি নির্বোধ বেবাজিয়া চোখ ধাওয়া করে গেল।

আসমানী বলল, "এই আতরজান, এই ছন্নাদ, এই মোরগাগুলি তুরা নে।" বলতে বলতে নিরীহ পাখিগুলিকে বেবাজিয়াদের দিকে ছুঁড়ে দিল সে। তারপর আসমানী তাকাল রাজাসাহেবের দিকে। বলল, "এই রাজাসাহেব, এই রাজাসাহেব, এই শয়তানের ছাও, হামার লগে বহরে আয়।"

"ক্যান ?"

"কাম আছে।"

"হামি মোরগা খামু। হামি অখন যামু না।"

"মোরগা খামু! যামু না!" বয়সজীর্ণ মুখে একটি ভয়াল ভ্রূকুটি ফুটিয়ে আসমানী হুঙ্কার ছাড়ল, "তুই যাবি না! তুর সাথ বাজান উইঠ্যা যাইব কবর থিকা।"

আসমানীর হুঙ্কারে কী এক অনিবার্য আভাস রয়েছে। একবার তার, মুখের দিকে তাকাল রাজাসাহেব। ধাতুমূর্তির মত আসমানীর সেই মুখে কোন প্রশ্রয়ই লিখিত নেই। অগ্নিকুণ্ডটার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল রাজাসাহেব। আসমানীর নির্দেশ। এই মুহূর্তে নেশা-মৌতাত-হত্যা-হল্লায় ঘেরা এই আদিম জীবনলীলা থেকে তার চলে যেতে হবে। টলমল পায়ে রয়নাবিধির খালে গিয়ে কোষাডিঙিতে উঠল রাজাসাহেব। তার পেছন পেছন এলো আসমানী।

ঘাসি নৌকার পাটাতনে তিনটি লোক বসে রয়েছে। নিথর, নিশ্চুপ। অতিকায় একটা ডাবা হারিকেন জ্বলছে মাঝখানে। আসমানী আর রাজাসাহেব ছই-এর মধ্যে ঢুকতেই তারা চকিত হয়ে উঠল।

একজন উঠে দাঁড়াল। পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি, রেশমী পিরহান, সুচ-দাড়িতে আতরের সৌরভ, রোমশ ভ্রূর নীচে একজোড়া প্রখর চোখ। মাথায় মেহেদি রঙের ফেজ। অসহিষ্ণু গলায় সে বলল, "কী বুড়ি বাইদ্যানী, বইস্যা বইস্যা কোমরে বাত ধইর‍্যা গেল, হাড্ডিতে হাড্ডিতে রস নামলো। সেই কখন গেছ খালের পারে, আসনের নামই নাই আর। কাইল মোকদ্দমার তারিখ পড়ছে। আইজ রাতের মধ্যে পেরধান (প্রধান) সাক্ষীরে দুনিয়া থিকা সরাইয়্যা না দিলে ভাইজানের নিঘ্‌ঘাৎ ফাঁসি হইয়া যাইব।"

"হে, হে-ব্যাপারী ছাহাব, আপনাগো কামেই তো গেছিলাম খালের পারে। হামার এই রাজাসাহেবই তো আপনের উই সাক্ষীরে দুনিয়া থিকা সারা জনমের লেইগ্যা সরাইব। উর হাতখান জবর সাফ। সড়কির ঘাই এট্টার বেশি দুইটা লাগব না উর। তা হইলেই জান ফৌত। সাক্ষীরে আর খাড়া হইতে হইব না। উর বাজানের নাম, নিজের নাম, দুনিয়ার নাম, বেবাক ভুল হইয়া যাইব। এই জনমের লেইগ্যা মুখে আর বোল ফুটব না। ইদিকে আপনের ভাইজান খালাস পাইয়্যা যাইব।" বলতে বলতে পাটল রঙের ধ্বংস-শেষ কয়েকটি দাঁত মেলে হাসল আসমানী। তার ঘোলাটে চোখ দুটো ধক্‌ ধক্‌ জ্বলতে লাগল, "কিন্তুক ব্যাপারী ছাহাব, হে-হে, বোঝেন তো, এই সব খুনখারাপী রাহাজানির ব্যাপারে ঝামেলা! হামরা বেবাজিয়া, চৌকিদার আর দফাদারেরা তো হামাগো বহরে আইব পেরথম। হে-হে, বোঝেন তো!"

"নিচ্চয়, নিচ্চয়।" ডোরাকাটা লুঙ্গির কোন গোপন গ্রন্থি খুলে একরাশ নোট আসমানীর হাতে গুঁজে দিল লোকটি। তারপর বীভৎস গলায় বলল, "তিন শ' ট্যাকা আছে। কাম শ্যাষ্‌ হইলে আরও দুই শ' দিমু। কিন্তুক এট্টা কথা। লাশটা ম্যাঘনার চরে গুম্‌ কইর‍্যা দিতে হইব।"

খিক্‌ খিক্‌ শব্দ করে কদর্য গলায় হাসল আসমানী. "হিক্ক-হিক্ক-হিক্ক—

ব্যাপারী ছাহাব, উরে তো আপনে চিনেন না। উর নাম হইল রাজাসাহেব। ম্যাঘনার চরে ক্যান, যদি ইনাম ঠিকমত মিলে তা হইলে উই রাজাসাহেব লাশটারে যেই আম্মার প্যাট থিকা বাইর হইছে, সেই আম্মার প্যাটেই আবার গুম্ কইর‍্যা দিতে পারব। হিুক-হিুক-হিুক—"

"তোফা, তোফা। কিন্তুক বাইদ্যানী, রাইত অনেক হইছে। আবার হামাগো ইদিলপুর যাইতে হইব।"

"নিচ্চয়, নিচ্চয়।" এবার রাজাসাহেবের দিকে তাকাল আসমানী। বলল, "এই রাজাসাহেব, ব্যাপারী ছাহাবের লগে তুর ইদিলপুর যাইতে হইব।"

নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকাল রাজাসাহেব, "ক্যান ?"

"ক্যান ?" দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ভয়াল ভ্রূকুটি ফুটিয়ে তুলল আসমানী, "উরে ইবলিশ্, উরে বখিল, এতক্ষণ বইস্যা বইস্যা তা হইলে কী শুনলি ? ব্যাপারী ছাহাবের ভাইজানে হইল খাঁটি পয়গম্বর। তারে খুনের মামলায় জড়াইছে কুন্ শয়তানের ছাওরা। সেই পয়গম্বররে বাঁচাইতে হইব হামাগো, খালাস কইর‍্যা দিতে হইব।"

"ক্যামনে ?"

"উরে বান্দীর পুত। এতক্ষণ কী কান বুইজ্যা (বুজে) বইস্যা আছিলি ? উই যে ব্যাপারী ছাহাব কইল, পেরধান (প্রধান) সাক্ষীরে দুনিয়া থিকা সরাইয়া দিতে হইব। তা হইলেই হামাগো পয়গম্বর খালাস। তুর সড়কির হাত তো জবর সাফ। এট্টা ঘাই রাজাসাহেব, খালি এট্টা ঘাই। কলিজা এফোঁড়-ওফোঁড় হইয়া যাইব। এই জনমের লেইগ্যা আর মুখ দিয়া আওয়াজ বাহির হইব না। তারপর লাশটাবে ম্যাঘনার চরে গুম্ কইর‍্যা বহরে ফির‍্যা আসবি। কেউ টের পাইব না।" উত্তেজনায় রাজাসাহেবের বুকের কাছে ঘন হয়ে বসল আসমানী। তারপর ফিস ফিস গলায় বলতে লাগল, "এই ব্যাপারী ছাহাবরা এই দুনিয়াদারির মালিক, হামাগো ভাত-কাপড় দ্যাওয়ানের মহাজন। তাগো কথা হামাগো রাখতেই হইব।"

এই জলবাঙলায়, এই পদ্মা-মেঘনা-ইলসা-কালাবদরের-দেশে, গঞ্জে-গ্রামে, বন্দরে-জনপদে যেখানেই বেবাজিয়ারা নোঙর ফেলে, সেখানেই তাদের বহরে রাত্রির অন্ধকারে অজস্র সরীসৃপ ঝাঁপিয়ে পড়ে। একমুঠো রুপালী পুলকের বিনিময়ে, কয়েকখানা কবকরে নোটের বদলে যৌবনবতী বেদেনীর সুঠাম দেহে রতি আর রিপুর কলঙ্ক মেখে দিয়ে যায়। আবার কেউ আসে বেবাজিয়া পুরুষকে দিয়ে খুনখারাপি আর রাহাজানির মতলবে। এটা একটা প্রচলিত রেওয়াজ।

হত্যা ! শিরায় শিরায় বেবাজিয়া রক্ত ঝন ঝন করে বাজলো রাজাসাহেবের ! এতক্ষণ দেহের প্রতিটি কোষে কোষে দেশী মদের নেশা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। এবার হত্যা নামে একটি মৌতাত সেই নেশায় ঝড়ের মত ভেঙে পড়ল। শরীরের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। ফুঁসে ফুঁসে উঠল ধমনীটা। চেতনায় মধ্যে এক ভয়ঙ্কর বেবাজিয়া কথা কয়ে উঠল রাজাসাহেবের। রক্তলাল

চোখে সে তাকাল আসমানীর দিকে, "কী আম্মা, অখনই যামু না কী ?"

"উঁহু। হামার লগে ইট্টু আয় 'পানুহা ঘরে'।"

একটু পরেই 'পানুহা ঘরে'র মধ্যে চলে এলো রাজাসাহেব আর আসমানী।

সামনেই সপ্তনাগের চূড়াচক্রে বিষহরির মূর্তি। ধূপাধার থেকে গন্ধধূপের শেষ ধোঁয়ার রেখা বিলীয়মান হয়ে যাচ্ছে।

আসমানী বলল, "মনে কোন গুণাহ্ নাই তো রাজাসাহেব !"

গুণাহ্ ! পাপ ! অপরাধ ! চকিত হয়ে দেবীমূর্তির দিকে তাকাল রাজাসাহেব। সে মূর্তি ভীষণা ! সে মূর্তি অহিভূষণা ! বিশাল বুকের মধ্যে দুরু দুরু কাঁপল হৃৎপিণ্ড ! গুরু গুরু দুলল রক্ত। নাগমতী মনসা মূর্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজাসাহেব। তাকিয়েই রয়েছে। চোখ দু'টি যেন তার অপক্ষ্ম। দৃষ্টি নিষ্পলক। দেহ শিলাময় হয়ে গিয়েছে। চেতনা নিথর হয়েছে।

সন্ধানী চোখে রাজাসাহেবের দিকে তাকাল আসমানী, "কী রে রাজাসাহেব, হামরা বেবাজিয়া ; কুনো গুণাহ্ আছে না কী মনে ! কুনো বেতরিবত মতলব আছে পরানে ! তা হইলে কিন্তুক সারা দুনিয়ার বেবাজিয়ারা শ্যাষ হইয়্যা যাইব। হামাগো বহর উইড়্যা-পুইড়্যা যাইব। এই 'পানুহা ঘরে' খাড়াইয়্যা মিছা কথা ক'বি না। তা হইলে খুন করতে গিয়া তুই-ই খুন হইয়্যা যাবি।"

পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে আসমানী। কিন্তু রাজাসাহেবের মনে হলো, অনেক, অনেক দূর থেকে অশরীরী কথাগুলি বাতাসের সওয়ার হয়ে ভেসে আসছে। চেতনাটা ছম্ ছম্ করে উঠল রাজাসাহেবের। পাথর-পেশী বেবাজিয়া কী ভয় পেয়েছে ! শিরায় শিরায় কী আতঙ্কের মাতন লেগেছে ! চকিত হয়ে দেবীমূর্তির দিকে তাকাল রাজাসাহেব। দেবীর দৃষ্টিতে বরাভয় নেই। বিষের কাজলমাখা দু'টি চোখে এখন রোষ ফুঁসছে, কুপিত বক্ষকুম্ভ দু'টি ফুলে ফুলে উঠছে। মাথায় উপর বরুণছত্র ধরেছে যে কালীয়নাগ, কর্ণভূষণ হয়েছে সে সাদাচিতি, মণিবন্ধে বলয় হয়েছে যে খরিশ, দেবীমূর্তিকে ঘিরে যে নাগ-নাগিনীরা এতকাল নিথর হয়েছিল, এই মুহূর্তে রাজাসাহেবের মনে হলো তারা যেন ভয়ানক হয়ে উঠেছে। অজস্র নীলাখণ্ডের মত তাদের ক্রূর চোখগুলি দপ্ দপ্ জ্বলছে।

খুনখারাপি, রাহাজানি, কী সাপে-কাটা মানুষ দেখতে যাবার আগে বেবাজিয়ারা এই 'পানুহা ঘরে' আসে। দেবীর কৃপাকণা চাই। বরাভয় চাই। বেবাজিয়াদের বিশ্বাস, বিষহরির করুণা থাকলে যে কোন অসম্ভবকে তারা সম্ভব করতে পারবে। এই 'পানুহা ঘরে' এসে তারা সকল অশুচি ভাবনাকে নির্বাসিত করে। মনকে শুদ্ধ করে। পবিত্র করে। চেতনাকে শুচিস্নান করায়।

এখনও দেবীমূর্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজাসাহেব। দেবীর প্রতিটি অঙ্গ থেকে রাশি রাশি ক্রুদ্ধ ফণা তুলে চক্রচূড়-শঙ্খনাগ-তক্ষকেরা তার সেই

কলুষিত ভাবনাকে শাসন করছে।

সন্দিগ্ধ গলায় আসমানী বলল, "কী রে শয়তান, জবাব দিতে আছিস না যে ! মনে কুনো মোন্দ মতলব আছে তুর ? কুনো বেতরিবত ভাবনা !"

এবার খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ল রাজাসাহেব। পাথরপেশী বেবাজিয়া কেমন যে স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সে, "আম্মা, আম্মা, হামার জবর ডর করতে আছে।"

"ডর করতে আছে ! ক্যান ?" ঘোলাটে চোখের উপর ভ্রূদুটো কুঞ্চিত হলো আসমানীর।

"মনে হামার বেতরিবত ভাবন আছিল।"

"কীসের ভাবনা ?"

"ভাবছিলাম, আইজ রাইতে শঙ্খিরে লইয়্যা বহর থিকা পলাইয়্যা যামু।"

"কী সর্বনাশ !" 'পান্‌হা ঘর' ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠল আসমানী, "হায় মা বিষহরি, বেবাজিয়া মরদে কেমুন গুণাহ্‌র কথা কয়, শোন মা। শোন রাজাসাহেব, তুই হামারে ফাঁকি দিতে পারস, এই দুনিয়াদারির বেবাক মাইনষেরে ফাঁকি দিতে পারস, কিন্তুক বিষহরিরে পারবি না। তার কাছে কারো রেহাই নাই। গুণাহ্ কইর‍্যা পার পাওনের উপায় নাই। গুণাহ্ যেমুন করছিস তেমুন মাপ চাইয়্যা নে। এই জনমে আর এমুন গুণাহ্ করবি না।"

ফিস্ ফিস্ গলায় রাজাসাহেব বলল, "হায় মা বিষহরি, হামি বেবাজিয়া। হামার মনে মোন্দ মতলব আসছিল। আর কুনো দিন অমুন মতলব করুম না। হামার গুণাহ্ মাপ কর মা বিষহরি। দোয়া কর মা, দোয়া কর।" বলতে বলতে আটটি অঙ্গ নিবেদন করে দেবীমূর্তির সামনে লুটিয়ে পড়ল রাজাসাহেব। সারাটি দেহ ফুলে ফুলে উঠছে তার। চোখের মণি চৌচির করে হুহু ধারায় কান্নার বন্যা ঝরছে। দেবীমূর্তির সামনে একটি পাপ, একটি অশুচি ভাবনা, একটি অপরাধী মন কেঁদে কেঁদে শুদ্ধ হচ্ছে। শুভ্র হচ্ছে।

এক সময় আসমানী বলল, "এইবার বাইরে আয় রাজাসাহেব। ব্যাপারী ছাহাবরা অনেক সময় বইস্যা রইছে। রাইত হইয়া গেল দুফার। আবার ইদিলপুর যাইতে হইব তুর।"

বিষহরি মূর্তির সামনে থেকে উঠে দাঁড়াল রাজাসাহেব। তারপর টলতে টলতে 'পান্‌হা ঘরে'র বাইরে চলে এলো। তার পেছন পেছন এলো আসমানী।

আসমানী বলল, "অখন আর সেই ভাবনা নাই তো !"

রাজাসাহেবের রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে একটি শব্দ বেরিয়ে এলো, "না।"

চৌদ্দ

বেবাজিয়া বহর থেকে সকলেই এসেছে। অগ্নিকুণ্ডের চারপাশে নিবিড় হয়ে বসেছে বেবাজিয়া পুরুষ আর নাগমতী বেদের মেয়েরা। জীবনের এক আদিম

লাস্য-লীলায় সকলেই হাসছে। গাইছে। মাতাল পদক্ষেপে নেচে চলেছে। বেবাজিয়া পুরুষের চোখের মণি দেশী মদের প্রভাবে ছুরির ফলার মত ঝকমক করছে।

আগুনের কুণ্ডটা ঘিরে বীভৎস হল্লা উঠছে, "হো-ও-ও-ও-ও—"

বেদে বহর থেকে সবাই এসেছে। শুধু আসে নি শঙ্খিনী। বেলাশেষের আলোতে তার বধূসজ্জার উপর নীড় বাঁধবার সুন্দর সাধটিকে জবাই করে গিয়েছে দফাদার সেকেন্দর মৃধা। দেহমনের কোষে কোষে স্বামী নামে একটি প্রেমিক পুরুষের সোহাগ পীড়নের যে খুয়াবটি বিন্দু বিন্দু মৌ হয়ে জমেছিল, এখন তা নীল বিষ হয়ে গিয়েছে।

যে দিনটি থেকে বুদ্ধির কলি ফুটেছে, যে দিনটি থেকে সহজ বিচার দিয়ে মানুষের হাসি-কান্না-চাহনির অর্থ জরিপ করতে শিখেছে, ঠিক সেই দিনটি থেকেই এই দুনিয়াটাকে বড় বেদরদী মনে হয়েছে শঙ্খিনীর। সেই দিনটি থেকেই প্রচণ্ড চিৎকারে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারায় ভরা বিশাল আসমানটাকে ফাটিয়ে চৌচির করে দিতে চেয়েছে সে। সেদিন থেকেই মনে হয়েছে, এই বেবাজিয়া জীবনে কোথাও এতটুকু মায়া নেই। মমতা নেই একবিন্দুও। তার ধুকধুক প্রাণটার চারপাশে খালপারের ঐ অগ্নিকুণ্ডটার মত অহরহ দাবাগ্নি জ্বলছে। যে কোন সময় আম্মা আসমানীর খুশীর খেয়ালে কী কোন বেপরোয়া মর্জিতে তার নীড়-সন্তান-স্বামী, তার নিষিদ্ধ কামনার পালকগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটা ভীরু জলপিপির মত তাকে সেই দাবাগ্নিতে ছুঁড়ে দিতে পারে বেদেরা। তারপর উদ্দাম চিৎকারে, খল খল হাসিতে মেতে উঠতে পারে।

মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ বয়ে গেল যেন। সাঁ করে পাটাতনের উপর উঠে বসল শঙ্খিনী। তারপর হাতড়ে হাতড়ে হারিকেন বের করে জ্বেলে ফেলল। কেউ কোথাও নেই। সবাই চলে গিয়েছে খালের পারে সেই আদিম প্রাণলীলায়। এমন কী জুলফিকার আর আসমানী পর্যন্ত।

বিষহরির কী দোয়া! বর্ষার রাত্রি ঝরছে রয়নাবিবির খালের উপর। মাঝে মাঝে ধান পাতার ফাঁকে ফাঁকে নীল জোনাকি ছাড়া অন্ধকারের মধ্যে কোন ছেদ নেই, রন্ধ্র নেই। এমন সুযোগ আর জীবনে কোনদিনই আসবে না। এই ভাসমান বেবাজিয়া বহর থেকে সে ফেরারী হবে। আসমানীর মন্ত্র-তন্ত্র আর দৃষ্টির সীমানা থেকে অনেক, অনেক দূরে পলাতক হবে শঙ্খিনী।

হামাগুড়ি দিয়ে ছই-এর ঝাঁপের সামনে এসে বসল শঙ্খিনী। ঝাঁপটা খুলতে গিয়েই নির্মম সত্যটা পরিষ্কার হয়ে এলো। বাইরে থেকে তালা দিয়ে গিয়েছে আসমানী।

খালের পার থেকে বেবাজিয়াদের হাসি আর ঢোলকের শব্দ মাতাল হয়ে উঠেছে। বাঁশির সুর রক্তের কণায় কণায় তীক্ষ্ম চমকের মত ছড়িয়ে যায়।

দু হাত দিয়ে কানের উপর ঢাকনা দিল শঙ্খিনী। বেবাজিয়াদের হাসি, বাঁশি আর ঢোলকের শব্দ যেন কোটি কোটি ইবলিশের মত হা-হা করতে করতে তেড়ে আসছে। আরো, আরো জোরে কান দুটো চেপে ধরল শঙ্খিনী। এ আর

সহ্য করতে পারছে না সে। কেমন একটা নিষ্ঠুর তামাশার মত মনে হচ্ছে এই অগ্নিকুণ্ড; তার চারপাশে বেবাজিয়াদের হল্লা, হাসি, নাচ, গান। দু'টি হাত ফুঁড়ে ঢোলক-বাঁশি-চিৎকার কানের উপর তরল সীসার ধারা ঢেলে দিচ্ছে যেন।

মাথাটা টলমল করে উঠল। চারদিকে চনমন চোখে তাকালো শঙ্খিনী। সহসা, একান্তই সহসা তার দু'টি ঠোঁটে বিচিত্র হাসির রহস্য ঝিলিক দিল। চোখের মণি দু'টি দু'খণ্ড নীলার মত জ্বলতে লাগল।

আর ঠিক সেই সময় পাশের নৌকা থেকে এ নৌকার গলুইতে কে যেন লাফিয়ে পড়ল।

ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সাঁ করে ঘুরে বসল শঙ্খিনী। তার ঠোঁট থেকে হাসির ঝিলিক উধাও হয়েছে। তীক্ষ্ণ গলার শঙ্খিনী হিস্ হিস্ করে উঠল, “কে রে হারাম-জাদার ছাও, হামার নৌকায় বেতমিজ মতলব লইয়্যা উঠছিস। খুব সাবধান বখিল। হামি বেবাজিয়া মাগী, আইজ সন্ধ্যা বেলা থিকা এক্কেবারে কালসাপ হইয়া রইছি! শয়তানী করতে চাইলে এমুন ছোবল দিমু, বিষহরির কুনো ব্যাটার ক্ষ্যামতা নাই সেই বিষ উঠায়। খুব সাবধান ইবলিশ।”

“চুপ, চুপ—” নৌকার ডোরা থেকে গর্জন ভেসে এলো।

“চুপ!” এবার ফণা তুলল শঙ্খিনী, “চুপ করুম তুর ডরে! উরে হামার সাত জনমের ভাতার রে! উরে হামার কাচা পিরিতের নাগর রে। আয়, আয় নৌকার ভিতরে আয়। তুর পরানটা ফাইড়্যা দেখি কত রস জমছে। রাইত দুফারে বেবাজিয়া মাগীর নৌকায় আইস্যা ফাকুর ফুকুর কর।”

“চুপ, হামি রাজাসাহেব।”

রাজাসাহেব! আজ দুপুরের সেই প্রতিশ্রুতি তবে মিথ্যে নয়! সেই প্রতিজ্ঞাটির কথা তবে ভোলে নি রাজাসাহেব! এক অসহ্য আনন্দে সারা দেহের রক্তবাহী শিরাগুলি যেন ছিঁড়ে পড়বে শঙ্খিনীর। রাজাসাহেব এসেছে। রাত্রির অন্ধকারে রাজাসাহেব তাকে নিতে এসেছে। এই যৌবনবতী দেহ আর মনটিতে এতগুলি বছর ধরে শুধু অপমানই জমেছে। সেই অগৌরবের কাল আজ শেষ হলো। আজ বিকেল থেকে দেহের প্রতিটি কোষে কোষে, প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে শুধু গ্লানির আগুনই জ্বলছে। এই মুহূর্তে যৌবনের সকল বেদনার উপর একটি জ্বালাহর শান্তির প্রলেপ এসে পড়েছে যেন।

আকুল গলায় শঙ্খিনী বলল, “তুই আসছিস রাজাসাহেব! এতক্ষণে তুর আসনেব সময় হইল! তুই জানস, দফাদার বখিলটায় হামার শরীলে আগুন ধরাইয়্যা দিয়া গেছে?”

“জানি।”

“জানস, দুফার বেলায় যে বউ সাজছিলাম, সেই বউটার ইজ্জত নিছে উই দফাদার?” বলতে বলতে ডুকরে কেঁদে উঠল শঙ্খিনী। সে কান্নায় সমস্ত দেহটা যেন ভেঙে পড়ছে তার।

রাজাসাহেব বলল। আশ্চর্য শান্ত, আশ্চর্য হিমাক্ত শোনালো তার কণ্ঠ, "বেবাজিয়া মাগীর আবার ইজ্জত! কী যে কইস শঙ্খ! উই যে কয় না, বিরিন্ধ (বৃদ্ধ) বেবুশ্যে তুলসীর মালা গলায় দিয়া তপস্বী হইয়্যা বসে! তুর হইছে সেই দশা! হিঃ-হিঃ-হিঃ—" খিক খিক শব্দ করে হেসে উঠল রাজাসাহেব।

প্রথমটা বিস্ময়ের এক আচমকা প্রহারে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল শঙ্খিনী। তারপরেই নির্বোধ আর বিস্বাদ গলায় সে বলল, "কী কইতে আছিস রাজাসাহেব?"

"কী আবার কমু? তুর কথার জবাব দিতে আছি।"

কিছু সময়ের যতিপাত। একসময় শঙ্খিনী বলল, "জানস রাজাসাহেব, উই আম্মা মাগী হামারে বাইরে থিকা তালা মাইর‍্যা রাখছে। হামি যে বাইর হইতে পাবতে আছি না!"

"বাইর না হওনই ভালো। তুর গায়ে জবর ঘরের গোন্ধ। ছাড়া পাইলেই ঘর বান্ধনের পরস্তাব (গল্প) শুনতে শুনতে কানের মাথা যাইব।"

এবার করুণ প্রার্থনা ফুটলো শঙ্খিনীর কণ্ঠে, দুফার বেলায় কসম খাইয়্যা কইছিলি, হামারে রাইতে আইস্যা লইয়্যা যাবি, শাদি করবি, ঘর দিবি, পোলা (ছেলে) দিবি। সেই কথা কি ভুইল্যা গেলি রাজাসাহেব? কেমুন মন তুর?"

"ইয়া খোদা! তোবা, তোবা! বেবাজিয়া মাগীর পরানের রস দেখ, মা বিষহরি! আরে শয়তানের ছাও, বাইদ্যা পুরুষের কসমটাই খালি দেখলি! বুঝলি না তার দুফারের কসম রাইতের আন্ধারে আসমানে মিলাইয়া যায়।" একটু থামল রাজাসাহেব। তারপর আবার বলতে শুরু করলো। গলাটা এতটুকু কাঁপল না। আশ্চর্য তীক্ষ্ণ সেই কথাগুলি ছুই-এর ঝাঁপ তুরপুনের মত ফুঁড়ে ভেতরে আসছে।—"দুফারে তুর বউসাজা দেইখ্যা হামার চৌখ দুইটা ভিরমি খাইছিল। কিন্তুক বেবাজিয়া পুরুষের চৌখে ভিরমির নেশা কতক্ষণ থাকে! রসরঙ্গের কথা বাদ দিয়াও তো তার অনেক কাম আছে। শোন শঙ্খ, ঘর আমি বানতে (বাঁধতে) পারুম না। এই মাত্তর 'পান্‌হা ঘর' থিকা আইলাম। অখন যাইতে হইব ইদিলপুর। সেইখানে একজনের ঘাড়ের উপুর মাথাটা না কী জবর ভারী হইচে! সেই মাথাটা সেই ঘাড়খান থিকা নামাইয়্যা দিতে হইব। যাই, যাই এইবার শঙ্খ। অনেক রাইত হইচে। পোহাতি তারা আসমানের গায়ে থাকতে থাকতে আবার ফিরতে হইব।"

"আমারে তুই নে রাজাসাহেব—" ঝাঁপের উপর আছড়ে পড়ল শঙ্খিনী।

"না, না। অখন উই সব বেতমিজ কান্দন ছাড় শঙ্খ। 'পান্‌হা ঘর' থিকা আইলাম, ইদিলপুরে এট্টা কামে যাইতে আছি। অখন ঘর ঘর করলে বিষহরির গোসা আইস্যা পড়ব।" অত্যন্ত নিরাসক্ত, অত্যন্ত নির্মম শোনালো রাজাসাহেবের কণ্ঠ।

এবার কালনাগিনীর মত ফুঁসে উঠল শঙ্খিনী, "যা, যা জিন, তুর গায়ে জবর বেবাজিয়া গোন্ধ। হামার নাক সেই গোন্ধে জ্বইল্যা যায়। যা, যা—"

রাজাসাহেব চলে গেল।

পনেরো

রাজাসাহেব চলে গিয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে নাগমতী বেদেনীর একটি সুন্দর সাধ, ললিত একটি বাসনা পলাতক হয়েছে। ফেরারী হয়েছে।

দেহমন শূন্য হয়ে গিয়েছে শঙ্খনীর। এই সুঠাম তনুর যেন কোন আকার নেই। নিরাকার দেহটিতে সচেতন কোন মন নেই। ঘাসি নৌকার পাটাতনে শঙ্খনী নামে বৈদেহী এক সত্তা সুখ-দুঃখ, সাধ-সোহাগ-যন্ত্রণার বাইরে চলে গিয়েছে। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ে, ছয়টি রিপুতে জীবনের কোন বোধই বাজছে না।

আজ দুপুরে মধুর এক প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিল রাজাসাহেব। শঙ্খনী কী জানতো, বেবাজিয়া পুরুষের দুপুরের প্রতিশ্রুতি রাত্রির অন্ধকারে ছায়া হয়ে মিলিয়ে যায়!

সহসা, একান্তই সহসা নিজের দিকে তাকালো শঙ্খনী। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল, তার দেহের কোন আকার নেই। মনে হচ্ছিল, একেবারেই নিরবয়ব হয়ে গিয়েছে সে। কিন্তু নিজেকে দেখতে দেখতে বুঝলো. ধারণাটা কত ভুল! নিজেকে দেখতে দেখতে চোখের মণিদুটো জ্বালা করে উঠলো শঙ্খনীর। এখনও দুপুরের সেই বধূসাজ সারাটি দেহের উপর ছত্রখান হয়ে রয়েছে। সুর্মার রেখা গলে গিয়েছে। কপালে শ্বেতচন্দনের আলপনা, সারা মুখে রক্তমাদারের রেণু, কবরীর ফাঁকে ফাঁকে বনহিজলের ফুলগুলি দলিত হয়েছে। শঙ্খমণি সাপের দাঁতের মালা আর রক্তাভ কাঁচুলিটা ছিঁড়ে গিয়েছে। দফাদার সেকেন্দর মৃধা কণ্ঠাস্থির উপর থেকে কামড় দিয়ে খানিকটা মাংস ছিঁড়ে নিয়েছিল। এখন জ্বালা করছে।

রাঙা ডুরে শাড়িটা সারা শরীরে জড়িয়ে রয়েছে। শাড়ি নয়, যেন দাবাগ্নি। এক অসহ্য উত্তাপে সারাটি দেহ, সকল চৈতন্য যেন ঝলসে যাচ্ছে। একটানে কাপড়টা খুলে পাটাতনের উপর ছুঁড়ে দিল শঙ্খনী। অনাবৃত অঙ্গশ্রী। এক মুহূর্ত ঘোর ঘোর চোখ মেলে নিজের দিকে তাকিয়ে রইল নাগমতী বেদেনী।

খালের পারে অগ্নিকুণ্ডের চার কিনার থেকে বাঁশি আর ঢোলকের মাত্‌লা সুর ভেসে আসছে। সেই সঙ্গে বেবাজিয়া পুরুষের স্খলিত গলার দু'এক কলি গান:

উরে ও বাইদ্যা মাগী,
তুর ঠমক ভারি, ঠসক ভারি,
তুর চইক্ষে (চোখে) জ্বইল্যা মরি,
তুর বইক্ষে (বক্ষে) ডুইব্যা মরি,
ডুইব্যা মরি লো-ও-ও-ও—

উরে ও বাইদ্যা মাগী,
তর যৈবন জ্বালা ভারি,

তুর সোহাগে ল্যাঠা ভারি,
তুর বইক্ষে (বক্ষে) ডুইব্যা মরি,
ডুইব্যা মরি লো-ও-ও-ও-ও—

গানটা উদ্দাম হচ্ছে। সেই সঙ্গে ধমনীর উপর রক্তকণার তাড়না অসহ্য হয়ে উঠছে। এই বেবাজিয়া জীবন দুর্বিষহ লাগছে শঙ্খিনীর। এখান থেকে মুক্তি চাই। নিশ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে। ফুসফুস ভরাট করে রাশি রাশি বাতাস চাই।

একটু আগে ঘোর ঘোর দৃষ্টিতে নিজের দেহটির দিকে তাকিয়ে ছিল শঙ্খিনী। আবার তাকালো সে। এই সুন্দর দীঘল দেহ, এই তুঙ্গ বুক, সুঠাম উরু, সুডৌল গলা—সব যেন অশুচি হয়ে গিয়েছে। এই দেহে, সেই দেহ একটি মন—সব, সব কিছু দুঃসহ মনে হচ্ছে।

জীবনে বহু পুরুষের লালসায় নিজের দেহ সঁপে দিয়েছে শঙ্খিনী। গঞ্জে-বন্দরে, এই জলবাঙলার জনপদে যেখানেই তাদের বেদে বহর ভিড়েছে, সেখানেই মাত্র কয়েকটি টাকার বদলে তার নারীদেহের মাংস দিয়ে অজস্র পুরুষ-কামনাকে শান্ত করতে হয়েছে শঙ্খিনীর। এই আঠারো বছর বয়সে জীবনের আঘাটায় আঘাটায় অসংখ্য বাসরের অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। মাংসাশী পুরুষের রতি আর রিপুর সঙ্গে বহুদিনের অন্তরঙ্গ পরিচয় শঙ্খিনীর। কিন্তু আজকের বধূসাজের শঙ্খিনী, তার নীড়প্রেম, তার সুখ-সাধের, তার কামনা-বাসনার মধ্যে নতুন জন্মের স্বাদ পেয়েছিল। তার স্বপ্নের মধ্যে কল্যাণী বধূ হযে ফুটতে চেয়েছিল। যাযাবর জীবন থেকে অনেক, অনেক দূরে একটি প্রেমিক পুরুষকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিল। তাই নিজের বেবাজিয়া জীবনকে অস্বীকার করতে পেরেছিল শঙ্খিনী। ভুলতে পেরেছিল, তার সুন্দর বরতনুটিকে বহুবার পুরুষের ভোগে তুলে দিতে হয়েছে। ভুলতে পেরেছিল, তার দেহে বহু পুরুষের লালসার ছাপ রয়েছে। নিজের দেহটিকে বধূসাজে সাজাতে সাজাতে শঙ্খিনীর মনে হয়েছিল, এই দেহ কী নিষ্পাপ! এই শরীরে কোনদিনই পাপের তাপ লাগে নি। এই দেহ কুমারী মেয়ের দেহ। এই দেহের ঘ্রাণ, স্পর্শ, এই দেহের নিষ্কলঙ্ক কামনা-বাসনা স্বামী নামে জীবনের একটি-মাত্র বাঞ্ছিত পুরুষকেই দেওয়া যায়। এই দেহ একটিমাত্র পুরুষের সোহাগ-স্বপ্নে লালায়িত হয়ে রয়েছে। আর সেই পুরুষটিকে মুগ্ধ করার জন্যই নিজেকে সাজিয়েছিল শঙ্খিনী। কিন্তু তার নতুন জন্মের এই কুমারী দেহকে অপবিত্র করে গিয়েছে দফাদার সেকেন্দার মৃধা। কামার্ত ইবলিশের ধর্ষণে তার মন অশুচি হয়ে গিয়েছে। তবু একটি সান্ত্বনার রোশনাই জ্বলছিল চোখের সামনে। দিক্ রাত্তিরে রাজাসাহেব আসবে। পিরিতে-আদরে তার সব জ্বালা, সব তাপ, সব যন্ত্রণা জুড়িয়ে দেবে। তাকে মধুর করবে। এই বেবাজিয়া বহর থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু কিছুই হলো না। একটু আগে রাজাসাহেব এসেছিল এই নৌকায়। পরিষ্কার বলে গিয়েছে, বিষহরিকে অমান্য করে, বেবাজিয়া জীবনের সকল সংস্কারকে অগ্রাহ্য করে

শঙ্খিনীকে নিয়ে কিছুতেই সে পলাতক হতে পারবে না। হিংস্র এক আক্রোশে শরীরের পেশীগুলো ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগলো শঙ্খিনীর। দফাদারটা একটা বখিল আর রাজাসাহেবটা একটা ছলনা, একটা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি। শঙ্খিনীর মনে হলো, এই দুনিয়ার কোন পুরুষকেই বিশ্বাস করা যায় না। কোন পুরুষের ওপরই নির্ভর করা চলে না। কোন পুরুষ তার যৌবনের উপর দস্যুতা করে, কোন পুরুষ তার একান্ত বিশ্বাসকে ঠকিয়ে যায়।

সমস্ত শরীরটা চটচট করছে। আচমকা শঙ্খিনীর মনে পড়ল, দফাদারটার দু হাতে দগদগে ঘা ছিল। সেগুলি থেকে রক্তপুঁজের উপহার রেখে গিয়েছে শয়তানটা। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরিণী বেদেনীর তুঙ্গ বুক, সুঠাম ঊরু, সুডৌল নিতম্ব কুঁকড়ে আসতে লাগল। মনে হলো, রক্তের কণায় কণায় দফাদারটা যে রাশি রাশি জীবাণু আর অশুচি ছড়িয়ে গিয়েছিল, সেগুলি কিলবিল করতে শুরু করেছে। অনেকদিন আগে একবার সাদা চিতিসাপের ছোবল খেয়েছিল শঙ্খিনী। তিন দিন ধরে শিরায় শিরায় বিচিত্র এক যন্ত্রণার চমক সমানে খেলে খেলে যাচ্ছিল। এই মুহূর্তে সাদা চিতির বিষের চেয়েও সাংঘাতিক মারণ বিষে বেদেনীর দেহমন, ইহকাল-পরকাল একেবারেই জর্জরিত হয়ে গিয়েছে। এই শরীর আর বইতে ইচ্ছা করছে না। সকল চৈতন্য যেন বিকল হয়ে গিয়েছে। এই জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। নিরুপায় চোখে চারিদিকে একবার তাকালো শঙ্খিনী।

সামনেই সপ্তনাগের চূড়াচক্রে বিষহরির মূর্তি। তার ওপাশে থরে থরে সাজানো সাপের ঝাঁপি। এপাশে একটা রাঙামাটির হাঁড়ি। সহসা রাঙামাটির হাঁড়িতে ঠক্ করে একটা ফণার শব্দ হলো। আর সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্খিনীর সারা মুখে হিংস্র হাসি ফুটে বেরুল। সাঁ করে ঘুরে বসলো নাগমতী বেদের মেয়ে। তারপর একটু একটু করে রাঙামাটির হাঁড়িটার সামনে এগিয়ে গেল সে। তারও পর হাঁটু গেড়ে বসে হাঁড়ির মুখ থেকে সরাটা খুলে ফেলল। ফোঁস করে লেজের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ালো একটা খৈজাতি সাপ। চকচকে পিচ্ছিল কালো দেহের ওপর অসংখ্য সাদা সাদা বিন্দু। সাপ নয়, বিষহরির মেয়ে। বেবাজিয়াদের বিশ্বাস, জন্ম দেবার সঙ্গে সঙ্গে খৈজাতি সাপের সারা দেহে দেবী বিষহরি খৈ বৃষ্টি করেন। লেজের ওপর ভর দিয়ে খৈজাতি সাপটা দুলছে, আর চোখের কালো মণিদুটো জ্বলছে, ফণাটা ফুঁসছে আর লিকলিকে জিভটা ঘন ঘন বেরিয়ে আসছে। দিনকয়েক আগে মেঘনার ওপারে ইনামগঞ্জের এক বিল থেকে সাপটাকে ধরেছিল আতরজান। একেবারে আনকোরা ধরা হয়েছে। বিষদাঁতও কামানো হয় নি। সাপটার পিচ্ছিল কালো শরীরে কী নিষ্ঠুর ক্রূরতা, কী ভীষণ হিংস্রতাই না জ্বলছে।

পলকপাতের মধ্যে ফণাটা মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো শঙ্খিনী। লেজ দিয়ে খৈজাতি সাপটা তার গলাটাকে বেষ্টন করলো। গজমোতি হার পরেছে যেন শঙ্খিনী।

বিষকন্যা সে। আজ সারাটি দেহমন বিচিত্র এক বিষের জ্বালায় দুর্বহ হয়ে

উঠেছে শঙ্খিনীর। চারপাশের এই দুনিয়া, এই বেবাজিয়া বহর, এই শ্রাবণের রাত্রি—সব, সব কিছু অসহ্য লাগছে। সাপের বিষ নামাবার অনেক মন্ত্রই জানে শঙ্খিনী। কিন্তু যে বিষের দহনে সে জ্বলছে সে বিষের জ্বালা থেকে আসান পাওয়ার কোন প্রক্রিয়াই জানা নেই নাগকন্যার।

সাপের ফণাটাকে হাতের মুঠিতে চেপে শঙ্খিনী ভাবলো, কী আশ্চর্য যোগাযোগ! বিষহরির কী দোয়া! বিষদাঁত-না-কামানো খৈজাতি সাপটা তার নৌকাতেই ছিল। এর একটি চুম্বনে এই দুর্বিষহ বেবাজিয়া জীবন থেকে চিরদিনের জন্য তার মুক্তি হবে। আর কোনদিনই কোন জ্বালায় তাকে জ্বলতে হবে না। আর কোনদিন দফাদারেরা তার বধূসাজকে অপমানিত করতে পারবে না। কামার্ত পুরুষের কোন লালসাই তার যৌবনকে কলুষিত করবে না। আর কোনদিনই রাজাসাহেবরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ছলনা করতে পারবে না। শঙ্খিনী ভাবলো, এই ভালো।

হাতের মুঠিতে সাপের ফণাটা ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করেছে। কেন যেন শঙ্খিনীর ঘনপদ্ম চোখ দু'টি জলে ভরে গেল। সস্নেহ গলায় শঙ্খিনী বলল, "খাড়, খাড়। সবুর দেখি আর সয় না লো সই। হামার গায়ে বিষ ঢালনের মতলব! সে তো ঢালবিই। তুর চুমা তো হামি খামুই। ইট্টু সবুর। ইট্টু সবুর কর। তুই হামার সই। হামার মিঠা সই। তুর লগে সারা জনমের সই পাতাইলাম। বেবাক জ্বালা থিকা তুই হামারে বাঁচাবি। হামারে শান্তি দিবি।" বলতে বলতে হাতের মুঠিটা শিথিল করে দিল সে। তার পরেই চোখ দু'টি বুজে ফেলল। জয় মা বিষহরি।

সাঁ করে একটা শব্দ হলো। সাপের ফণাটা শঙ্খিনীর বুকের উপর আছড়ে পড়ল। একবার, দু'বার, তিনবার। তারপর গলা থেকে লেজের বাঁধন খুলে শঙ্খিনীর দেহ বেয়ে বেয়ে পাটাতনে নেমে গেল খৈজাতি সাপটা।

অনেক, অনেকটা সময় ধরে চোখ বুজে বসে রইল শঙ্খিনী। একেবারেই নিশ্চুপ। একেবারেই নিঃশব্দ। কিন্তু কই, বিষের জ্বালা তো রক্তবাহী শিরায় শিরায় এখনও ঢল হয়ে নামছে না। খৈজাতি সাপের বিষের মহিমা জানে শঙ্খিনী। নিমেষের মধ্যে সে বিষে দেহ নীল হয়ে যায়; সকল চৈতন্য অসাড় হয়। তবে কী তার বুকে বিষের যে সমুদ্র উথল-পাথল হচ্ছে, সে বিষে খৈজাতি সাপের বিষ একেবারেই কোন ক্রিয়া করতে পারে নি!

ডুম-ডুম-ডুম—ঢোলকের শব্দ! পুঁ-উ-উ-উ—বাঁশির সুর। খালের পারে অগ্নিকুণ্ডের চার কিনার থেকে হল্লার আওয়াজ আসছে। বেবাজিয়াদের আদিম জীবনলীলা পুরোদমে চলছে। চকিত হলো শঙ্খিনী। দেখলো, খৈজাতি সাপটা তার পায়ের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। দু'টি হাত বাড়িয়ে সাপটাকে বুকের কাছে তুলে আনলো শঙ্খিনী। তারপর ঠোঁট দুটো ফাঁক করে জিভের নীচে হাত দিল। আর হাত দিয়েই চমকে উঠলো। এই দুনিয়া তার সঙ্গে আর একবার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার অজান্তে কে যেন সাপটার বিষদাঁত কামিয়ে দিয়েছে।

নিষ্পলক চোখে কিছু সময় সাপটার দিকে তাকিয়ে রইল শঙ্খিনী। আশ্চর্য! এখন আর সাপটা ফণা তুলে ফুঁসলো না। কী এক নিশ্চিন্ততায় শঙ্খিনীর বুকের মধ্যে নিশ্চুপ পড়ে রইল।

এবার খৈজাতি সাপটাকে সশব্দে একটা চুমু খেয়ে খিল খিল শব্দ করে হেসে উঠলো শঙ্খিনী, "ডর হইছে! ডরের কিছুই নাই লো বিষহরির মাইয়্যা। কেমুন সাপ তুই? ইট্টু বিষ নাই! হামি বিষবাইদ্যানী; বিষ লইয়্যা হামার কারবার। তুরে লইয়্যা হামি কী করুম! তুরে দিয়া হামার কি হইব?" সাপটার কালো পিচ্ছিল দেহে হাত বুলাতে বুলাতে শঙ্খিনী আবারও বলল, "ও বুঝছি। বিষবাইদ্যানীর বুকে ছোবল দিলে তুর বিষে কাম হয় না। ঠিক, ঠিক কথা।"

ঝকমকে একজোড়া চোখ দিয়ে শঙ্খিনীকে দেখতে দেখতে খৈজাতি সাপটার বোধ হয় মনে হলো, এই বেবাজিয়া মেয়ের স্পর্শে, সোহাগে, হাসিতে কোন আশঙ্কাই নেই।

হেসে উঠলো শঙ্খিনী, "তুর ডর নাই। আইজ থিকা তুর লগে সই পাতাইলাম। আইজ থিকা তুই হামার মিঠা সই। বিষহরি সাক্ষী রইল।" একটু থামলো সে; তারপর ফুসফুস ভরাট করে বাতাস টানতে টানতে আর্ত গলায় বলল, "হামার দিলে জবর জ্বালা মিঠা সই। এই দুনিয়ায় কেউ হামার মনের ব্যথা বোঝে না। কেউ হামার দিলটার দাম দেয় না। মাইনষের কাছে যা চাই, তা তো মিলে না। যা না চাই, তাই আইস্যা হামার পরানটারে শ্যাষ কইর‍্যা দিয়া যায়। তুই বিষ জমা মিঠা সই, হামিও জমাই। তুর দরকার হইলে হামি তুরে ছোবল দিমু। হামার দরকার হইলে তুই দিবি। শোন মিঠা সই, তুরে উরা বাইন্ধ্যা রাখে, হামারেও রাখে। তুর আর হামার একই বরাত। তুই ছাড়া কেই হামার আপন নাই এই আসমানের নীচে এত বড় দুনিয়াটায়। এই কথাটা সারা জনম মনে রাখিস।"

সাপটাকে কোলের মধ্যে নামিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো শঙ্খিনী। রয়নাবিবির খালের পারে অগ্নিকুণ্ড জ্বলছে। বাঁশি-ঢোলক বেতালা গমকে বাজছে। তারস্বরে গান গাইছে ডহরবিবি আর আতরজান। আর সকলে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তারিফ করছে। শঙ্খিনীর মনে হলো, এই আদিম জীবনের সঙ্গীতে কোনদিনই সে সুর মেলাতে পারবে না। বেবাজিয়া জীবনের বাইচের নৌকায় সকলের সঙ্গে দাঁড় বাইবার সামর্থ্য সে হারিয়ে ফেলেছে।

পরিষ্কার নজরে আসছে। একটা মুরগি হাতে নিয়ে টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়েছে আসমানী। সঙ্গে সঙ্গে চার কিনার থেকে বেবাজিয়ারা প্রচণ্ড হল্লা করে উঠলো।

পা-বাঁধা অবস্থায় মুরগিটাকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ছুঁড়ে দিল আসমানী। একটা প্রাণফাটা আর্তনাদ ছাড়া আর কিছুই করতে পারলো না নিরীহ প্রাণীটা, 'কঁকর-ক—কঁকর-ক—কঁকর-ক'—পলকপাতের মধ্যে পালকগুলো

ঝলসে গেল।

প্রাণের মধ্যেটা কেমন যেন মোচড় খেয়ে উঠল শঙ্খিনীর। মুরগি নয়, আসমানী যেন তার হৃৎপিণ্ডটাকেই উপড়ে আগুনের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়েছে।

খানিকটা সময় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল শঙ্খিনী। তারপর সাপটার দিকে তাকিয়ে অবসন্ন গলায় বলল, "দেখলি মিঠা সই, আসমানী শয়তানী কেমুন কইর‍্যা মুরগিটারে মারলো! তুরে-হামারেও এমন কইর‍্যা মারবো। এই জনমে এমুন এট্টা পুরুষ পাইলাম না যারে লইয়্যা ঘর বান্‌তে (বাঁধতে) পারি। চল্, তুই আর হামি কুথাও গিয়া ঘর বান্ধি। যাবি?"

মিঠা সই কি বুঝল, কে জানে? শুধু নির্নিমেষ চোখে শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়ে রইল সে। মনে হলো, অনন্তকাল ধরে সে তাকিয়েই থাকবে।

ষোল

শ্রাবণের সকাল। বনমাদারের পাতায় পাতায় বর্ষার বাতাস উতলা হয়ে উঠেছে। সোনালী রোদে ঝিলমিল করছে রয়নাবিবির খাল। উতরোল পাখির ঝাঁক আকাশে চক্র দিচ্ছে।

প্রতিদিনের মতো আজও পৃথিবীর ঘুম ভাঙলো। বিশাল ঘাসি নৌকার পাটাতনে শঙ্খিনীরও ঘুম ভাঙলো। কাল রাত্রে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিল, আজ আর খেয়াল নেই।

ঘুম ভাঙবার সঙ্গে সঙ্গে সারিন্দার মিষ্টি সুর লহরে লহরে এসে মনটাকে দোলা দিয়ে গেল শঙ্খিনীর। কেন জানি খুব ভালো লাগলো নাগমতী বেদেনীর। একটা বিক্ষুব্ধ রাত্রির সীমানা পেরিয়ে এমন মধুর সুরের উৎসব তারই প্রতীক্ষায় ছিল, এ কথা কী জানতো শঙ্খিনী? ত্রস্তে পাটাতনের ওপর উঠে বসল সে। জানালা দিয়ে সকালের রোদ পাটাতনের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। সেই আলোতে নিজের নগ্ন অঙ্গশ্রীর দিকে তাকিয়ে লজ্জায় একেবারে কুঁকড়ে গেল শঙ্খিনী।

রাঙা ডুরে শাড়িটা পাটাতনের এক ধারে পড়ে ছিল। চকিতে শাড়িটাকে তুলে, সারা শরীরে পলকপাতের মধ্যে জড়িয়ে নিল শঙ্খিনী। তারপর ছই-এর ঝাঁপ খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। কাল রাত্রেই খালের পারে নাচ-গান, মদ-মাংস-হল্লার পালা সাঙ্গ করে কখন যেন আসমানী তালাটা খুলে রেখে গিয়েছিল, শঙ্খিনী টের পায় নি।

মাঝখানের নৌকার পাটাতনের ওপর বসে রয়েছে একজন বৈরাগী। তার চারপাশে ভিড় জমিয়েছে আতরজান, গোলাপী আর ডহরবিবিরা। বৈরাগীর সারা শরীরে গেরুয়া রঙের ঢোলা আলখাল্লা। সারিন্দার তারে তারে মৃদু দ্রুত আঙুল চালিয়ে টুং টাং সুরের আলাপ করে চলেছে সে। মুখে অমৃতঝরা হাসি। কপালে আর বাহুসন্ধিতে চন্দনের রসকলি আর কৃষ্ণপদচিহ্ন।

বৈরাগীটির বসন যেমন গেরুয়া রঙের, মনও তেমনি গেরুয়া। তার হাতের সুরেও গেরুয়া। হাসি থেকেও গেরুয়া নির্মলতা উছলে পড়ছে।

শঙ্খিনীর মনে হলো, এই মানুষটিই তাকে সর্ব জ্বালাহর একটি স্বস্তির আশ্বাস দিতে পারে। মনে হলো, এই মানুষটির মধ্যে ছায়া আছে, যে ছায়ায় তাপিত দেহমনকে জুড়ানো যায়, যে ছায়ায় দুঃখের দিনে জিরিয়ে নেওয়া চলে। এই মানুষটি যেন সকল বিক্ষোভ, সকল শ্রান্তি-ক্লান্তি, জীবনের সব ঝড়তুফানের পরপারে একটি শান্তির দেশে যাওয়ার পথটির সন্ধান জানে।

একসময় ডহরবিবির পাশে গিয়ে দাঁড়াল শঙ্খিনী। তাকে দেখে বেবাজিয়ানীরা হল্লা করে উঠল, “তুই আসছিস শঙ্খ! এই দেখ, তুর লেইগ্যা কারে ধইর্যা আনছি! কণ্ঠি বদল করবি না কি লো মাগী? হিঃ-হিঃ-হিঃ—” ধারালো গলায় খিল খিল করে হেসে উঠল সকলে।

কোন জবাব দিল না শঙ্খিনী। সারা মুখে রাশি রাশি রক্তের কণিকা এসে জমলো। লজ্জার ভারে চোখের পাতাদুটো বুজে এলো তার।

পাশ থেকে ডহরবিবি হাসতে হাসতে গোলাপীর গায়ের ওপর ভেঙে পড়লো, “হিঃ-হিঃ-হিঃ—দ্যাখ্, দ্যাখ্ লো তুরা, শঙ্খ কেমুন শরমবতী বউয়ের লাখান (মতো) গইল্যা পড়ছে! বাইদ্যা মাগীর শরমের ঠসক দেখলে পরান হামার জ্বইল্যা যায়। হিঃ-হিঃ-হিঃ—”

কনুই দিয়ে ডহরবিবিকে গুঁতিয়ে পাটাতনের ওপর ফেলে দিল গোলাপী। তারপর বিরক্ত গলায় গজ গজ করে উঠল, “চৌখ দিয়া দুনিয়ার বেবাক কিছুই দেখতে আছি। তুরেও দেখি, শঙ্খরেও দেখি। হাসতে হাসতে হামার গায়ে মরতে আসিস কেন লো পেত্নী?”

“হামি মনে করলাম, তুই বুঝি দ্যাখস নাই। হিঃ-হিঃ-হিঃ—” সারা শরীর দিয়ে উদ্দাম ভাবে হেসে উঠল ডহরবিবি।

“চুপ মার ঢেমনি মাগী! সাধে কি তুরে আম্মা হাসন-পেত্নী কয়!” গোলাপী গর্জালি।

হাসতে হাসতেই ডহরবিবি বলল, “উই শঙ্খ বৈরাগীর খিদমতের সেবাদাসী হইব। হিঃ-হি-হিঃ—তুরা সব দেখিস লো বাইদ্যা মাগীরা।”

এবারও নিরুত্তর বসে রইল শঙ্খিনী। ডহরবিবির হাসিতে জ্বালা আছে, তার রসিকতায় মর্ম যেন ফুঁড়ে যায়। তবু এই মুহূর্তটি বড় ভাল লাগলো শঙ্খিনীর। বড় মধুর লাগলো। বৈরাগীর গেরুয়া বসনে, হাসিতে, সারিন্দার সুরে এমন এক মোহন স্পর্শ রয়েছে যা যাযাবরীর বিক্ষত মনটাকে এক নিমেষে আবিষ্ট করে ফেলেছে।

উচ্ছল গলায় গোলাপী বলল, “গান গাইবা না বৈরাগী ঠাকুর? না খালি হামাগো মুখের দিকে তাকাইয়া থাকবা?”

ডহরবিবি আবারও হাসতে হাসতে উছলে উঠল, “হিঃ-হিঃ-হিঃ—হামি কিন্তুক তুমার বৈষ্টমীরে কইয়া দিমু; যুবতী বাইদ্যা মাইয়ার মুখের দিকে তুমার সাধের বৈরাগী ড্যাবা ড্যাবা চৌখে খালি তাকাইয়া থাকে।”

বৈরাগী হাসল। কেমন একটা বিষাদের ছায়া এসে পড়ল তার সারা মুখে. "আমার ঘরে বৈষ্টমী নাই। বকুল মইর‍্যা গেছে গত বছর। কালাজ্বর হইছিল।" হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে একটা বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বৈরাগীর, "বকুল মইর‍্যা যাওনের পর আর কণ্ঠিবদল করি নাই। আর ঘর বান্ধি নাই কারুর লগে। এই সারিন্দা বাজাইয়া চরে চরে, গেরামে গেরামে, গঞ্জে-বন্দরে ঘুরি। রাধাকৃষ্ণের নাম করি, গান গাই। এই পিরথিমীতে আমার আপন কইতে কেউ নাই। আমার থাকনের ঠিকানা নাই। আমিও তোমাগো লাখান (মতো) বেবাজিয়া।"

আর্ত গলায় শঙ্খিনী বলল, "এত বড় দুনিয়ায় কেউ নাই তুমার ?"

সহানুভূতির উত্তাপে কেমন যেন রুদ্ধ হয়ে এলো বৈরাগীর কণ্ঠটা, "না, কেউ নাই আমার।"

খিল খিল শব্দ কবে হাসতে হাসতে ডহরবিবিরা এ ওর গায়ের ওপর ঢলে পড়তে লাগলো। তীক্ষ্ণ গলায় আতরজান বলল, "তবে তো জবর দাগা লাগছে বৈরাগী ঠাকুরের। কিন্তুক ভাবনের কিছুই নাই। দুঃখুর কিছু নাই। হামারা শঙ্খর লগে কণ্ঠি বদলের ব্যবস্থা কইর‍্যা দিমু।"

দু'টি চোখের স্থির দৃষ্টি তুলে ধরল বৈরাগী। কী এক দুঃসহ বেদনায় সে দৃষ্টি ম্লান হয়ে গিয়েছে। স্ফুরিত ঠোঁট দু'টি থর থর করে কাঁপছে।

কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত পার হলো।

একসময় গোলাপীর গলা থেকে কৌতুক ঝরল, "কী বৈরাগী, হইল কী তুমার ? গান গাইবা, না খালি ঝিমাইতে থাকবা ? আর ফোস্ ফোস্ উয়াস (দীর্ঘশ্বাস) ফেলাইবা ?"

আতরজান বলল, "হামাগোও বৈরাগী-বৈষ্টমী হওনের সাধ হয়। কিন্তুক—" তারপরেই রসাল ছড়া কাটলো বেদেনী :

মালা জপতে হইব তিন বেলা,
আগে জানলে বৈরাগী হইব কোন্ শালা !

"হিঃ-হিঃ-হিঃ—" আবারও সেই খিল খিল হাসির লহর উঠল। গোলাপী, ডহরবিবি, আতরজান—সকলেই হাসছে।

একপাশে নিশ্চুপ বসে রয়েছে শঙ্খিনী। তার দিকে তাকালো বৈরাগী। শঙ্খিনী বলল, "গান গাও বৈরাগী ঠাকুর।"

বৈরাগীর শরীরে যৌবন নেই। আসন্ন প্রৌঢ়ত্বের ছাপ পড়েছে। জোয়ার আর ভাঁটার সন্ধি মুহূর্তে নদী যেমন শান্ত গাম্ভীর্যে থম্ থম্ করে, তেমনি এক অচঞ্চল মহিমায় বৈরাগীর সমস্ত দেহ ভরে গিয়েছে। কোন চপলতা নেই, মাত্রাছাড়া উচ্ছ্বাস নেই, শুধু একটি পরিমিত মাধুর্যে ঝলমল করছে সুগৌর দেহ। গেরুয়া যে দেহে ভূষণ, রসকলি যে দেহে অলঙ্কার—সে দেহ তো সাধন-ভজনের পাদপীঠ। অপলক দৃষ্টিতে বৈরাগীর দিকে তাকিয়ে রইল শঙ্খিনী। দৃষ্টি তার ভরপুর হয়ে গিয়েছে। নাগমতী বেদেনী কী জানতো, পৃথিবীতে এমন এক একটা মানুষ আছে যাদের একটি বার দেখলেই সব জ্বালা

মুছে যায়, সব দুঃখ, সব বেদনা ঘুচে যায় ! এই বৈরাগী যেন জাদু জানে। কই, কাল সারাদিনের অসহ্য যন্ত্রণার কথা তো এখন আর মনে পড়ছে না ! আশ্চর্য !

বৈরাগী গান ধরল। প্রেমরসের গান। চিরকালের অভিমানিনী রাধার সকল অভিমান আর কান্না যেন তার কণ্ঠ বেয়ে আর সারিন্দার মৃদু ঝঙ্কার হয়ে ঝরতে লাগলো :

'আগে মন না জেনে দিস না গো নয়ন—
রাধে, করিলাম মানা।
বিরজা কয়, আমি জানি,
সে যে মন চুরিরই শিরোমণি,
তারে দেখতে কালো, কথায় ভালো,
স্বভাব কিন্তু ভালো না।
আগে মন না জেনে দিস না গো নয়ন—
রাধে, করিলাম মানা।
নেবার কালে যত সন্ধি,
নিয়ে করেন কপাট বন্দী,
শেষে ফিরে চান না।
তোমায় ঘরের বাহির টেনে নিয়ে
দিবে লো যন্তরণা।
আগে মন না জেনে দিস না গো নয়ন—'

যমুনা পুলিনে একদা যে নারী একটি কপটাচারী পুরুষকে হৃদয় দান করে সারা জীবন চোখের জলের বন্যায় ভেসেছে, তারই মরম বেদনা এই গানে আকুলিত হয়ে উঠল। হোক চটুলা বেদেনী, তবু সকল নারীর মনের মধুকোষে চিরকালের সেই রাধার কান্না মউ হয়ে জমে রয়েছে। কয়েকটি মুহূর্তের জন্য গাঢ় বেদনায় আবিষ্ট হয়ে রইল বেদেনীরা।

বৈরাগীর মধুর কণ্ঠ, সারিন্দার বিধুর বাজনা সমস্ত বেবাজিয়া বহরটার ওপর অপূর্ব মায়াজাল ছড়িয়ে দিয়েছে। শ্রাবণের সোনালী রোদে, খালের ঝিলমিল ঢেউয়ে, এলোমেলো বাতাসে সে মায়াজালের রেশ কাঁপছে।

মুগ্ধ গলায় আতরজান বলল, "তুমার গলাখান তো জবর মিঠা বৈরাগী ঠাকুর। নাম কী তুমার ?"

"আমার নাম গোকুল বৈরাগী।" মিষ্টি হেসে পাটাতনের দিকে চোখদুটো নামিয়ে নিল গোকুল।

"তুমার হাসন মিঠা, গান মিঠা, নামখানও মিঠা।" উছলে উঠে রসিকতা করার চেষ্টা করলো গোলাপী।

"আমরা বৈরাগী, রাধাকৃষ্ণের নামগান করি। মিঠা হওয়া ছাড়া আমাদের যে আর অন্য কোন গতি নাই বাইদ্যা বইন (বোন) ! ঐ মিঠাটুকুই তো আমাদের পুঁজি। সেই পুঁজি ভাঙ্গাইয়্যাই আমরা দিনগুজরান করি।" শান্ত

দু'টি চোখ গোলাপীর মুখের উপর তুলে ধরল গোকুল।

অনেকক্ষণ কারো মুখে কোন কথা ফুটল না।

একসময় আবার গোকুলই বলতে শুরু করল, "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে রাম, হরে রাম। বাইদ্যা বইনেরা (বোনেরা) এইবার কিছু ভিক্ষা দাও। পাঁচ দুয়ারে ভিক্ষা নিয়াই তো আমার দিন চলে। সবই গোবিন্দের ইচ্ছা। রাধামাধব, রাধামাধব।"

"দিতে আছি।"

ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো গোলাপী, ডহরবিবি আর আতরজান। একমাত্র শঙ্খিনীই গোকুল বৈরাগীর মুখোমুখি বসে রইল।

গোকুল বলল, "তুমি তো কোন কথাই কইলা না বাইদ্যা বইন (বোন)?"

শঙ্খিনী বলল, "কী কমু হামি?"

"কিছুই তোমার কওনের নাই? হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। কিন্তুক বইন (বোন), তোমার মুখ দেইখ্যা মনে হয়, অনেক বেদনার কথা তোমার বুকে জইম্যা রইছে।" সারিন্দার তারে আঙুল চালিয়ে টুং টাং শব্দ তুলতে লাগল গোকুল। মুখে শান্ত হাসি লেগেই রয়েছে। মনে হয়, শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই গোকুলের এই হাসিটুকু সহজাত। এই হাসি বাদ দিলে গোকুল খণ্ডিত, গোকুল অসম্পূর্ণ।

আতরজানেরা বৈরাগীকে সিধা দেবার জন্য চাল আর ফলফলারির সন্ধানে গিয়েছে ছই-এর মধ্যে। চারিদিকে একবার চনমন চোখে তাকিয়ে ব্যাকুল গলায় শঙ্খিনী বলল, "তুমি ঠিকই কইছ বৈরাগী ঠাকুর। হামার বুকে অনেক বেদনা অনেক দুঃখুর বিষ জইম্যা (জমে) রইছে। তুমার সগে হামার অনেক কথা আছে। অনেক, অনেক কথা। ক্যান জানি মনে হইতে আছে, তুমি হাড়া হামারে কেউ ঠিক নিশানাটা দিতে পারবো না। তুমি হামারে ঠিক কথাটা কইয়্যা দাও। হামি এইবার কী করুম—হামি কি করুম?" আচমকা গোকুল বৈরাগীর পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল শঙ্খিনী। দেহটা তার থর থর করে কাঁপছে, "কেউ হামার কষ্টের কথাটা শুনতে চায় না। কেউ হামারে ইট্টু শান্তি দেয় না। এই বেবাজিয়া জনম হামার কাছে বিষ হইয়্যা উঠছে।"

চমকে গলুইর দিকে সরে বসল গোকুল। তারপর অপরাধী গলায় বলল, "ছি ছি, এই কী করলা বাইদ্যা বইন (বোন)! আমি বৈরাগী, সকলের চরণের দাস। আমার পায়ে পড়তে আছে! ছি ছি! কী অপরাধ হইল আমার! হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।"

ঘন ঘন কৃষ্ণনাম জপ করে অপরাধের গুরুত্ব অনেকটা কমিয়ে ফেলার চেষ্টা করল গোকুল বৈরাগী।

ইতিমধ্যে উঠে বসেছে শঙ্খিনী। আচ্ছন্ন গলায় সে বলল, "এই বেবাজিয়া হইয়া জলে জলে আর ভাসতে ভালো লাগে না বৈরাগী ঠাকুর। হামার শবীলে (শরীরে) জ্বালা, পরানে জ্বালা। কেমনে হামি শান্তি পামু বৈরাগী ঠাকুর? হামারে কইয়্যা দাও, হামারে কও তুমি। হামি যে ইট্টু শান্তি চাই।"

শঙ্খিনী কাঁদল। দু'টি ঘনপক্ষ্ম চোখের কুল ভাসিয়ে অঝোর ধারায় অশ্রুর বন্যা নামলো।

অনেক আগুনের নদী পাড়ি দিয়ে একটি স্নিগ্ধ চরের দেখা পেয়েছে শঙ্খিনী। এই গেরুয়া মানুষটির মধ্যে ছায়া আছে। আশ্বাস আছে। সেই ছায়া, সেই আশ্বাসের বড় প্রয়োজন বেদেনীর। একটু শান্তি চাই। সকল ক্লান্তিহর একটু বিশ্রামের জন্য দেহমন ব্যগ্র হয়ে উঠেছে তার।

অপরূপ শান্ত গলায় গোকুল বলল, "তুমি শান্তি চাও? তোমার বড় জ্বালা—তাই না?"

"হ, হামার জবর জ্বালা। হামি শান্তি চাই। হামি বেবাজিয়া। হামার ঘর নাই, সোয়ামী নাই, পোলাপান নাই। তুমি তো এত গঞ্জ-বন্দরে ঘুইর‍্যা ফির, এত মানুষের দুঃখুর আসান কর। কইতে পার বৈরাগী ঠাকুর, কেমুন কইর‍্যা সারা জনমের জ্বালা হামি ঘুচামু? কেমুন কইর‍্যা ঘর পামু, সোয়ামী পামু, সংসার পামু?" আকুল কান্নায় ফুলে ফুলে উঠল শঙ্খিনী।

গোকুল হাসল। সে এক আশ্চর্য করুণার হাসি। গৃহহীন এই যাযাবরী। সংসারের রীতিনীতি সম্বন্ধে একেবারেই অনভিজ্ঞ। মায়া আর মোহের ভোজবাজিতে কুহকিত এক অর্বাচীন প্রাণী। বেদেনী সেই সার সত্যের কথা জানে না। জানে না তত্ত্বাতীত, তর্কাতীত সেই জ্যোতির্ময় কালপুরুষের নির্দেশের কথা, যাঁর একটি মাত্র ইঙ্গিতে দু'দিনের স্বামীসোহাগ, সন্তান-সুখ, ঘর-সংসার এক ফুৎকারে উড়ে যায়। বেবাজিয়া মেয়ে জানে না, গোকুল বৈরাগী জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ধরে সেই অমোঘ নির্দেশে কী জ্বালায় না জ্বলছে! কী যন্ত্রণায় না খাক্ হয়ে যাচ্ছে! ঘরপোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখে। ঘরের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে অন্তরাত্মাটা চমকে চমকে উঠতে শুরু করেছে গোকুল বৈরাগীর।

নাগমতী বেদেনী তো জানে না, তারও একদিন ঘর ছিল, সন্তানের স্বপ্ন ছিল, কিন্তু বকুলের শ্মশানে সব পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তাই আজ সে যাযাবর। নীড় নেই, স্থায়ী ঠিকানা নেই। পায়ের নীচে যে পথ সরে সরে যায়, সেই পথেই স্বেচ্ছা-সুখে ঘুরে বেড়ায় গোকুল। কিন্তু কী আশ্চর্য! বকুলহীন যে ঘর তার কাছে নিরর্থক হয়েছে, শূন্য হয়েছে, সেই ঘরের মায়ায় ফিরে যেতে চাইছে যাযাবরী! কালপুরুষের এ কী বিচিত্র লীলা! নিজের ঘর যার চিরকালের জন্য ভেঙে গিয়েছে, তার কাছেই ঘর বাঁধার মন্ত্র চাইছে বেদেনী! নতুন করে ঘরবাঁধার মন্ত্র জানে না গোকুল। শুধু জানে, বকুলের শ্মশান যেটা কাঠ দিয়ে সাজানো হয়েছিল তা কবে নিভে গিয়েছে। কিন্তু পাঁজরের প্রতিটি হাড় দিয়ে বুকের ভেতর আর একটা চিতা রচনা করা হয়েছে, যার শিয়রে অনন্তকাল ধরে তিল তিল অপমৃত্যুর প্রহর গুনে যেতে হবে।

ব্যস্ত হয়ে উঠল শঙ্খিনী, "আতরজানেরা আইস্যা পড়বো। তুমি কিছু কইর‍্যা না ঠাকুর? কও, ক্যামনে হামি ঘরসোয়ামী পামু?"

নিতান্ত নিস্পৃহ গলায় গোকুল বলল, "সব মিছা, মিছা।"

"এই ঘর, এই পোলা (ছেলে), এই সোয়ামী—সব, সব মায়া বাইদ্যা বইন (বোন)। আর মায়া বইল্যাই সব কিছু মিথ্যা ।"

শঙ্খনীর চোখদুটো সহসা দপ্ করে জ্বলে উঠল, "বেবাকই যদি মিছা হইল, তবে সাচাটা (সত্যটা) কী ? ইবলিশগো কাছে ইজ্জত দেওন আর এই সারা জনম জলে জলে ভাইস্যা ভাইস্যা একদিন মইর‍্যা যাওনই কী দুনিয়ার সব থিকা বড সাচা (সত্য) ?"

গোকুল বলল, "তোমার মনে বড় দুঃখু। তাই সত্যটা ঠিক করতে পারো না। সব সত্যের বড় সত্য হইল তার নাম জপ। নাম জপলেই সব দুঃখু যায়। আনন্দ হয়।"

"কার নাম ?" জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো শঙ্খনী।

"শ্রীমধুসূদনের।" বলেই সারিন্দাটা মাথার উপর তুলে দু'টি যুক্তকর কপালে ঠেকাল গোকুল বৈরাগী। আবেগে চোখদুটো বুজে এলো তার।

গলা থেকে এবার আগুন ঠিকরে বেরুল শঙ্খনীর, "তুমার শ্রীমধুসূদনেরে কইও বৈরাগী ঠাকুর, শঙ্খ তার নাম না জপলেও সোয়ামী-ঘর-সংসার বেবাক পাইব। নিচ্চয় পাইব। নির্ঘাত পাইব। তুমি দেইখ্যা নিও।" সাঁ করে উঠে পড়ল শঙ্খনী। পাশেব নৌকার দিকে যেতে যেতে আবারও সে বলল, "এতক্ষণ হামার লগে মশকরা কইর‍্যা গেলা বৈরাগী ঠাকুর !"

বিব্রত পায়ে দাঁড়াল গোকুল, "আরে তুমি গোসা করলা না কী ? আমি অখন কী কার ! হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ। বাধামাধব।"

আর এমনি সময় ছই-এর মধ্য থেকে পাটাতনে এলো আতরজানেরা। বেতের ডালায় বাঙা চাল আর কিছু ফলফসল নিয়ে এসেছে তারা।

খিল খিল শব্দ করে হেসে উঠল ডহরবিবি। তীক্ষ্ণ গলায় আতরজান বলল, "কণ্ঠী বদলের আগেই দেখি পাত্রী ভাইগ্যা গেল।"

গোলাপী বলল, "তুমার বরাত জবর মোন্দ গো বৈরাগী ঠাকুর। অমুন সোন্দর ডানাকাটা হুরীটা হাতের মুঠায় আইস্যা বাইন মাছের লাখান (মতো) পিছলাইয়া গেল। বেবাক নসিব, বেবাক নসিব। দুঃখু কইর‍্যা আর কী করবা ? আর হামরাই বা কী করুম !"

কপালের উপর ক্রমাগত হাত চাপড়াতে চাপড়াতে আতরজান বলল, "মোন্দ নসিব, মোন্দ নসিব।"

কোন কথা বলল না গোকুল বৈরাগী। চাল আর ফলফসল নিয়ে অসহায় পা ফেলে ফেলে পাশের কোষাডিঙিতে গিয়ে নামল।

সতের

দুপুর বেলা। আকাশের ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে খালের জলে। ঢেউ-এ ঢেউ-এ সেই রোদ দুলছে, ঝিলমিল করছে। চারপাশে

সেই ধানবন, দুরবাঁকের সেই ভেসালজাল, খালের পারে স্বাস্থ্যবতী বেতের লতা, সবুজ ঘাস। সব জায়গায় বর্ষার মায়াবী ছবি।

'ভেসাল' জেলের কাছ থেকে মাছ চেয়ে এনেছে বেবাজিয়া বহরের মাল্লারা। বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে এই জলবাঙলার খালবিলের শিরাপথে মাছের ঢল নামে। বিনা আয়াসের রুপালী ফসল, দাক্ষিণ্য দেখতে বেগ পেতে হয় না। 'ভেসাল' জেলেটাও প্রচুর মাছ দিয়েছে। নলা, গরমা, চাঁদা, ভাউস আর বোয়াল।

রোদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে বঁটি নিয়ে বসেছে আতরজান আর ডহরবিবি। পিঠের উপর রাশি রাশি চুল ছড়িয়ে রয়েছে। একপাশে বসে ধারালো ছুরি দিয়ে পেঁয়াজ আর রসুন কুচিয়ে চলেছে শঙ্খনী। পেঁয়াজের উগ্র গন্ধে চোখের পাতায় জল টলমল করছে বেদেনীদের।

ঝলসানো মুখখানা তুলে আতরজান বলল, "পেঁয়াজের ঝাঁঝ দেখছিস লো শঙ্খ! জুয়ান মরদের পিরিতের থিকা তেজ বেশী।"

"হিঃ-হিঃ-হিঃ—ঠিক কইছিস আতরজান।" হাসতে হাসতে পাটাতনের উপর গড়িয়ে পড়ল ডহরবিবি! তারপর উঠতে উঠতে বলল, "কিন্তুক ক্যামুন কইর্যা বুঝলি?"

"বুঝলাম ক্যামনে? দ্যাখস না, পেঁয়াজের ঝাঁঝে চৌখ দিয়া পানি বাইর হইচে।" বলতে বলতে শঙ্খনীর দিকে তাকালো আতরজান, "তাই গা লো শঙ্খ! দুনিয়ার কোন্ মরদে হামাগো লাখান (মতো) বাইদ্যা মাগীগো চৌখ দিয়া পানি বাইর করতে পারে ক' দেখি! সেই মরদ অখনও দুনিয়ায় জন্মায় নাই।"

কোন জবাব দিল না শঙ্খনী। নিরুত্তর বসে বসে সে পেঁয়াজ-রসুন কুচিয়ে চললো।

ডহরবিবি বলল, "ছাড়ান দে উই সব কথা। তুই তো কাইল খালের পারে গেলি না শঙ্খ! আম্মা মদ আর মুরগার দাওয়াত (নিমন্ত্রণ) দিছিল। ফুর্তি কইর্যা কাইল পরাণ একেবারে খুশবু হইয়া গেছে। হিঃ-হিঃ-হিঃ—"

কাল মাঝরাত পর্যন্ত খালের পারে আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে মদ আর মাংসের অবিরাম উৎসব চলেছে। মাতলামি আর হল্লায়, নাচ-গান-বাজনায় জীবনের আদিমলীলায় ফিরে গিয়েছিল বেবাজিয়ারা। উদ্দাম রাত্রির অবসাদ ডহরবিবি আর আতরজানের সারা দেহে এখনও আঁকা রয়েছে। এন্তার মদ গিলেছিল দু'জনে। এখনও চোখ রক্তাভ, মাথার চুল এলোমেলো। কথা মাঝে মাঝে জড়িয়ে আসছে। শরীর মৃদু মৃদু টলছে।

আতরজান বলল, "শঙ্খ যাইব ক্যামনে? উর শরীলে (শরীরে) জুত থাকলে তো যাইতই।"

"ক্যামন? ক্যামন?" অশ্লীল মুখভঙ্গি করে ঘুরে বসল ডহরবিবি।

"ক্যামন আবার? শঙ্খর সোয়ামীর লেইগ্যা বুকের ভিতর কত তিয়াস! কত উয়াস! আম্মা উরে সোয়ামী ধইর্যা দিল কাইল।" আতরজানের ঝলসানো মুখখানা এই মুহূর্তে ভয়ানক হয়ে উঠল।

কপট বিস্ময় ফুটলো ডহরবিবির গলায়, "সোয়ামী, সোয়ামী আবার কোথায় ?"

"উ লো হামার শয়তানের ছাও, দেখিস নাই কাইল দফাদার ছাহাবরে ! শঙ্খিনী যে দফাদারটার লেইগ্যা সারা দুফার বউ সাজলো ! তার লগে শা-নজর (শুভদৃষ্টি) করনের লেইগ্যা দিল বলে উর ফাইট্যা যাইতে আছিল ! তার লগে সারা বিকাল বাসর জাগলো ।" বলতে বলতে একটা ছোট নলামাছ বঁটির উপর রেখে প্রচণ্ড চাপ দিল আতরজান । দু'খণ্ড হয়ে গেল প্রাণীটা । খানিকটা তাজা রক্ত ছিটকে পড়লো পাটাতনের উপর । "বাসর জাগলে কী আর শরীলে (শরীরে) জুত লাগে ! খালের পারের মাংস আর মদের রসের থিকা পুরুষ মানুষের লগে বাসর জাগনে রস অনেক বেশী । সেই রসে সোয়াদ বেশী । খুশবু বেশী । তাই না লো শঙ্খ !"

"ঠিক কইছিস । ঠিক ঠিক । তাই বুঝি খালের পারে ফুর্তি জমাইতে যাইস নাই শঙ্খ ! হিঃ-হিঃ-হিঃ—" খিল খিল শব্দ করে হাসতে হাসতে ভেঙেচুরে একাকার হয়ে পাটাতনের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল ডহরবিবি ।

আর প্রাণফাটা আর্তনাদ করে উঠলো শঙ্খিনী, "আতরজান, ডহরবিবি-- হামারে তুরা এমুন কইর‍্যা খতম করবি ! তার থিকা হামার গলায় একখান চাকু (ছুরি) বসাইয়্যা দে । একবারেই খতম হইয়্যা যাই ।"

শঙ্খিনীর আর্তনাদে চমকে উঠলো দু'জনে । ফিসফিস গলায় আতরজান বলল, "শঙ্খির দিলে জবর জ্বালা । উর লগে আর মশকরা কইর‍্যা কাম নাই ডহর ।"

খিল খিল করে হেসে উঠতেই ভুলে গেল ডহরবিবি ।

অনেকটা সময় পার হয়েছে । একসময় আতরজান বলল, "আইজ শ্যাষ রাইতেই হামরা ইখান থিকা চইল্যা যামু ।"

"আইজ শ্যাষ রাইতেই !" কপট চমকিত গলায় বলল ডহরবিবি ।

"হ লো, হ । আম্মা সেই কথাই তো কইছে । আইজ সন্ধ্যা রাইতে বড় ভুঁইয়া আসবো ।" ঝলসানো মুখখানা তুলে, চোখের কপিশ মণিদুটো বন বন পাক খাইয়ে আতরজান বলতে লাগলো, "মধ্যি রাইতে বড় ভুঁইয়া চইল্যা যাইব । আর হামাগো বেবাজিয়া বহরের 'পারা'ও উঠবো এইখান থিকা ।"

"বড় ভুঁইয়া, বড় ভুঁইয়া আসবো ক্যান ?" শ্রাবণের এই নিঃশব্দ দুপুরকে ফালা করে চেঁচিয়ে উঠলো শঙ্খিনী, "এই বহরে তার কোন্ কাম !"

ডহরবিবি হাসলো প্রেতকণ্ঠে, "হিঃ-হিঃ-হিঃ—ভুঁইয়া ছাহাবের কোন্ কাম সেই কথা হামরা জানুম ক্যামনে ? তবে আম্মা কইতে আছিল—" বলতে বলতে থেমে গেল ডহরবিবি । তার চোখের তারা দু'টি আতরজানের চোখে এসে মিলল । দু জোড়া বেদেনী চোখে ভয়ংকর রসালো এক ইঙ্গিত ফুটে বেরিয়েছে ।

আড়ষ্ট গলায় শঙ্খিনী বলল, "কী, কী কইল আম্মা ?"

একান্ত নিস্পৃহ দেখালো আতরজানকে, "কী আবার কইব ! তুর গায়ের

গোন্ধে না কী ভুঁইয়া ছাহাব মাতাল হইচে! তুর পিরীত আর মব্বতের সোয়াদ লইয়্যা এট্টু নেশা করনের মতলব আছে ভুঁইয়া ছাহাবের। তাই সন্ধ্যা রাইতে আসবো।”

“না, না, উই সব হামি আর পারুম না। কিছুতেই না।” কঁকিয়ে উঠলো শঙ্খনী।

নিতান্ত অবলীলায় আতরজান বলল, “কী পারবি আর পারবি না সেইটা তুই বুঝবি আর আম্মা বুঝবো! হামরা তার কী করুম? তুই কী কইস লো হাসনপেত্নী?”

“ঠিক—ঠিক। হিঃ-হিঃ-হিঃ—” বিচিত্র শব্দ করে হাসতে লাগলো

আচমকা বিশাল ঘাসি নৌকাটা দুলে উঠলো। পাশের নৌকা থেকে এই নৌকায় লাফিয়ে পড়েছে জুলফিকার। ভ্রূহীন চোখজোড়া এই মুহূর্তে বড় কোমল দেখাচ্ছে তার। আশ্চর্য মোলায়েম গলায় জুলফিকার ডাকলো, “আতরজান—”

খরধার একটা ভঙ্গি ফুটলো আতরজানেব চোখেমুখে, “কী বে ড্যাকরা? তুর আবাব কোন্ মতলব! যা যা শয়তান, ভাগ্—”

হাতদুটো কচলাতে কচলাতে মোটা মোটা, ফাটা ফাটা ঠোঁটের দু পাশে একটি নির্বোধ হাসি ফোটাতে ফোটাতে জুলফিকাব বলল, “তুর লগে হামার যে অনেক কথা আছে আতর—”

“কী কথা?”

“তই তো মদ আর মুরগির মাংস জবর ভালবাসস।”

“তাতে হইছে কী? এই দুফাব বেলায় পিরিত ফুটাইতে আসছিস। যা, যা, যা বখিল।” ঝলসে উঠলো আতরজান।

হাত দু'খানা সামনে কচলে চলেছে জুলফিকাব। এবার হাঁটু গেড়ে আতরজানের পাশে বসে পড়লো জুলফিকার। তারপর ফিস্ ফিস্ গলায় বলল, “বুঝলি কী না আতর, এত বেবুঝ হইস না তুই। তুরে হামি কত মহব্বত করি, তা তো তুই জানস না। তুর লেইগ্যা কাইলের রাইতের মাংস আর মদ হামি সরাইয্যা রাখছি। চল্, খাবি চল্ আতর।”

আতরজানের ঝলসানো চোখদুটো চক্ চক্ করতে লাগলো। লোভার্ত গলায় সে বলল, “ঠিক কইতে আছিস তো জুলফিকার!”

“ঠিক, ঠিক। খোদার কসম। বিষহরির কসম।”

“তবে চল।” আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়ালো আতরজান। তারপর জুলফিকারের কাঁধের ওপর পরম আবেগে একখানা হাত রেখে হেলেদুলে পাশের নৌকায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

জুলফিকারকে দেখে হাসতে ভুলে গিয়েছিল ডহরবিবি। আবার স্বভাবের হাসি হেসে উঠল সে, “হিঃ-হিঃ-হিঃ। দেখলি শঙ্খ, শয়তান দুইটার পিরিত দেখলি। একটা পোড়া মুখ, আর একটা কালাপাহাড়। বখিল দুইটার

মহব্বত দেখলে ম্যাজাজ হামার জ্বইল্যা যায়।"

কোন জবাব দিল না শঙ্খিনী। অবশ হাতের মুঠি থেকে পেঁয়াজ-কাটা ছুরিটা কখন যে ঝরে পড়েছে, সে খেয়াল নেই। নাগমতী বেদের মেয়ে ভাবছিল রাজাসাহেব তাকে ঠকিয়ে গিয়েছে। কাল দুপুরের প্রতিশ্রুতির কথা রাত্রির অন্ধকারে বেমালুম ভুলে গিয়েছে রাজাসাহেব। তার বিশ্বাস, তার উৎকণ্ঠা, তার প্রতীক্ষাকে ব্যর্থ করে, হতাশ করে চলে গিয়েছে বেবাজিয়া পুরুষ। রাজাসাহেবের অঙ্গীকারকে আর বিশ্বাস করা চলে না। সেই অঙ্গীকারের উপর আর স্বপ্ন গড়ে তোলা যায় না। শঙ্খিনী ভাবছে, আজ সন্ধ্যাবেলায়, যখন এই রয়নাবিবির খালটা অন্ধকারে তলিয়ে যাবে তখন তাদের বহরে বড় ভুঁইয়া আসবেন। সে জানে, একটু একটু করে নির্দয় পেষণে, নিষ্ঠুর পীড়নে, নিঙড়ে নিঙড়ে তার দেহের সবটুকু রস ঝরিয়ে, তরিবত করে সে রসের স্বাদ নেবেন তিনি। তারপর দেহমনের সকল ইন্দ্রিয়গুলিকে, লোলুপ রতিগুলিকে পরিতৃপ্ত করে ফিরে যাবেন।

আচমকা শঙ্খিনীর ভাবনার উপর বড় ভুঁইয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর একটি মুখ ছায়া ফেলল। সে মুখ তার বাদশাজাদার। আশ্চর্য! কাল দুপুরে রাজাসাহেবের সুন্দর অঙ্গীকারটি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহব্বতকে কেমন করে যে সে ভুলে গিয়েছিল, তার হদিস পায় না শঙ্খিনী। আরো তাজ্জবের ব্যাপার, দফাদার সেকেন্দর মৃধা তার অনিচ্ছুক দেহটা ভোগ করে গেল, রাজাসাহেব তার প্রতিশ্রুতি রাখলো না, এমনি নানা জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে জীবনের দ্বিতীয় পুরুষটিকে একবারের জন্যেও তার মনে পড়ে নি। শঙ্খিনী ভাবলো, আজ শেষ রাত্তিরে যদি তাদের বহর রয়নাবিবির খাল থেকে 'পারা' তোলে, তবে আর কোনদিনই বাদশাজাদার সঙ্গে তার দেখা হবে না। মহব্বতই তো তাকে দু'টি মিষ্টি কথার মৌ দিয়ে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল। মহব্বতের চোখেই তো নিজের বাসনা-কামনার ছায়া দেখেছিল শঙ্খিনী। তার সঙ্গে আর দেখা হবে না। ভাবতে ভাবতে বুকের ভিতরটা ছটফট করে উঠলো শঙ্খিনীর।

খানিকটা পরে পাশের নৌকা থেকে এ নৌকায় এলো আসমানী। সে বলল, "শিগ্গীর ডহর। একবার যুগীবাড়ি (তাঁতীবাড়ি) যাইতে হইব।"

এক ধারে নিশ্চুপ বসেছিল ডহরবিবি। এবার চকিত হয়ে উঠলো সে, "ক্যান আম্মা ? ব্যাপার কী ?"

"ব্যাপার আবার কী ?" দাঁত কড়মড় করে উঠলো আসমানী, "তাগো নয়া বৌ তিন দিন সমানে ভিরমি খাইতে আছে। ঝাড়ফুঁক করতে লাগবো।"

ডহরবিবি কিছু বলার আগেই সাঁ করে পাটাতনের উপর উঠে দাঁড়ালো শঙ্খিনী। এই মুহূর্তে কিছু সময়ের জন্য মুক্তি চায় সে। চায় খানিকটা নিঃসঙ্গ অবসর। কোন এক নির্জন নিরালায় জীবনের দ্বিতীয় পুরুষটির মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে। মহব্বতকে তার স্পষ্ট কামনার কথাটি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিতে হবে। পৃথিবীর কাছে বড় বেশী দাবী নেই নাগমতী বেদেনীর। অকৃপণ মাটির এতবড় দুনিয়া! যতদূর নজর ছড়ানো যায়,

ততদূর কেবল মাটি আর মাটি। এই দুনিয়ায় একবিন্দু মাটির আশ্রয় সে চায়। সে চায় সেই মাটিতে গৃহী জীবনের শিকড় মেলতে। আর চায় একটি প্রেমিক পুরুষকে একান্ত করে পেতে। সেই পুরুষটিকে ঘিরে তার কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষারা একটি সিঞ্জিনা লতার মতো ছেয়ে যাবে। রাজাসাহেব তাকে বঞ্চিত করেছে। এবার মহব্বতের দিকে প্রত্যাশার মুঠি বাড়িয়ে দেবে শঙ্খিনী। আর বেবাজিয়া জোয়ান নয়, গৃহী পৃথিবী থেকে একটি বাঞ্ছিত পুরুষকে ছিনিয়ে আনবে সে। আনবেই। একটা স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে এসে পৌঁছল শঙ্খিনী।

রাজাসাহেবের কাছে সে বহুবার তার কামনার কথাটি বলেছে। আশ্চর্য! রাজাসাহেব কেয়াবনের বাঘের মতো হিংস্র। বল্লম ফুঁড়ে অথৈ নদী থেকে মেছো কুমীর তুলে আনে। বিলান দেশে ঘড়িয়াল কোপাতে যায়। খুন-খারাপীর ইঙ্গিতে রক্তের খরধারায় গুরু গুরু বাজ চমকায় তার। অথচ এই ঘরবাঁধার ব্যাপারে রাজাসাহেব বড় ভীরু, বড় কুণ্ঠিত। অনেক, অনেক দূরে, কোন কৃষাণগ্রামে একটি নিরুদ্বেগ গৃহকোণ তাকে মাঝে মাঝে হাতছানি দেয়। মাঝে মাঝে এই বেবাজিয়া জীবনকে অস্বীকার করতে ইচ্ছা হয় রাজাসাহেবের। কিন্তু সে ইচ্ছা বড়ই ক্ষণস্থায়ী। তার কাছে আসমানীর নির্দেশ, এই বেদে বহরের আইন-কানুনগুলি অনেক বেশী সত্যি, অনেক বেশী অমোঘ। এই ভাসমান জীবনকে অগ্রাহ্য করে পালিয়ে যাবার দুঃসাহস তার নেই। অতএব, মহব্বতকে শঙ্খিনীর একান্ত প্রয়োজন।

শঙ্খিনী বললো, "হামি ঝাড়ফুক করতে যামু আম্মা। ডহর থাউক বহরে।"

কিছুটা সময়ে ধরে তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে শঙ্খিনীকে যাচাই করলো আসমানী। তবে কী দফাদার সেকেন্দর মৃধার সঙ্গে কালকের ভয়ঙ্কর দিনটিকে একেবারেই ভুলে গিয়েছে শঙ্খিনী! নিঃসন্দেহে একটি শুভ ইঙ্গিত। সস্নেহ গলায় আসমানী বলল, "গেলে তো ভালোই। কিন্তুক শরীলটা (শরীরটা) তুর ভালো না। সন্ধ্যা বেলায় আবার কাম আছে—" বলতে বলতে আচমকা থেমে গেল আসমানী।

একটি কালজাতি সাপের মত হিস্ হিস্ করে উঠলো শঙ্খিনী, "হামি, হামি যামু যুগীবাড়ি।"

"যাবি তো যাবি। জবর ভালো কথা। তুর লগে ডহরবিবিরে লইয়্যা যা।"

"না না। উই ডাইনের লগে হামি যামু না। কিছুতেই না।" প্রখর গলায় চিৎকার করে উঠলো শঙ্খিনী।

মোট কথা, শঙ্খিনীর একটি অখণ্ড অবসরের দরকার। সেই অবসরে সে আর তার বাদশাজাদা ছাড়া কেউ থাকবে সা। সেখানে বাকী দুনিয়া তাদের কাছে অনাদৃত, একেবারেই অবাঞ্ছিত। শঙ্খিনী ভাবলো, মহব্বতকে মশকরা করে বাদশাজাদা বলে ডেকেছিল সে। সেই রসরঙ্গের বাদশাজাদা যে আজ তার জীবনের বাদশাজাদা বনে যাবে, তা কি জানতো শঙ্খিনী!

একমুহূর্ত নিজের ভাবনার মধ্যে তলিয়ে রইলো আসমানী। তারপর ব'লল, "বেশ তুই যখন একলা যাইতে চাইস, তাই যাবি! কিন্তুক উই যুগীবাড়ি ছাড়া আর কুথাও যাইতে পারবি না। ঝাড়ফুক হইয়্যা গেলেই আইস্যা পড়বি। ঝাঁপি থিকা আইঠ্যালী আর শিকড় লইয়্যা যা। খবন্দার, আর কোনদিকে যাবি না।"

দুর্বিনীত ভঙ্গিতে আসমানীর দিকে তাকালো শঙ্খনী। দাঁতে দাঁত চেপে সে বলল, "আইচ্ছা।" তারপর দ্রুত পা চালিয়ে শিকড়-বাকড়ের সন্ধানে ছই-এর মধ্যে চলে গেল।

বাইরে থেকে আসমানী বলল, "ঘরের জরু সাইজ্যা গেলে চলবো না। ঘাগরা পইর‍্যা আয়। শোন শঙ্খ, উঠানের মধ্যিখানে কলাপাতার উপুর বউটারে চিত কইর‍্যা শোয়াবি ; তার শিয়র থাকবো উত্তরমুখি। হামার সন্দ হইতে আছে, নিচ্চয় অপযোনির ভয় হইচে। জয় মা বিষহরি। বেবাক তুমার দোয়া!"

শঙ্কিত ভঙ্গিতে হাত দুটো জোড় করে কপালের উপর ঠেকাল আসমানী। তার পরেই আবার তীক্ষ্ন গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, "ঝাড়-ফুকের মন্তরগুলি তুর মনে আছে তো শঙ্খ!"

ছই-এর মধ্য থেকে বিরক্ত গলায় জবাব এলো শঙ্খনীর, "আছে, বেবাক মনে আছে। বেবাজিয়া জনমের কুনো মন্তরই হামি ভুলি নাই। তুমি আর চিল্লাইও না আম্মা।"

ছইয়ের বেরিয়ে আসার পর শঙ্খনীকে ঝাড়ফুঁক সম্বন্ধে আরো খানিকটা তালিম দিল আসমানী। কোন ত্রুটি ভ্রান্তি আবার না ঘটে যায়! কোন রকমের ভুলচুক! একটু এদিক সেদিক হয়ে গেলে জিন আর অপযোনিদের সমস্ত কোপ তাদের উপরেই এসে পড়বে।

এইসব মন্ত্রতন্ত্র ঝাড়ফুঁকের কাজ আসমানীই করে থাকে। কিন্তু এই মুহূর্তে শঙ্খনীর মেজাজ বা মর্জিমাফিক না চললে সন্ধ্যা রাত্তিরে একটা দুর্যোগ ঘটে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব নয়। বড় ভুঁইয়া আসবেন তাদের বহরে। কাল একমুঠো কাঁচা টাকা বায়না দিয়েছেন। শঙ্খনীর সুঠাম দেহটির আস্বাদ নিয়ে আরো তিন কুড়ি টাকা দেবেন। দু'টি জীর্ণ থাবা রুপালী পুলকে ভরে উঠবে আসমানীর। আসমানী ভাবলো, ঝাড়ফুঁক করতে করতে মন্ত্র যদি ভুলও করে ফেলে শঙ্খনী, দুনিয়ার সব অপযোনিদের কোপও যদি এসে পড়ে তাদের বহরের উপর, তবু সন্ধ্যাবেলায় তিন কুড়ি টাকার প্রাপ্তিযোগটার দোহাই দিয়ে শঙ্খনীকে এখন যেতে দিতে হবে। দিতেই হবে।

যুগীবাড়ি থেকে একমাল্লাই নৌকা নিয়ে দু'জন লোক এসেছিল। পাটাতনের উপর তারা ঠায় বসে রয়েছে।

ইতিমধ্যে ডুরে শাড়িটা শরীর থেকে খসিয়ে লাল কাঁচুলি আর ইরানী ঘাগরা পরেছে শঙ্খনী। তার দিকে তাকিয়ে বুকের মধ্যটা যেন কেমন করে উঠলো আসমানীর।

একটু পরেই শিকড়, মন্ত্রপড়া জল, ইঁদুর-মাটি, আইঠ্যালী, আমআদা বেতের ঝাঁপিতে ভরে যুগীদের নৌকায় গিয়ে উঠলো শঙ্খিনী। গলুইর উপর দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ঝাড়ফুঁক সম্বন্ধে আবার সতর্ক করে দিল আসমানী।

রাত্রিবেলা ইদিলপুর থেকে খুনখারাপি সেরে, লাশটাকে মেঘনার নির্জন চরে জলঘাসের বনে গুম করে যখন রাজাসাহেব বহরে ফিরছিল, তখন আকাশে পোহাতি তারাটা মিটমিট করে জ্বলছিল। সেই থেকে একটা বুনো মোষের মত ঘুমিয়ে চলেছে সে। নাকটা ভোঁস ভোঁস করে সমানে বাজছে।

মাঝখানের নৌকাটায় এসে দাঁড়াল আসমানী। তারপর গলা চড়িয়ে ডাকলো, “রাজসাহেব, এই রাজাসাহেব—”

বারকয়েক ডাকাডাকির পর ধড়মড় করে পাটাতনের উপর উঠে বসলো রাজাসাহেব। চোখদুটো লাল টকটকে। কাল রাত্রির খুনখারাপির খানিকটা রঙ এসে লেগেছে সে চোখে। মাথার চুল ছত্রাকার। ডোরাকাটা লুঙ্গির গ্রন্থি খুলে গিয়েছে। একটা হিংস্র শ্বাপদের মত দেখাচ্ছে রাজাসাহেবকে। এই মুহূর্তে সে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। বুকের মধ্যে জীর্ণ হৃৎপিণ্ডটা দুরু দুরু কেঁপে উঠলো আসমানীর।

কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আসমানীকে দেখল রাজাসাহেব। তারপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, ‘কী, কী মতলব তুর ?”

বিধ্বস্ত কয়েকটি দাঁত মেলে হাসির ভঙ্গি করলো আসমানী। পাটের ফেঁসোর মত চুলগুলির মধ্য দিয়ে আঙুল চালাতে চালাতে সে বলল, “হি-হি —তুরা তো বোঝস না, তুগো কত ভালবাসি হামি। সব সময় তুগো শরীল (শরীর) আর ম্যাজাজের খোজ নিতে থাকি।”

রাজাসাহেব গর্জালো, “হামার কাচা ঘুমটার দফা শ্যাষ কইর‍্যা শরীল আর ম্যাজাজের খোজ নিতে আসছস ? খোদার কসম খাইয়া ক' দেখি।”

নিভন্ত গলায় আসমানী বলল, “খোদার কসম আবার খামু কী ?”

“তবে কোন্ মতলবে আসছস ?”

“হিঃ-হিঃ কইতে আসছিলাম খুনখারাপি করার পর আর কিছু ট্যাকা দিছে ব্যাপারীরা ? কী রে রাজাসাহেব ?”

কোমরের গেঁজে থেকে একরাশ টাকা পাটাতনের উপর ছুঁড়ে দিল রাজাসাহেব। তারপর আবার টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

পাটাতনের উপর থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে টাকাগুলি তুলে জীর্ণ ঘাগরার প্রান্তে বাঁধলো আসমানী। তারপর তর্জনী দিয়ে রাজাসাহেবকে খোঁচা দিল, “এই রাজাসাহেব—রাজাসাহেব—”

ছিলাকাটা ধনুকের মত সাঁ করে উঠে বসলো রাজাসাহেব, “কী, হইছে কী? বেবাক ট্যাকা দিয়া দিলাম। আবার কুন মতলব? আর ইদিকে ঘুরাফিরা ক্যান ?”

“ট্যাকার লেইগ্যা না। অন্য কাম আছে।”

"কী কাম ?"

"তুর একবার যুগীবাড়ি যাওন লাগবো।"

ভয়ংকর চোখে আসমানীর দিকে তাকালো রাজাসাহেব, "তামাশা করনের আর সময় মিলল না তুর ? কী লো আম্মা ?"

"তামাশা না, শঙ্খনী একলা যুগীবাড়ি গেছে ঝাড়ফুক করতে। যদি আর বহরে না ফিরে! তুই পরি (পাহারা) দিতে যা। জানস তো শঙ্খ না থাকলে এই বেবাজিয়া বহরের কারো সানকিতে ভাত মিলব না। বেবাক গুষ্টির না খাইয়া মরতে হইব। যা, যা রাজাসাহেব।" আসমানীর গলায় অনুনয় ফুটলো।

"হামি পারুম না। সারা রাইত শরীলের (শরীরের) উপুর দিয়া কত তাফাল (হুজ্জুত) গেছে! অখন আবার শঙ্খরে পরি (পাহারা) দেওন লাগবো! ক্যান, বহরে আর শয়তানেরা নাই ?"

এবার ফুঁসে উঠলো আসমানী, "দ্যাখ্ রাজাসাহেব, এইটা বেবাজিয়া বহর। সারাটা জনম দেইখ্যা আসলাম, বেবাজিয়া মরদেরা খুনখারাপি করে, রাহাজানি করে, মাগী লইয়্যা কাজিয়া করে, চুরি-ডাকাতি করে। এই সব কাম করতে তাগো দিলে ফুর্তি ফোটে। আর একটা খুন কইর‍্যাই এমুন ঘায়েল হইয়্যা পড়লি যে বেলা দুফার তরি (পর্যন্ত) ঘুমাইতে হইব! ওঠ, ওঠ্ শয়তানের ছাও! পাশের নৌকায় একখান কোষাডিঙি আছে, সেইটা লইয়্যা যুগীবাড়ি যা। শঙ্খ তুবই তো পিরিতের মাগী। সে পলাইয়া গেলে তুরই তো পরানে বেশী বেদনা বাজবো।"

"বাজবো না, বাজবো না। দুনিয়ার কুনো মাগী মরদের লেইগ্যাই হামার দরদ নাই। বেশী ফ্যাকর ফ্যাকর না কইর‍্যা এইবার যা। ইট্টু আশ মিটাইয়্যা ঘুমাইতে দে।" বলতে বলতে আবার শুয়ে পড়ল রাজাসাহেব।

"মর্-মর্। শ্যাষ শোয়া শো। বিষহরি তুর মাথায় ঠাটা ফেলুক। দেখি আর কুনো শয়তানেরে যুগীবাড়ি পাঠাইতে পারি কী না ?" গজ গজ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে গেল আসমানী।

আঠার

বিকেলের দিকে ঝাড়ফুঁকের পালা চুকিয়ে যুগীবাড়ি থেকে বেরুল শঙ্খনী।

একজন বর্ষীয়ান যুগী বলল, "বহরে ফিরবা তো বাইদ্যানী ? খালের ঘাটে নৌকা আছে। সেই দিকে চলো।"

শঙ্খনী বললো, "না, অখন হামি বহরে ফিরুম না।"

"তবে যাইবা কোথায় ?"

"হামারে এট্টু বড় ভুঁইয়া ছাহাবের বাড়িতে যাওনের পথটা দেখাইয়্যা দ্যান যুগীমশাই। তা হইলেই হইব।"

"উই যে সামনের দিকে উঁচু পথটা দেখতে আছ বাইদ্যানী, সেই পথটা ধইর‍্যা গেলেই বড় ভুঁইয়ার বাড়ি পাওয়া যাইব। তোমার লগে কারুরে দিমু বাইদ্যানী ?"

"ক্যান ?" জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো শঙ্খনী।

"পথটা দেখানের লেইগ্যা।"

"না। তার দরকার নাই। হামি একাই যাইতে পারুম।" বলতে বলতে হিজল বনের মধ্য দিয়ে সামনের সড়কে গিয়ে উঠল শঙ্খনী।

নাগরপুর গ্রামের এদিকটা অনেকটা উঁচু। বর্ষার জল সড়কটাকে ভাসিয়ে নিতে পারে নি। সড়কটার দু'পাশে লাটাঝোপ, আকন্দবন আর বিষকচুর উদ্দাম জঙ্গল। সেই জঙ্গলে মেঘনার জল এসেছে। কচুর পাতায় রুপালী জল টলটল করছে। রঙে-রসে বর্ষার পৃথিবী যৌবনবতী হয়ে উঠেছে।

মাথায় বেতের ঝাঁপি। চিকন মাজা দুলিয়ে দুলিয়ে, ইরানী ঘাগরাটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সড়ক ধরে এগিয়ে চলল শঙ্খনী। মহব্বতকে যেমন করেই হোক, এই দুনিয়ার আসমান-জমিন ঢুঁড়ে বের করতেই হবে তার। রাজা-সাহেবকে তার মন থেকে মুছে দিয়েছে শঙ্খনী। জীবনের এই দ্বিতীয় পুরুষটিকে নিয়েই কামনা-বাসনাকে সার্থক করে তুলতে হবে।

ভুঁইয়া বাড়িটার কাছাকাছি এসে পড়েছে শঙ্খনী। ওপাশ থেকে একটা ছোকরা আসছিল। মুখ তুলতেই শঙ্খনীর সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ছোকরাটি ভুঁইয়া বাড়ির আর একজন বান্দা। কাল মহব্বতের সঙ্গে একে পানতামাকের জোগান দিতে দেখেছিল শঙ্খনী।

ছোকরা বান্দাটি বলল, "যাও কোথায় বাইদ্যা দিদি ?"

"তুমাগো বাড়ি যাইতে আছি।" শঙ্খনী বলল।

"হায় রে খোদা ! ইদিকে মহব্বত ভাই যে তুমাগো বহরেই গেল। আর তুমি আসছ আমাগো ইখানে !"

"তাই না কী ? তবে হামি বহরে ফিরি। তুমার লগে ডিঙি আছে ভাই ? হামারে ইট্টু বহরে দিয়া আসবা ?" আচমকা ফেরার একটা আন্তরিক তাগাদা হৃদয় ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে লাগলো শঙ্খনীর।

"তুমি এট্টু খাড়াও বাইদ্যা দিদি। আমি ডিঙিটা খালে ঘুরাইয়্যা আনি।" বলতে বলতে সামনের বনমাদার গাছগুলির তলা দিয়া খালের দিকে চলে গেল ছোকরা বান্দাটা।

নয়ানজুলির কিনার ঘেঁষে কয়েকটা সোনাব্যাঙ লাফালাফি করছে। দুটো ব্যাঙ ধরে বিষকচুর পাতায় বন্দী করলো শঙ্খনী। মিঠা সই-এর ফলার।

তাদের বহরে আবার গিয়েছে বাদশাজাদা। তার আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করে নি মহব্বত। বড় ভাল লাগছে শঙ্খনীর। দেহমন ছাপিয়ে বিচিত্র এক ভাললাগা উপচে উপচে পড়ছে। কাল রাত্রে বুকের উপর খৈজাতি সাপটা যদি বিষ ঢালত, তা হলে এই মুহূর্তের এই ভাললাগাটুকু কোথায়, কোন্ আসমানে, কোন্ দুনিয়ায় খুঁজে পেত শঙ্খনী ? মিঠা সই-এর উপর অসীম

কৃতজ্ঞতায় মনটা কানায় কানায় ভরে গেল নাগমতী বেদেনীর।

এতক্ষণে একটা কোষডিঙি খাল ঘুরে নয়ানজুলির জলে নিয়ে এসেছে ছোকরা বান্দাটা। সে বলল, "ডিঙি লইয়্যা আসছি বাইদ্যা দিদি। ইদিকে আসো।"

উনিশ

ছোট কোষডিঙিতে করে শঙ্খিনীকে বেবাজিয়া বহরে পৌঁছে দিয়ে গেল ছোকরা বান্দাটা।

অনেকক্ষণ আগেই দুপুর পেরিয়ে গিয়েছে। এখন বিকেল। আকাশের খণ্ডছিন্ন মেঘমালার ফাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়েছে রয়নাবিবির খালে। দু'পাশে ধানবন সিঁথির মত চিরে চিরে শালতি-মাল্লাই-কোষডিঙি—এমনি অজস্র নৌকা মেঘনার দিকে ভেসে চলেছে।

বহরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্খিনীর নজরে পড়ল। একেবারে ডানপ্রান্তের নৌকাখানায় উবু হয়ে রয়েছে রাজাসাহেব। আর ডোরার কাছে একখানা জলচৌকির উপর জাঁকিয়ে বসেছে মহব্বত। তার বাদশাজাদা। বড় ডাবা হুঁকোর ফোকরে মোটা মোটা ঠোঁট রেখে দু'জনেই ভক্ ভক্ করে টেনে চলেছে সমানে। তামাকের ঘন ধোঁয়ার আড়ালে রাজাসাহেব আর মহব্বত দু'জনকেই অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

মহব্বতকে দেখতে দেখতে এক অপরূপ ভাললাগার নেশায় শঙ্খিনীর সকল দেহমন যেন ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল।

ব্যগ্র পা ফেলে ফেলে ডানপ্রান্তের নৌকাখানার দিকে চলে যাচ্ছিল শঙ্খিনী। তার আগেই ছই-এর মধ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো আসমানী। ফিস ফিস গলায় সে ডাকলো, "এই শঙ্খ—"

থমকে দাঁড়ালো শঙ্খিনী, "কী কও আম্মা?"

"ঝাড়ফুঁক কইর‍্যা কয় ট্যাকা মজুরী পাইছিস?"

খুশি খুশি গলায় শঙ্খিনী বলল, "অনেক, অনেক ট্যাকা। এত ট্যাকা সারা জনমে তুই কুনোদিনও দেখস নাই আম্মা।"

আসমানীর কাছাকাছি এসে দু'হাতের ফাঁসে তার গলাখানা আঁকড়ে ধরল শঙ্খিনী। শঙ্খিনীর নিবিড় আশ্লেষের মধ্যে এবার সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল আসমানী, "কী হইছে? কী ব্যাপার? ট্যাকা কই? মজুরী দেয় নাই তরে?"

"দিছে।" আসমানীর মুখের দিকে মিটিমিটি চোখে তাকালো শঙ্খিনী। সে চোখে কৌতুক জ্বলছে।

বেদেনীর আলিঙ্গন যেন উদয়নাগের ফাঁস। আর সেই ফাঁসের মধ্যে হাসফাঁস করে উঠল আসমানী, তীক্ষ্ণ গলায় সে চেঁচালো, "ছাড়, ছাড়। পিরিত রাখ্। আসল কামের কথা ক'। ট্যাকা কই?"

দু'টি বাহুর ফাঁস এতটুকু শিথিল করলো না শঙ্খিনী। শুধু উচ্ছল গলায় বলল, "হামার দিলটা বড় খুশী লাগতে আছে আম্মা। আইজ দিনটা জবর ভাল।"

মনে মনে অনেকটা আশ্বস্ত হলো আসমানী। শঙ্খিনীর মর্জি-মেজাজ সবই অনুকূলে রয়েছে। খুবই শুভ ইঙ্গিত। একটু পরেই বড় ভুঁইয়া আসবেন। কয়েক কুড়ি টাকা পাওয়ার চূড়ান্ত সম্ভাবনা রয়েছে। কাল শঙ্খিনী যেমন বেতরিবত মেজাজের ঝাঁঝ দেখিয়েছিল, তাতে রীতিমত শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল আসমানী। বিচিত্র এক দুভাবনায়, অদ্ভুত এক অস্বস্তিতে সারাটি দিন কেটেছে তার।

গ্রাম-গঞ্জ-বন্দরে বহর ভিড়িয়ে তারা বড় ভুঁইয়াদের সামনে বেদেনীদেহের পসরা তুলে ধরে। যৌবন বিক্রির বিনিময়ে একমুঠো রুপালী টাকা মেলে। বেবাজিয়া মেয়ের বরতনু সম্ভোগ করে কোন কোন ভোগী পুরুষ আবার কুৎসিত রোগ ঢেলে দেয়। তারপর তৃপ্তির আবেশে টলতে টলতে বহর থেকে নেমে যায়। সাপ খেলিয়ে, জড়িবুটি-আয়নাচুড়ি-বিষপাথর বেচে যা সামান্য কিছু পাওয়া যার তার সঙ্গে নারীপণ্য বিক্রির টাকা মিলিয়ে এদের জীবনযাত্রা এগিয়ে চলে।

গৃহী জীবনের সকল অনুশাসন থেকে উৎখাত এই মানুষগুলি সভ্য দুনিয়ার সমস্ত কলুষ, সমস্ত গরল অকুণ্ঠ মনে পান করে চলেছে। সৌর জগতের যত আলো যত পবিত্রতা—সব ঝলমল করে গৃহস্থ মানুষের আশা-আকঙ্ক্ষায়, হর্ষে-পুলকে। স্বামীর সোহাগে স্ত্রীর একনিষ্ঠ প্রেমে জীবনের কল্যাণকর ভাষ্যটি ফুটে বেরোয়। আর জীবনের পর জীবন ধরে, শতাব্দী থেকে শতাব্দী পরিক্রমার পথে দুনিয়ার সব অন্ধকার এসে জড়ো হয়ে এই বেবাজিয়া বহরে। বেদেনীর বিলোল চোখে, চটুল লাস্যে, পাশব পুরুষের পীড়নে বিক্ষত দেহটির প্রতিটি রক্ত-কণায় দুনিয়ার যত মারী-বিষ বিন্দু বিন্দু করে জমা হয়। সেই বিষ থেকে বেবাজিয়া জীবনের সংস্কার জন্মায়। আর সেই সংস্কার থেকে কারো রেহাই নেই। তার ফাঁদ থেকে পালিয়ে যাবার কোন উপায়ই কোন বেবাজিয়ার নেই।

এরই মধ্যে আবার গ্রাম-গঞ্জে ঘুরতে ঘুরতে শঙ্খিনীরা গৃহী জীবনের খুয়াব দেখে। স্বামী-সন্তান-স্নেহ-প্রেম-নীড় দিয়ে ঘেরা এক সুধাস্বাদ পৃথিবী তাদের কুহকিত করে। এই গৃহী জীবন মধুর স্বপ্ন দেখাতে দেখাতে তাদের হাতছানি দেয়। আর তখনই এই ভাসমান বেবাজিয়া বহর থেকে পালিয়ে যাবার এক দুঃসহ যন্ত্রণায় পেয়ে বসে নাগমতী বেদেনীদের। কিন্তু চারিদিকে সংস্কারের পাহারা বসিয়ে রেখেছে আসমানীরা। গৃহী জীবনকে আসমানীরা ভয় পায়। নিরুদ্বেগ নীড়ের সঙ্গে তাদের নিয়ত কালের শত্রুতা। গৃহী পৃথিবীর সঙ্গে কোন রফা? অসম্ভব। কোন সন্ধি? অবাস্তব। তাই যখনই শঙ্খিনীরা ঘরের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে, তখনই বেবাজিয়া সংস্কারগুলির ভারসাম্যের বিন্দুটি দুলে ওঠে। আসমানীরা চমকায়।

শঙ্খিনীর ঘর বাঁধার মাতলামিতে একটি ভয়াল ইঙ্গিত দেখতে পেয়েছিল আসমানী। বেদেনীর অত সতীপনা কী মানায়! বড় ভুঁইয়াদের একটু তোয়াজ, একটু পিরিত-মহব্বতের ঠমক না দেখালে কি চলে! অবশ্য তার মত নিদাঁত হৃতলাস্য বুড়ী বেদেনী যদি পিরিত জমাতে যায়, তা হলে নির্ঘাত কয়েকটা ক্ষ্যাপা লাথির বখশিশ মিলবে। কিন্তু শঙ্খিনীর দেহে কাঁচা আনাজের মত চেকনাই, পানরাঙা ঠোঁটে ভরা পানপাত্রের আভাস, চোখের কোণে সর্বনাশের ইশারা—তার তোয়াজের দর অনেক। যৌবনবতী বেদেনীর সোহাগের কদর আরো বেশী। তার সোহাগের বদলে দু'মুঠো ভরে কাঁচা টাকার ইনাম অনিবার্য। আর সেই ইনামের টাকায় বেবাজিয়া বহরের এতগুলি মানুষের এতগুলি পাতে ভাত আসে। নইলে সকলের বরাতে না খেয়ে মরাটা একেবারেই নিশ্চিন্ত।

সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে বড় ভুঁইয়া আসবেন। যাক্, দুর্যোগ অনেকটা কেটে গিয়েছে। বড় খুশী খুশী দেখাচ্ছে শঙ্খিনীকে। আসমানী অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো।

শঙ্খিনীর দু'হাতের ফাঁস থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছে আসমানী। এবার সে বলল, "রঙ্গ রাখ শঙ্খি, ট্যাকা কই ?"

"এই নে আম্মা।" ঘাগরার গোপন গ্রন্থি খুলে দুটো টাকা বের করলো শঙ্খিনী। তারপর আসমানীর হাতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, "এই রইল তুর ট্যাকা। হামি যাই।"

"কুথায় যাবি ?" তির্যক চোখে তাকালো আসমানী।

গলা থেকে খুশী উছলে পড়ল শঙ্খিনীর, "বহরে হামার বাদশাজাদা আসছে। তার কাছে যামু।"

বলতে বলতে পাশের নৌকার দিকে চলে গেল শঙ্খিনী। আর গজ গজ করে উঠল আসমানী, "এট্টা শয়তানের ছাও।"

আসমানীর ভ্রূদুটো কাঁকড়া বিছার মত কুঁকড়ে গেল। ঘোলাটে চোখদুটো ধক্ ধক্ জ্বলল।

নয়ানজুলি থেকে বিষকচুর পাতায় দুটো সোনাব্যাঙ বেঁধে এনেছিল শঙ্খিনী। মিঠা সই-এর ফলার। ব্যাঙ দুটো নিয়ে মহব্বতের কাছে এলো সে। মুগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে শঙ্খিনী হাসল। কেমন এক লজ্জার রসে সমস্ত মুখখানা ভারী রসালো দেখালো শঙ্খিনীর। পলকের মধ্যে বেদেনীর গালের উপর রক্তের উচ্ছ্বাস জমলো। গাঢ় গলায় শঙ্খিনী বলল, "আপনে ইট্টু বসেন বাদশাজাদা ; হামি ছই-এর ভিতর থিকা আসি।"

মহব্বত বলল, "আচ্ছা—"

গলুইর উপর উবু হয়ে বসে একান্ত নির্বিকার ভঙ্গিতে তামাক পুড়িয়ে চলেছে রাজাসাহেব। অখণ্ড মনোযোগে হুঁকোর বাজনা বাজাচ্ছে ভক্ ভক্।

সহসা নিজের দিকে তাকালো শঙ্খিনী। এই মুহূর্তে মহব্বতের চোখের

সামনে ঘাগরা আর কাঁচুলির নগণ্য আবরণের মধ্যে অদ্ভুত এক শরমের তাড়নায় সমস্ত শরীরটা কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে এল তার। অথচ সারা দেহের এই ঝিম্‌ঝিম্‌ লজ্জাটুকু নিজেরই বড় ভাল লাগলো শঙ্খনীর। প্রতিটি অঙ্গে, প্রতিটি প্রত্যঙ্গে সুখের শিহরন খেলে গেল বেদেনীর। বাঞ্ছিত পুরুষটিকে দেখতে দেখতে দেহের প্রতিটি মধুমান কোষ সারিন্দার সুরের মত ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

ছই-এর মধ্যে এসে মিঠা সই-এর ঝাঁপিতে সোনাব্যাঙ দুটো ছেড়ে দিল শঙ্খনী। তারপর পাটাতনের এক কিনার থেকে খুঁজে কালকের রাঙা ডুরে শাড়িটা বের করলো। আজ বড় ভাল লাগছে নিজেকে। নিজের হাত, মুখ, বুক, চিবুক, সুডৌল উরু, সুঠাম নিতম্ব কি সুন্দর! কি মধুর! হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সারা দেহের স্পর্শ নিতে লাগলো শঙ্খনী। আজ দুনিয়া জুড়ে রঙের, রসের আর ভাল লাগার এক অপরূপ উৎসব যেন লেগেছে। আর সেই উৎসবে নিজেকে একাকার করে যেন হারিয়ে গিয়েছে নাগমতী বেদের মেয়ে।

কাল দফাদার তার শরীরটাকে ডলে-পিষে অশুচি করে গিয়েছিল। কামের পাশব প্রবৃত্তিতে তার সুন্দর দেহটিকে কামড়ে কামড়ে, নখ দিয়ে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটা রাক্ষসের মত ভোগ করে গিয়েছে শয়তানটা। কাল এই রাঙা ডুরে শাড়িটাকে একটা অসহ্য দাবাগ্নির মত মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, শাড়িটা থেকে আগুন ঠিকরে ঠিকরে তার চামড়া, তার মাংস, তার অস্থি-মজ্জা ঝলসে দিচ্ছে। তার দেহ কুঁকড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এখন এই শাড়িটার স্পর্শসুখে চোখ বুঁজে আসতে চাইছে।

চকিতে শাড়িটা সারা দেহে জড়িয়ে নিল শঙ্খনী। তারপর হাত-আরশিখানা মুখের সামনে স্থির করে ধরলো। কালকের মত আজও আয়নার কাঁচে এক শরমবতী নারীমুখের ছায়া পড়ল। শঙ্খনী ভাবলো, অনেকদিন আগে আসমানী তাকে একটা সুন্দর গল্প বলেছিল। বহু বছর আগে না কী রাজকন্যারা নিজেরাই অজস্র রাজকুমারের সভা থেকে সোয়ামী বাছাই করে নিত। তার বেলায় অবশ্য অনেক পুরুষ নেই। তবু একটি মহব্বতের মধ্য থেকেই তার একান্ত পুরুষটিকে বাছাই করে নেবে সে। শঙ্খনী ভাবলো, আজ যেন তার স্বয়ম্বর, কিংবা শা-নজর (শুভদৃষ্টি), কিংবা দেহ মনের প্রিয়তম সুখের আশায় বাসরযাত্রা।

জীবনের আস্বাদ পলকে পলকে কী যাদুতেই না বদলে যায়! এই তিক্ত, এই মধুর! শঙ্খনী ভাবলো, কাল জীবনটাকে কী দুর্বলই না মনে হয়েছিল! সমস্ত দেহে, সমস্ত মনে অপমান আর ব্যথার নীল গরল যেন ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছিল। মৃত্যুর মধ্যেই পরিত্রাণ ছিল কাল। আর আজ! জীবনের জন্যে কত অফুরন্ত সাধ শঙ্খনীর। দুনিয়ার আলো, বাতাস, প্রেম ভালবাসার মধ্যে কত সুধা! কত অমৃত! সেই অমৃতের পাত্রে চুমুক দিয়ে কালকের বিষের ক্রিয়া একেবারেই ব্যর্থ করে দেবে সে। আবার নতুন করে বাঁচতে শিখবে শঙ্খনী।

শঙ্খিনী ভাবলো, কাল মিঠা সই-এর দাঁতে যদি মারণ থাকত, তা হলে আজকের সুন্দর ভাললাগাটুকু কোথায় পাওয়া যেত ? শিউরে উঠলো নাগমতী বেদেনী। না আর কোনদিন আত্মঘাতের কথা ভাববে না সে। কোনদিনই নয়।

একটু পরেই বইরে বেরিয়ে এলো শঙ্খিনী।

জলচৌকির উপর বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছিল মহব্বত। একটু পরেই বেবাজিয়া বহরে আসবেন বড় ভূঁইয়া। শঙ্খিনীর সঙ্গে একটা রাত কাটাবার শৌখিন মর্জি ধরেছেন ভূঁইয়া সাহেব। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই রয়নাবিবির খাল উজিয়ে বেদে-বহরে চলে এসেছে মহব্বত। বড় ভূঁইয়াকে তার জানা আছে। তাঁর সঙ্গে আজন্ম কালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় মহব্বতের। নারী-মাংসের গন্ধে শিকারী বাঘের মত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেন বড় ভূঁইয়া। আর সে নারী শঙ্খিনীর মত খুবসুরত হলে আর রেহাই নেই। নারীদেহ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো না করা পর্যন্ত থাবা গুটিয়ে নেন না ভূঁইয়া সাহেব। একেবারে বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নখ, দাঁত আর পাশব আশ্লেষ থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় কোন যৌবনবতীরই নেই।

মহব্বত ভাবছে, আজ আর সে বান্দা নয়, অন্তত একজনের কাছে বাদশাজাদার মর্যাদা পেয়েছে সে। শঙ্খিনীর কথায়, হাসিতে, কৌতুকে এমন কিছুই নেই যা জ্বালা দেয়, ব্যথা দেয়। তার কথায়, তার রঙ্গরাগে এমন কিছু আছে, যা তার জোয়ান প্রাণটাকে দোলা দিয়ে যায়। শঙ্খিনীই তার যৌবনকে প্রথম গৌরব দিয়েছে। এতকাল বেদেনীদের তামাশায় শুধু ব্যঙ্গ আর শ্লেষের আভাসই পেয়েছে মহব্বত। কিন্তু শঙ্খিনী একেবারেই আলাদা। একেবারেই গোত্রছাড়া। বেবাজিয়া বহরে থেকেও সে যেন বেদেনী নয়। মহব্বত ভাবলো তার পৌরুষ, তার যৌবন বান্দা নামের আড়ালে এতকাল ঘুমিয়ে ছিল। শঙ্খিনীই তাদের ঘুম ভাঙিয়ে মুখর করে তুলেছে। আজ তার পৌরুষ, তার যৌবন সবল পেশীময় দেহটির কোষে কোষে মাতামাতি শুরু করেছে। আর এই যৌবনের অধিকারেই শঙ্খিনীকে বড় ভূঁইয়ার থাবা থেকে সে রক্ষা করবে। সে শঙ্খিনীর বাদশাজাদা। বড় ভূঁইয়া আজ আর তার মনিব নয়। শঙ্খিনীকে কেন্দ্র করে একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। আজ সে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। শঙ্খিনীই তাকে বান্দা থেকে বাদশায় তুলে এনেছে। তাকে পৌরুষ দিয়েছে। যৌবনের গর্ব দিয়েছে। তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দুঃসাহস সঞ্চার করেছে। তাই শঙ্খিনীর ইজ্জত সে রাখবে। যেমন করেই হোক।

মহব্বত তাকালো। আর সঙ্গে সঙ্গেই তার চোখের মণিতে এত বড় দুনিয়ার সব বিস্ময় যেন টলমল করে উঠল। কোন্ ভোজবাজিতে এর মধ্যে জন্মান্তর হলো বেদের মেয়ের ? আশ্চর্য ! ঘরের মিঠে জরুর মত দেখাচ্ছে শঙ্খিনীকে।

স্নিগ্ধ গলায় মহব্বত বলল, "আরে এ যে একেবারে ঘরের বউ। বড় সোন্দর ! জবর মিঠা ! তবে ঐ ঘাগরা আর কাঁচুলি পইর‍্যা থাকো ক্যান ?"

বুকের ভেতরটা কেমন যেন ছলছল করে উঠল। কী এক বিক্ষোভে সকল চৈতন্য দুরু দুরু করল। অভিমানী গলায় শঙ্খিনী বলল, "এই বেবাজিয়া

বহরে এমুন এট্টা মরদ নাই যে হামার সাদসোহাগটা বোঝে ! হামারে বউ সাজাইয়া রাখে, এমুন কেউ নাই এই দুনিয়ায় ।" বলতে বলতে মহব্বতের দিকে চকিত কটাক্ষে তাকালো শঙ্খিনী ।

পরশুদিন, যখন প্রথম বেদেবহরে এসেছিল মহব্বত, তখনও শঙ্খিনীর মুখে চোখে রঙ্গরসের আশনাই দেখেছিল । কিন্তু আজ যেন এক অভিমানী নারীর মুখোমুখি বসেছে সে । সে নারীর প্রাণে কত বেদনা কত দরদ উথাল-পাথাল হচ্ছে । শঙ্খিনীকে আজ বড অচেনা মনে হয় । তার বেশ-বাস, কথা, হাসি, লজ্জামাখা কটাক্ষ থেকে বেদেনী মুছে গিয়েছে । তার বদলে এক মধুমতী ফুটে বেরিয়েছে ।

প্রগল্ভ হয়ে উঠল মহব্বত । নিয়তকালের মূক বান্দার বুকে রাশি রাশি কথাব দুয়াব খুলে গিয়েছে । মহব্বত বলল, "এমুন মানুষেরও অভাব আছে না কী দুনিয়ায় ! তোমার লাখান (মত) বউ পাইলে বেবাক-পুরুষই মাথায় কইর‍্যা রাখব । তোমারে দেইখ্যা আমারই পরানটা ছ্যাত কইর‍্যা উঠছে ।" বলেই বোকা বোকা হাসি হাসল মহব্বত ।

অসহ্য গলায় শঙ্খিনী বলল, 'সাচা কথা বাদশাজাদা ?"

"এর থিকা বড সত্য আমাব জনমে আব কোনদিনই কই নাই বাইদ্যানী ।" জলচৌকিটা আরো খানিকটা সামনের দিকে এগিয়ে আনল মহব্বত ।

একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে ব'সছে শঙ্খিনী আর মহব্বত । শঙ্খিনী ভাবছে, কাল দুপুরবেলা রাজাসাহেবের সুন্দর একটি প্রতিশ্রুতির মোহে মহব্বত নামে জীবনের দ্বিতীয় পুরুষটিকে সে সানন্দে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল । কিন্তু আজ সে তার কত ঘনিষ্ঠ হয়েছে । কত সন্নিকট হয়েছে । আজ রাজসাহেবকেই নির্বিবাদে সরিয়ে দেওয়া যায । শঙ্খিনী ভাবলো, আজ মহব্বতই তার জীবনে একমাত্র পুরুষ । রাজাসাহেব আজ বাতিল হয়ে গিয়েছে । বেদেনীর মন থেকে চিরকালের জন্যে মুছে গিয়েছে ।

তৃতীয় আর একটি প্রাণী যে গলুইর উপর বসে রয়েছে, তার সম্বন্ধে এতক্ষণ অবিচার করেছে মহব্বত আর শঙ্খিনী । তার অস্তিত্ব ভুলেই গিয়েছিল দু'জনে । এবারে তার সাডা পাওয়া গেল । আচমকা, একান্তই আচমকা ফুসফুসের সকল শক্তি দিয়ে হুঁকোর শব্দ করল রাজাসাহেব ।

চকিত হয়ে দু'দিকে সরে বসল মহব্বত আর শঙ্খিনী ।

রাজাসাহেবের দিকে তাকিয়ে গর্জে উঠল শঙ্খিনী, "এই রাজাসাহেব, এই বখিল, হারামজাদা এইখানে বইস্যা কী করতে আছিস ?"

আশ্চর্য ! এতটুকু উত্তেজিত কী বিচলিত হলো না রাজাসাহেব । নির্বিকার ভঙ্গিতে তামাক টানতে টানতে ভ্রূ দুটো কুঁচকে একবার তাকালো মাত্র ।

তীক্ষ্ম গলায় চেঁচিয়ে উঠল শঙ্খিনী, "কী রে ইবলিশ, কথা কইতে আছিস না যে ! এইখানে বইস্যা বইস্যা কী করতে আছিস ?"

নিস্পৃহ গলায় জবাব দিল রাজাসাহেব, “দেখতে আছি আর শুনতে আছি।”

“কী দেখতে আছিস ? কী শুনতে আছিস ?”

“দেখতে আছি তুগো ভাবগতিক। দেখতে আছি কেমন কইর‍্যা এট্টা বাইদ্যানী মাগী এট্টা গিরস্থী (গৃহস্থী) শয়তানের লগে পিরিত জমায়। আর শুনতে আছি তুগো রসরঙ্গের কথা।” বলেই ভক্ ভক্ শব্দ করে তামাক টানতে লাগল রাজাসাহেব।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এবার হুংকার ছাড়লো শঙ্খিনী, “যা, যা, ইবলিশ, এই নৌকা থিকা ভাগ্। অন্যখানে মর্ গিয়া। এইখানে তুর কোন্ কাম ?”

পয়গম্বরের মত মাথা ঝাঁকাল রাজাসাহেব, “এইখানে কোন কামই নাই হামার। তবে বইস্যা বইস্যা তোগো হালচাল দেখি, পিরিত-মহব্বতের কথা শুনি। দেইখ্যা শুইন্যা চোখ আর কানেরে খুশি করি। এই আর কী! বুঝলি কি না শঙ্খি ! হেঃ-হেঃ—” খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে উঠল রাজাসাহেব।

“তুরে দেখলে শরীলটা (শরীরটা) হামার মরিচের লাখান (মত) জ্বলে। যা, যা শয়তান।” চোখমুখ থেকে ফুলকি ঠিকরে বেরুল শঙ্খিনীর।

“যামু, নিচ্চয় যামু শঙ্খি ! কিন্তুক তার আগে তুরে এটা কথা কমু। শুনবি ?” হুঁকোটা পাটাতনের উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে রাজাসাহেব বলল।

“কী কথা ?”

“তুই তো জানস শঙ্খি, এই বেবাজিয়া বহরে হামার লাখান (মত) কেউ সড়কি চালাইতে পারে না। সড়কি চালানে জবর সাফ হামার হাত।”

“জানি। তাতে কী হইছে ?”

শঙ্খিনীর জিজ্ঞাসার কোন জবাব দিল না রাজাসাহেব। শুধু বাঁকা চোখে মহব্বতকে দেখতে দেখতে সে বলল, “জানস তো হামার হাত থিকা একবার সড়কি ছুটলে কলিজা এফোড়-ওফোড় হইয়্যা যায়। জানস তো এই জনমে কত খুনখারাপি করছি, তার হিসাবই হামার জানা নাই। কত লাশ যে পদ্মায়, মেঘনায় আর কালাবদরের জলে ভাসাইয়্যা দিছি, তার ইয়ত্তা নাই।” মহব্বতকে তেরছা দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে করতে নিরুদ্বেগ গলায় বলল রাজাসাহেব।

শঙ্খিনী বলল, “জানি, জানি তুর বেবাক খবরই জানি। তাতে হইছে কী ? কী রে হারামজাদা ?”

“কিছুই হয় নাই। তুগো ভাবগতিক দেখতে দেখতে, তুগো রসের কথা শুনতে শুনতে ক্যান জানি খুনখারাপির কথা মনে পড়ল। মনে হইল, হামার নয়া সড়কিটার জবর রক্তের তিয়াস লাগছে। হেঃ-হেঃ—তাজা জুয়ানের রক্তের তিয়াস।” বলতে বলতে আবার হুঁকোটা তুলে নিল রাজাসাহেব।

ফুঁসে উঠল শঙ্খিনী, “হামিও বিষ বাইদ্যানী। আর বিষ, ছার বিষ, পার বিষ, বেবাক বিষ হামি তুলতে জানি। সব শয়তানি ভাঙনের মন্তর হামার জানা আছে। বেশী ফুটানি দেখাইস না রাজাসাহেব। তুর সড়কির হাত জবর সাফ ; সাচা (সত্য) কথা। কিন্তুক হামার হাতেও বিষাল (বিষাক্ত) সাপ

জবর নাচে। তুর বেবাক বিষ হামি তুইল্যা ছাড়ুম, তবে হামি বিষবাইদ্যানী।” কুপিত বুকটা ফুলে ফুলে উঠল। দ্রুততালে নিঃশ্বাস পড়ল। উত্তেজনায় সমস্ত শরীরটা কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল শঙ্খনীর।

মোলায়েম গলায় রাজাসাহেব বলল, “হামি তো চাই, তুই বিষ বাইদ্যানীই থাক্ শঙ্খ। ক্যান ঘরের খুয়াব দেখস! বিষহরির গোসা হইব। তার থিকা হামরা যেমুন বেবাজিয়া আছি, তেমনই থাকি।” গলুইর উপর থেকে উঠে দাঁড়াল রাজাসাহেব। তারপর শঙ্খনীর দিকে পা বাড়িয়ে দিল।

চিৎকার করে উঠল শঙ্খনী, “হামার কাছে আসবি না ইবলিশ! পিরিত ফুটানের আর মানুষ পাইস না? যা, যা, তুর গায়ের গোন্ধে হামার নাক জ্বইল্যা যায়। ভাগ, শয়তান।” শঙ্খনীর দুটো চোখ ধক্ ধক্ জ্বলছে।

থমকে দাঁড়াল রাজাসাহেব। তারপর গুটি গুটি পায়ে আবার গলুইতে ফিরে গেল।

অনেকক্ষণ তিনজনে নিঝুম হয়ে বসে রইল। একটি কথা বলল না। এতটুকু নড়ল না।

শ্রাবণের আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। নীচে রয়নাবিবির খালটা ফুলছে, দুলছে, ফুঁসছে। ফেনার ফুলকি ফুটছে ঢেউ-এর মাথায় মাথায়। আর বেবাজিয়াদের পাঁচখানা নৌকার বহর সেই ঢেউ-এ অবিরাম দোল খাচ্ছে।

একসময় মহব্বত বলল, “এট্টা খবর শুনছ বাইদ্যানী?”

“কী খবর?”

“ইট্টু পরেই বড় ভুঁইয়া তোমাগো বহরে আসব। সেই খবরটাই তোমারে দিতে আসছিলাম।”

বিষণ্ণ চোখে মহব্বতের দিকে তাকালো শঙ্খনী, “ক্যান? ভুঁইয়া ছাহাব হামাগো বহরে আসব ক্যান?”

“দুনিয়ার বেবাক বোঝ আর এইটুকু বোঝ না বাইদ্যানী! এই বেবাজিয়া বহরে তুমি ছাড়া আর কোন্ টানটা আছে যে ভুঁইয়া ছাহাব আসব। তোমার টানেই আসব।” সারা মুখে নিষ্প্রাণ হাসি ফুটল মহব্বতের।

“ক্যান? হামি কোন গুণাহ্ করছি? কাইল আসছিল দফাদার, আইজ আসব ভুঁইয়া ছাহাব। আর পারি না বাদশাজাদা, হামি আর পারি না।” ককিয়ে উঠল শঙ্খনী। মনে হলো তার হৃৎপিণ্ডটা ছোট বুকটাকে চৌচির করে ফাটিয়ে যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে। সন্ত্রস্ত গলায় শঙ্খনী আবারও বলল, “কিন্তুক বাদশাজাদা, উই যে বুড়ী আম্মা আছে, উ যে হামারে শ্যাষ করব। হামারে ইট্টু ইট্টু কইর‍্যা খুন করব। এই দুনিয়ায় কী একটা মানুষও নাই যে হামারে এই কবর থিকা বাঁচাইতে পারে?”

স্থির দৃষ্টিতে মহব্বতের দিকে তাকালো শঙ্খনী। তার ঘনপক্ষ্ম চোখ দু'টি সজল হয়ে উঠেছে। আর সেই চোখে কী এক করুণ অনুনয় ফুটে বেরিয়েছে।

বুকের মধ্যটা কেমন যেন চমকে উঠল মহব্বতের। মনে পড়ল, যেদিন

থেকে দুনিয়ার হালচাল সে বুঝতে শিখেছে, যে মুহূর্ত থেকে তার বুদ্ধির কলি ফুটেছে ঠিক সেই মুহূর্তটি থেকে তার নসিবে শুধু আঘাত আর অপমান ছাড়া কিছুই জোটে নি। এতকাল বড় ভুঁইয়া তার পিঠের উপর গণ্ডায় গণ্ডায় পয়জার ভেঙেছেন। কিন্তু আজ বান্দা জীবনের সকল অগৌরব, সকল গ্লানি সে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে। বেদেনীর কামনাকে জয় করতে করতে সে বান্দা থেকে বাদশায় উঠে এসেছে। মহব্বত ভাবলো, আজ তার প্রতিবাদের দিন। আজ তার পৌরুষ ঘোষণার দিন। যত শক্তিধরই হোন না বড় ভুঁইয়া, বিত্ত, সম্পদ আর জনবলে যতই বলীয়ান হোন না, আজ তাঁর পরাজয়ের দিন। শঙ্খনীকে দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত সে হানবে বড় ভুঁইয়াকে। নারী পণ্যের খদ্দের বড় ভুঁইয়া সাহেব; কিন্তু শঙ্খনীর ইজ্জতকে কিছুতেই সে তাঁর লালসায় ভ্রষ্ট হতে দেবে না। যেমন করেই হোক তাঁকে প্রতিঘাত দিতেই হবে। বড় ভুঁইয়ার কামের তাড়না থেকে শঙ্খনীকে রক্ষা করতে হবে। মহব্বত ভাবছে, শঙ্খনীর দেহের শুচিতা এত বড় দুনিয়ায় একমাত্র তার উপরেই যেন নির্ভর করছে।

প্রখর গলায় মহব্বত বলল, “তুমি বড় ভুঁইয়ারে খেদাইয়া দিও বাইদ্যানী। শুওরের বাচ্ছাটা বড় শয়তান, বড় বখিল, বড় ইবলিশ। সোন্দরী মাগীর গোন্ধ পাইলে তার আর দুনিয়ার কোনদিকে নজর থাকে না।”

“হামি কী করুম বাদশাজাদা? আম্মা যে আছে!” এবার একান্ত স্পষ্ট ভাষায় শঙ্খনী বলল, “তুমি হামারে কুথাও নিয়া চল বাদশাজাদা। এই বহরে আর থাকতে হামার সাধ নাই। তুমি হামারে বাঁচাও। সারাটা জনম হামি তুমার বান্দী হইয়্যা থাকুম।” বলতে বলতে আর্ত কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল শঙ্খনী।

“শঙ্খ—” গলুইর উপর থেকে একবার তীব্রতীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে রাজাসাহেব।

“কী হইছে? চিল্লাইস ক্যান রাজাসাহেব?” রুদ্ধ স্বরে বলল শঙ্খনী। কান্নায় বেদনায় আকুল হয়ে উঠছে সে।

“কী সব কইতে আছিস? হামাগো বহরে আর মরদ পাস না তুই? হামরা কী মইর‍্যা গেলাম না কি? হামি কিন্তুক বেবাক কইয়্যা দিমু আম্মারে।” গর্জন করে উঠল রাজাসাহেব।

“যা খুশি কর গিয়া। হামার কাছে ক্যান, উই আম্মা মাগীর কাছে সোহাগ জানা গিয়া।” ফোঁস করে উঠল শঙ্খনী। তার সজল চোখের মণিতে যেন উদয়নাগের ফণা নাচছে।

শঙ্খনীর দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে আর কোন কথা বলল না রাজাসাহেব। শুধু কলকের মাথা থেকে তামাকের আগুন খালের জলে ফেলে দিল। ছ্যাঁক করে একটা আওয়াজ ভেসে এলো। তারপর ক্রুদ্ধ পা ফেলে পাশের নৌকায় চলে গেল রাজাসাহেব।

সে দিকে জ্বলন্ত চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল শঙ্খনী।

একসময় মহব্বত বলল, "যেমুন কইর‍্যা হোক, বড় ভুঁইয়ারে খেদাইয়া দিবা। কিছুতেই বহরে উঠতে দিবা না বাইদ্যানী।"

শঙ্খিনী বলল, "আইচ্ছা বাদশাজাদা এট্টা কথার জবাব দাও দেখি। হামার ইজ্জত বাচাইয়্যা তুমার কী লাভ?"

"শুনতে চাও বাইদ্যানী?"

"নিচ্চয় বাদশাজাদা।"

"তবে শোন, তোমার ইজ্জতের লগে আমার ইজ্জতও আজও এক হইয়্যা গেছে। তোমার যদি ইজ্জত যায়, তা হইলে আমার ইজ্জতও যায়। তোমার ইজ্জত থাকলে আমারটাও থাকে।" আশ্চর্য গম্ভীর দেখালো মহব্বতকে। মহব্বত ভাবলো, এই সুন্দর কথাগুলি এতকাল তার বুকের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে ছিল? কেমন করে সাজিয়ে গুছিয়ে কথাগুলি সে বলতে পারল! ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা বিস্মিত হয়ে গেল মহব্বতের।

শঙ্খিনী বলল, "যা কইল্যা তা কী সাচা (সত্য) বাদশাজাদা?"

"নিশ্চয়।"

এবার একান্তই নিরুপায় দেখালো শঙ্খিনীকে। কাতর গলায় সে বলল, "তা হইলে তুমি হামারে বাঁচাও। তুমি ছাড়া হামার আর কেউ নাই। তুমি তো জানো না বাদশাজাদা, বড় ভুঁইয়া আসলেই আম্মা অরে জুলফিকার হামারে তার কাছে জোর কইর‍্যা পাঠাইব। তার আগে তুমি হামারে ইখান থিকা নিয়া চল। হামার জান-মান বাঁচাও।"

রঙ্গিনী বেদেনী; ক্ষণে ক্ষণে যার কটাক্ষে বিজুরী চমকায়, যার কৌতুকে তামাম দুনিয়ার পুরুষ দিশা হারিয়ে ফেলে, সেই বেদেনীর কী করুণ আত্মসমর্পণ। বিষকন্যার মুখেচোখেও তবে কান্নার ছায়া পড়ে! কী বিস্ময়! কী অভিনব! নাগমতী বেদের মেয়ের কান্না শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে জোয়ান হৃৎপিণ্ডটা কেমন যেন তোলপাড় করে উঠল মহব্বতের।

দূরের মাদারসারির ওপারে শ্রাবণের বেলাশেষ এখন নিভে আসছে। দিনের রঙ এখন ধূসর। হিজলবনের মাথা পেরিয়ে উড়ে চলেছে বালিহাসের ঝাক। খালের জলে নীলচে রঙের ছায়া নামছে। সামনের বাজে পোড়া তালগাছটার ন্যাড়া ডগায় যে পান্নারঙের মাছরাঙাটা বসে বসে অহরহ মাছের ধ্যান করে, সেটা কখন যেন উধাও হয়ে গিয়েছে। রয়নাবিবির খালটার দু'পাশে প্রাক্‌সন্ধ্যার ঝিম ঝিম ক্লান্তি ছড়িয়ে পড়েছে।

খালের পারের বেতবনে এক জোড়া ডাহুক তারস্বরে রসালাপ চালাচ্ছে। ডাহুকিনী কী এক মধুর প্রত্যাশায় পুরুষ পাখিটির মুখের দিকে তাকিয়ে কক্‌ কক্‌ করে ডেকে উঠল। একমুহূর্ত কী যেন ভাবল ডাহুকটি, তারপর ডানা ঝাপটিয়ে ডাহুকিনীকে সোহাগ করল।

বিমনা হয়ে ডাহুক-মিথুনের দিকে তাকিয়ে ছিল দু'জনেই। মহব্বত আর শঙ্খিনী। সহসা একটা শঙ্খচিলের চিৎকারে দু'জনের সংবিত ফিরে এলো। চকিত হয়ে মহব্বত আর শঙ্খিনী পরস্পরের দিকে তাকালো। তাকিয়েই চোখ

নামাল। তাদের মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে বেরিয়েছে।

মৃদু স্বরে শঙ্খিনী বলল, "উঁদিকে ডাহুকের সোহাগ কী দেখতে আছ গো বাদশাজাদা! তুমার শরম নাই। বেতরিবত মরদ কুথাকার?"

চট করে জিভের ডগায় কোন জবাব জুগিয়ে এলো না। কিছু সময় নিশ্চুপ বসে রইল মহব্বত। তারপর বলল, "কী জানি কইতে আছিলা বাইদ্যানী, আমার লগে তুমি যাইতে চাও। চরসোহাগীতে আমার মায়ের এক ফুফু আছে। আমার নানী হয়। তার কাছে তোমারে নিয়া যাইতে পারি। যাইবা?"

মহব্বতের কণ্ঠটা কী এক ক্ষ্যাপা আবেগে থর থর করে কেঁপে উঠল।

"নিচ্চয় যামু। এই বহর থিকা তুমি হামারে যেইখানে নিয়া যাইবা, হামি সেইখানেই যামু বাদশাজাদা।" তৃষিত চোখে মহব্বতের দিকে তাকালো শঙ্খিনী, "চরসোহাগীতে নিয়া তুমি হামারে ঘর দিবা বাদশাজাদা? ছোয়া দিবা? পিরিত-মহব্বত দিবা?"

"নিচ্চয় দিমু।"

"তবে আইজই যামু হামারা।"

"আইজই যামু।" পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে শঙ্খিনীর মুখের দিকে তাকালো মহব্বত। দৃষ্টিতে প্রতিজ্ঞা জ্বলছে।

হ্যাঁ, চরম প্রতিঘাতের সুযোগ এসেছে। বড় ভুঁইয়া সাহেব শঙ্খিনীর দিকে তাঁর থাবা বাড়িয়ে দিয়েছেন। যেমন করেই হোক সেই থাবায় শূন্যতা দিয়ে ফিরিয়ে দিতে হবে। বড় ভুঁইয়া এই বহরে আসার আগেই শঙ্খিনীকে নিয়ে চরসোহাগীর চরে উধাও হয়ে যাবে মহব্বত। আর কোনদিনই এই বেবাজিয়া বহর কী বড় ভুঁইয়া, কেউ তাদের নাগাল পাবে না। তার বান্দা জীবনকে অস্বীকার করবে মহব্বত। তার বেবাজিয়া জীবনকে এমটা জীর্ণ খোলসের মত ঝেড়ে ফেলবে শঙ্খিনী।

মনটা বিচিত্র খুশিতে ভরপুর হয়ে গেল মহব্বতের। গাঢ় গলায় সে বলল, "চল যাই বাইদ্যানী, অখনই হামরা যাই।" বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে উঠল সে।

"হিস্ বাদশাজাদা, চুপ! চুপ কর। এত জোরে চিল্লাইতে আছে! হায় রে বাজান! অ্যামনে কী আর যাওন যায়? রাজাসাহেব তা হইলে সড়কি দিয়া এফোঁড়-ওফোঁড় কইর‍্যা ফেলব না? জুলফিকার গায়ে সাপ ডইল্যা দিব।" মহব্বতের উত্তেজনাকে নিভিয়ে দিল শঙ্খিনী।

"তবে?" এবার মহব্বতের দু'চোখে সংশয় ফুটে বেরুল।

"তুমারে এট্টা কাম করতে হইব বাদশাজাদা।"

"কী কাম?"

"রাইতের আন্ধারে (অন্ধকারে) বিষকাটালীর পাতা খাইয়্যা মুখে ফেনা করবা, যেন সাপে কাটছে তুমারে—" বলতে বলতে মুখখানা মহব্বতের কানের মধ্যে গুঁজে দিল শঙ্খিনী। তারপর বাকী পরামর্শটুকু ফিস্ ফিস্ গলায়

ঢেলে দিল।

সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল মহব্বত, "ঠিক, ঠিক। এই বুদ্ধিটাই খাসা হইব।"

শঙ্খিনীও হাসল। সে হাসিতে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার, "এই কাম না করলে আর পালানো যাইব না বাদশাজাদা। শয়তানের বাচ্চারা চারদিক থিকা পাহারা বসাইয়্যা রাখছে একেবারে। কী বাদশাজাদা, হামার বুদ্ধিটা খাসা না?"

"হ বাইদ্যানী, জবর খাসা।" মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তারিফ করলো মহব্বত।

একটু পরেই ধানবনের উপর দিয়ে মহব্বতের কোষডিঙিটা রয়নাবিবির খালে গিয়ে নামল। রয়নাবিবির খালের দীর্ঘ জলরেখাটা অনেক দূরে একটা বঁড়শির মত বাঁক নিয়েছে। সেই বাঁকের আড়ালে একসময় ডিঙিসুদ্ধ মহব্বত অদৃশ্য হয়ে গেল। সে দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল শঙ্খিনী।

মহব্বত চলে যাবার খানিকটা পরে আবার এ নৌকায় এলো রাজাসাহেব। এই বেবাজিয়া বহরে অনেকগুলি বছর শঙ্খিনীর সঙ্গে সে কাটিয়ে দিয়েছে। তাদের জন্মই এই ভাসমান বেদে নৌকায়। জন্মের পর শিশু বয়সের দিনগুলি পেরিয়ে কৈশোর, কৈশোর পার হয়ে আজ তারা যৌবন পেয়েছে। মাঝখানে অনেক, অনেকগুলি মাত্রাছাড়া বেহিসাবী দিন। এই দিনগুলিতে খানিকটা উদ্দাম ভালবাসা আর দেহের বেপরোয়া সান্নিধ্য দিয়ে একটু একটু করে শঙ্খিনীর সমস্ত নারীমনটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল রাজাসাহেব। কিন্তু আজ তাকে নির্মমভাবে জীবন থেকে মুছে দিতে চাইছে শঙ্খিনী। এতকাল রাজাসাহেব ভেবেছে, শঙ্খিনীর জীবনে সে-ই একতম পুরুষ। কিন্তু আজ দ্বিতীয় পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে। মহব্বত শঙ্খিনীর দেহমন অস্থিমজ্জা স্নায়ু ইন্দ্রিয় আর চৈতন্যকে এই দু'টি দিনের মধ্যেই গ্রাস করে ফেলেছে। ভাবতে ভাবতে অস্থির হয়ে উঠল রাজাসাহেব। তার সমগ্র চেতনা নিতান্ত সঙ্গত কারণেই হিংস্র হয়ে উঠেছে।

শঙ্খিনীর পাশে অন্তরঙ্গ হয়ে বসলো রাজাসাহেব। তারপর কণ্ঠটাকে কোমল করার প্রাণান্ত চেষ্টা করলো, "হামরা বেবাজিয়া শঙ্খ। তুরে অনেকবার এই কথাটা হামি কইছি। নৌকাই হামাগো ঘর, নৌকাই হামাগো কবর। দেওয়াল আর ছাদ দেওয়া ঘরের ভাবনায় হামাগো গুণাহ্ লাগে বিষহরি আর খোদাতাল্লার গোসা হয়। তুই উই সব মতলব ছাড় শঙ্খ।"

তির্যক দৃষ্টিতে একবার রাজাসাহেবের দিকে তাকালো শঙ্খিনী তারপরেই দৃষ্টিটাকে ধানবনের দিকে সরিয়ে নিল।

রাজাসাহেব স্বরটাকে আরো মোলায়েম করল, "হামি তো আছি শঙ্খ হামি থাকতে বেবাজিয়া যুবতীর মনটারে বশ করব ঘরের মানুষে! না না ইটা হইব না শঙ্খ, কখনই হইব না। আর কারুরে হামি তুর ভাগ দিমু না।' শঙ্খিনীর একটা হাত দু'টি বিশাল থাবার মধ্যে জড়িয়ে ধরল রাজাসাহেব।

কোন কথা বলল না শঙ্খনী। এক ঝটকায় হাতখানা ছাড়িয়ে নিল শুধু। তার দু'চোখের ধক্ ধক্ মণিতে ঘৃণা জ্বলতে লাগল।

থর থর গলায় রাজাসাহেব বলল, "তুই হামারে এই কথাটা দে শঙ্খ, আর উই হারামজাদা বান্দাটার লগে মহব্বত করবি না।"

"তবে তুরে হামার গলার তাবিজ বানাইয়্যা ঝুলামু না কী রে ইবলিশ? যা, যা শয়তান।" গর্জন করে উঠল শঙ্খনী, "আ লো হামার সোনা, হামার বাদশাজাদার লগে মহব্বত করমু না! করমু তো। একশ' বার করমু। যা, যা ভাগ—"

শঙ্খনীর চোখেমুখে এতটুকু প্রশ্রয়ের চিহ্ন নেই।

হিংস্র ভঙ্গিতে পাটাতনের উপর উঠে দাঁড়াল রাজাসাহেব। তার দু'চোখ থেকে আক্রোশ ফেটে বেরুচ্ছে। দাঁতে দাঁত চেপে রাজাসাহেব বলল, "আইচ্ছা দেখা যাইব।"

"কী দেখবি?"

"কেমনে হামারে ছাইড়্যা ওই বান্দাটার লগে তুই পিরিত জমাইস?"

"দেখিস।" শঙ্খনীর দু'চোখ থেকে ফুলকি ঠিকরে বেরুচ্ছে।

বিশ

খানিকটা আগে রাজাসাহেব চলে গিয়েছে।

নৌকার পাটাতনে এখনও চুপচাপ বসে রয়েছে শঙ্খনী। তার দৃষ্টিটা উড়ন্ত বালিহাঁসের পাখায় পাখায় সওয়ার হয়ে দূরে, আরও দূরে উধাও হয়ে যাচ্ছে। একসময় বালিহাঁসের ঝাঁক হিজলবনের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বেলাশেষের আবছায়া রঙ লেগেছে আকাশে। কেমন এক বিষাদ নেমে এসেছে ধানবনে, রয়নাবিবির খালে আর বনমাদারের পাতায় পাতায়।

ওপাশ থেকে ঝাঁপ খুলে বাইরে এলো আসমানী।

কাল বড় ভুঁইয়ার উঠানে বসে রয়ানি গান গায় নি শঙ্খনী। তাই অপমানে আক্রোশে মেজাজটা হিংস্র হয়ে গিয়েছিল আসমানীর। জুলফিকারকে দিয়ে ভয়ঙ্কর কিছু একটা করেও ফেলতে পারত সে। কিন্তু তার আগেই ভুঁইয়া সাহেব মুঠির মধ্যে এক রাশ কাঁচা টাকা গুঁজে দিয়েছিলেন; শঙ্খনীর নধর যৌবনটাকে ভোগ করার জন্য বায়না! কাঁচা টাকার মধুর বাজনা আসমানীর মন থেকে সব অপমান, সব আক্রোশকে মুছে দিয়েছিল। মন-মেজাজ একটু একটু করে প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল।

সেই ভুঁইয়া সাহেব আজ আসবেন তাদের বেবাজিয়া বহরে।

অতএব, অতএব বাইরে বেরিয়ে শঙ্খনীর পাশে বসে পড়লো আসমানী। তারপর তার পিঠের উপর একখানা হাত বিছিয়ে দিল। সস্নেহ গলায় আসমানী বলল, "কী আর করবি লো শঙ্খনী! হামরা বেবাজিয়া। তুর

অভাবটা কী লো মাগী ? সোয়ামী চাই ? তুর লগে হামি রাজাসাহেবের শাদী দিমু। ছানাপোনা চাই ? তাও হইব। ক্যান ? হামাগো বহরে কারো ছোয়া (ছেলে) হয় না ? তা হইলে তুগো পাইলাম কুথায় ?"

কোন জবাবই দিল না শঙ্খিনী। শুধু ভয়ানক ভ্রূকুটি ফুটিয়ে আসমানীর দিকে তাকালো একবার। তারপর দৃষ্টিটাকে অনেক, অনেক দূরের শূন্য আসমানটার দিকে সরিয়ে নিয়ে গেল।

একটু সময় নিশ্চুপ বসে রইল আসমানী। তারপর সহসাই ব্যস্ত হয়ে উঠল সে, "আহা-হা তুর চুলে দেখি একেবারেই ত্যাল নাই।"

সঙ্গে সঙ্গে ছই-এর মধ্যে থেকে একখানা গন্ধ তেলের শিশি নিয়ে এলো আসমানী। শঙ্খিনীর শিথিল কবরীটা খুলে এলোমেলো রুক্ষ চুলে খানিকটা তেল ঢেলে দিল। তারপর নিবিড় মমতায় দু'হাত দিয়ে সেই তেল মাথায়, মুখে, গালে মেখে দিতে লাগলো।

মধুর গলায় আসমানী বলল, "আয়, আয় শঙ্খিনী। সারাটা দিন ছান (স্নান) করস নাই। এমুন সোন্দর মুখখান একেবারে শুকাইয়া গেছে। আয় আয় হামার লগে—"

পরিষ্কার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রসিয়ে রসিয়ে জবাই করার জন্য ছুরি শানাতে শুরু করেছে আসমানী। যতক্ষণ আঘাতটা একেবারে ঘাড়ের উপর এসে না পড়ে, ততক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকবে শঙ্খিনী। একটি কথাও বলবে না। আসমানীর এই উপাদেয় সোহাগগুলির পিছনে যে ভয়ঙ্কর জানোয়ারটা ওত পেতে রয়েছে, কখন সেটা ঝাঁপিয়ে পড়বে ! ভাবতে লাগলো শঙ্খিনী।

এক সময় আসমানীর সঙ্গে খালের পারে নেমে এলো শঙ্খিনী।

খেজুর-গুঁড়ি দিয়ে ঘাটলা বানানো রয়েছে। নাগবপুর গ্রামেব কৃষাণবৌরা জল তুলতে আসে। পরশু রাত্তিরে বড় মহাজনের ছেলের জলসই হয়েছে এই ঘাটেই। খেজুর-গুঁড়ির উপর জাঁকিয়ে বসলো শঙ্খিনী। হাতের মুঠোয় খানিকটা সাজিমাটি নিয়ে এলো আসমানী। শঙ্খিনীর সুঠাম দেহ থেকে একটু একটু করে কাপড়-কাঁচুলির আবরণ খসিয়ে ধীরে ধীরে মেজে দিতে লাগলো সে।

কেন যেন শঙ্খিনীর ভাবতে ভাল লাগছে বড় মহাজনের ছেলের মত আজ এই খালের ঘাটে তারও জলসই। ভাবতে ভাবতে মধুর আমোদে মনটা ভরপুর হয়ে গেল নাগমতী বেদেনীর।

অনেকটা সময় ধরে মাজাঘষার পালা চললো।

চারপাশে বেলাশেষের ছায়া-ছায়া রঙ আরো গাঢ় হচ্ছে। ওদিকে বিষকচুর বনে উৎকট স্বরে ব্যাঙ ডাকছে। আকাশে মেঘের পরে মেঘ জমেছে।

আসমানী বলল, "অনেক হইছে। যা শঙ্খ, খালের জলে ডুব দিয়া আয়। আবার রাইত হইয়া আসতে আছে।"

স্নানের পালা সারা হবার পর আবার বহরে ফিরে এসেছে শঙ্খিনী আর আসমানী। এই ক'টা দিন সমস্ত শরীরে, স্নায়ুতে স্নায়ুতে যে অবসাদ, যে

ক্লান্তি জমেছিল, এই মুহূর্তে তা মুছে গিয়েছে। দেহটা অপরিসীম হাল্কা হয়ে গিয়েছে। একটা ফুরফুরে বখারি পাখির মত নিজেকে লঘুপক্ষ মনে হচ্ছে।

বেবাজিয়া বহরের নৌকায় হারিকেন জ্বালানো হয়েছে।

শঙ্খিনীকে সঙ্গে করে মাঝখানের নৌকায় নিয়ে এলো আসমানী। তার কণ্ঠ থেকে স্নেহ ঝরলো, "আয়, আয় শঙ্খ ; তুরে একখান নয়া শাড়ি দিমু হামি। আগে তুই শাড়িটা পইর‍্যা নে। তার পরে তুর চুল বাইন্ধ্যা দিমু।"

একটা জীর্ণ স্টীলের বাক্স থেকে একখানা নতুন পাতাবাহার শাড়ি বের করলো আসমানী। শঙ্খিনীর হাতে গুঁজে দয়ে সে বলল, "কাপড়টা পর। বৌ সাজ। তুরে জবর খাসা মানাইব। একেবারে ডানাকাটা হুরী হইয়্যা যাবি তুই।"

শাড়িখানার দু'পাশে পাতারঙের পাড়। খোলটা ভারি মোলায়েম। সুন্দর ভঙ্গিমায় শরীরের চারপাশে শাড়িটাকে জড়িয়ে নিল শঙ্খিনী। অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল আসমানী। মর্মভেদ করে একটা দীর্ঘশ্বাস পডলো তার। আসমানী বলল, "তুর লাখান (মত) বয়সে সাজলে হামারে তুর মতই মানাইত। গঞ্জে-বন্দরে কত পুরুষ মানুষ হামারে দেইখ্যা ভিরমি খাইছে!" কেমন এক বেদনার আভাস রয়েছে আসমানীর গলায়, "আইজ আর সেই দিন হামার নাই। এখন তুগোই দিন। যার যৈবন আছে, তার সব আছে।"

এবার খিল খিল শব্দ করে হেসে উঠল শঙ্খিনী, "ঠিক, ঠিক কথাই আম্মা। অখনও তুমার সুরৎ (সৌন্দর্য) কিছু কমতি আছে না কী? হামার মাথাটাই ক্যামুন ঘুরপাক খায় তুমারে দেখলে। একেবারে জলপেরী তুমি!"

কোন কথা বলল না আসমানী। একবার সন্দিগ্ধ চোখে শঙ্খিনীর দিকে তাকিয়েই পাটাতনের ওপর থেকে একটা হাতির দাঁতের চিরুনি তুলে নিল। অনেক কাল আগে এটা গিরিগঞ্জের এক সাহাবাড়ি থেকে হাতিয়ে এনেছিল যোশেফ। শঙ্খিনীর অতল চুলের মধ্যে চিরুনিটা ডুবিয়ে দিল আসমানী।

তন্ময় হয়ে শঙ্খিনীর চুলে একটা তুঙ্গ খোঁপা বানাতে বানাতে আচমকা আসমানী বলে ফেলল, "কী সোন্দর তুর মুখ চোখ, ক্যামুন চুলের গোছা, ক্যামুন শরীলের (শরীরের) গড়ন। হামরা যদি বেবাজিয়া না হইতাম, তা হইলে তুরে শাদী করতে কত ভুঁইয়া-মোল্লা-মছল্লি আসত, তার ইয়ত্তা নাই। তুর লেইগ্যা বউ-পণ নিতাম বিশ কুড়ি ট্যাকা।"

চকিত হয়ে উঠল শঙ্খিনী। তার মনে পড়ল, কাল দফাদারের কাছে নিয়ে যাবার আগে আম্মা আসমানী তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাকে শাদী দেবে। স্বামীর কামনা আর সন্তানের বাসনাকে চরিতার্থ করবে। সাঁ করে ঘুরে বসলো শঙ্খিনী। ততক্ষণে খোঁপা বানানো শেষ হয়ে গিয়েছে।

শঙ্খিনী তাকালো। আশ্চর্য! আসমানীর ঘোলাটে চোখ দু'টি, পাটের ফেঁসোর মত একমাথা জটিল চুল, কী নিরোম ভ্রূ দু'টি, কী অজস্র রেখাময়

মুখখানা, কী গালের কুঞ্চিত মাংস এখন আর ভয়ংকর মনে হচ্ছে না। কী এক ভোজবাজিতে আসমানীকে বড়ই মমতাময়ী মনে হচ্ছে।

ব্যগ্র গলায় শঙ্খনী বলল, "আম্মা, তুমি হামারে কাইল দফাদারের কাছে নিয়া যাওনের আগে কইছিলা—হামারে শাদী দিবা, ঘর দিবা। এইবার দাও। তুমি ইট্টু, ইচ্ছা করলেই হামি সব পাই আম্মা।" শঙ্খনীর দু'চোখে করুণ দৃষ্টি ফুটে বেরিয়েছে।

এখন আর উপায় নেই। কী করতে কী যে ঘটে গেল! আসমানী ভাবল, একটা অসতর্ক মুহূর্তে খানিকটা দুর্বলতা দেখিয়ে কী ভুলই না করল? এর জন্য অনেকটা খেসারত দিতে হবে। শঙ্খনীর এই অস্থির প্রার্থনার মুখোমুখি বসে থাকার কোন জোরই পাচ্ছে না আসমানী। এতটুকু নির্মম হবার সামর্থ্য মনের কোথায়ও হাতড়ে পেল না বুড়ি যাযাবরী। আচমকা ক্ষিপ্র দু'টি পায়ের ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। খানিকটা সময়ের জন্য শঙ্খনীর সামনে থেকে তাকে পালিয়ে যেতে হবে। নতুন করে শঙ্খনীর মুখোমুখি হবার জন্য তার মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। ক্ষীণ গলায় আসমানী বলল, "তুই এট্টু বস্ শঙ্খ, হামি আসতে আছি।"

শঙ্খনীর দু'টি করুণ চোখের সামনে থেকে ত্রস্তে সরে গেল আসমানী।

ইতিমধ্যে অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে।

আবার এলো আসমানী। ডান হাতের মুঠিতে একটা রাঙা মাটির মালসা। সেই মালসায় মিঠুরি রয়েছে। বাঁ হাতে একটা দিশী মদের বোতল। কর্কশ গলায় আসমানী বলল, "নে শঙ্খ, খা।"

গলার স্বরে চমকে উঠল শঙ্খনী। একটু আগের সেই সস্নেহ স্বরটা কী আশ্চর্য ভাবেই না বদলে গিয়েছে আসমানীর। বিস্মিত দৃষ্টিতে আসমানীর দিকে তাকিয়ে রইল শঙ্খনী। অনেকটা সময় ধরে চোখ দু'টি নিষ্পলক হয়ে রইল তার। চমকের ঘোরাটা কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছে না শঙ্খনী।

আসমানীর গলাটা এবার নিষ্ঠুর হয়ে উঠল, "খা শঙ্খ, শিগ্‌গীর খা। বদখত মেজাজটারে শরীফ বানা।"

"ক্যান?" শঙ্খনীর ফিস্ ফিস্ গলাটা থেকে শব্দটা ছিটকে বেরুল।

"ক্যান আবার? আইজ তুর শাদী যে!" গলার সরু সরু শিরাগুলি বোড়া সাপের মত ফুলিয়ে ফুলিয়ে হেসে উঠল আসমানী। শঙ্খনীর মনে হলো, সে হাসিটা একটা ধারালো ছুরির ফলা হয়ে তার পাঁজরটাকে ফালা ফালা করে দিচ্ছে।

আসমানীর ঘোলাটে চোখ দু'টি ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠলো, "এট্টু পরেই বড় ভুঁইয়া আসবো। আরো দুই কুড়ি ট্যাকা মিলবো।"

পরম তৃপ্তির আনন্দে আসমানীর চোখ দু'টি ধক্ ধক্ জ্বলেই চলেছে। একটু আগে নিজের অজান্তে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল সে। এই মুহূর্তে, এই নির্মমতার মধ্যে, নিশ্চয়ই সেই দুর্বল মুহূর্তটির কবর হয়ে

গিয়েছে। ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা আমোদিত হলো আসমানীর।

শঙ্খিনীর মুখ থেকে পলকের মধ্যে সমস্ত রক্ত সরে গেল। আসমানী নামে এক কালনাগিনীর বিষ-নিঃশ্বাসে সমস্ত দেহমন জর্জরিত হয়ে উঠল তার। এই বিষ তোলার মন্ত্র জানা নেই নাগমতী শঙ্খিনীর।

শঙ্খিনী ভুলে গেল, একটু আগেই মহব্বতের সঙ্গে গোপন সলা-পরামর্শ হয়ে গিয়েছে তার। আসন্ন মৃত্যু দেখে যেমন করে একটা নিরীহ প্রাণী আর্তনাদ করে ওঠে, ঠিক তেমনি করেই চিৎকার করলো শঙ্খিনী, "হামি পারুম না, হামি উ সব আর পারুম না।"

রাত্রির অন্ধকারে একটা নিশাচর সরীসৃপের মত তাদের বহরে আসবেন বড় ভুঁইয়া। তাকে দলে পিষে, ইচ্ছামত ভোগ করে, পরিতৃপ্ত হয়ে. এতগুলি টাকার সুদ হিসেব করে আদায় করে ফিরে যাবেন তিনি। একটা রক্তমাংস আর হাড়ের পিণ্ডের মত অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকবে শঙ্খিনী। শুধু তার রক্তের কণায় কণায় গ্লানি আর ক্লেদের বীজাণু কিলবিল করতে থাকবে।

সমস্ত চেতনার মধ্যে কান্না ফুঁসে উঠল, "হামি পারুম না, কিছুতেই হামি পারুম না আম্মা।"

এক মুহূর্ত ক্রুর চোখে তাকিয়ে রইল আসমানী। তারপর প্রখর ব্যঙ্গে তার গলাটা সাপের শিসের মত হিস্ হিস্ করে উঠল, "পারবি না! পারবি না তো খাবি কী? পারবি না! তুর সাত বাজানে পারবো! তুর নানী পারবো! আর তুই তো সেই দিনের ছাও। বড় ভুঁইয়া আসবো। নিজেরে তৈয়ার রাখ্ মাগী।"

একটু পরেই ছই-এর গর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেল আসমানী।

চল সজনী, যাই গো নদীয়ায়—
সাপের বিষে যেমন তেমন,
প্রেমের বিষে দুগুণ ধায়।
আর গৌরাঙ্গ ভুজঙ্গ হইয়ে
দংশিয়াছে আমার গায়।

খালের দূর বাঁক থেকে গানের সুরটা ভেসে আসছিল। একটু পরেই একটা হাটুরে নৌকা এসে ভিড়ল বেদে-বহরের গায়ে। সেই নৌকায় বসে রয়েছে গানের মানুষটা। সকালের সেই গোকুল বৈরাগী।

গোকুলের গান থেমে গিয়েছে। কিন্তু সারিন্দাটা প্রসন্ন গমকে মৃদু মৃদু বেজে চলেছে। আর সেই বাজনা অন্ধকার রাত্রিতে সুরের ফুল্‌কি হয়ে ফুটে ফুটে উঠছে।

নৌকার পাটাতনে চুপচাপ বসে ছিল শঙ্খিনী। মনটা তার উদাস হয়ে গিয়েছিল। একটু আগেই আসমানী বলে গিয়েছে, বড় ভুঁইয়া আসবেন। তাই প্রস্তুত থাকতে হবে। অর্থাৎ এই দেহের রূপ আর যৌবনের পসরাটি বড় ভুঁইয়ার সামনে তুলে ধরতে হবে। তাঁর লালসার আগুনে নিজেকে সঁপে

দিতে হবে। এতক্ষণ ভাবছিল শঙ্খনী। ভাবতে ভাবতে কখন যেন দেহের মধ্যে সেই ভাবনার যন্ত্রটি একেবারেই বিকল হয়ে গিয়েছে। আর কিছুই ভাবতে পারছে না সে। এই বেদে-বহর, আসমানী, বড় ভুঁইয়া—সজ্ঞান মনের মধ্যে কোন কিছুর আর পৃথক আকার নেই। সব মিলিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছে।

তাই মন উদাস করে বসেছিল শঙ্খনী। আর সেই উদাস মনের তারে তারে গোকুল বৈরাগীর সারিন্দার বিবাগী বাজনাটা যেন টুং-টাং বাজতে লাগলো।

শঙ্খনী যে নৌকায় বসে রয়েছে, ঠিক তার পাশের নৌকার গায়ে গোকুলের নৌকাটা ভিড়েছে।

এবার গোকুলের সাড়া পাওয়া গেল, "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে মুরারে। কই গো বাইদ্যা দিদিরা ?"

এ নৌকার পাটাতন থেকে শঙ্খনী পরিষ্কার বুঝতে পারছে, পাশের নৌকায় আসমানীরা হল্লা করে উঠল, "কী বৈরাগী ঠাকুর, সকাল বেলায় একবার না আসছিলা ! দিনে এক বাড়িতে বার বার ভিক্ষা কর ?"

সারিন্দার আলাপ পেয়ে আতরজান, গোলাপী আর ডহরবিবিরা এসে ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আতরজান বলল, "কী বৈরাগী ঠাকুর, আবার কোন্ মতলবে আসছ ?"

খিল খিল হাসিতে জলতরঙ্গ বেজে উঠল। ডহরবিবি হাসতে হাসতে পাটাতনের ওপর গড়িয়ে পড়ল, "হামি জানি লো আতর—"

আতরজান বলল, "কী জানস তুই, কী লো হাসন পেত্নী ?"

"উই বৈরাগী ঠাকুরের মতলবটা হামি জানি। শঙ্খর লগে কণ্ঠীবদলের মতলবে আসছে শয়তানটা। হিঃ-হিঃ-হিঃ—" লহরে লহরে হেসে উঠল ডহরবিবি।

বিব্রত গলায় গোকুল বলল, "কী কথা যে কও বাইদ্যা বইন। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ।"

গোলাপী বলল, "বেশি হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ কইও না। ঐ যে কথায় আছে না—" বলতে বলতে ছড়া কাটলো গোলাপী :

হরে কৃষ্ণ, হরে রাম—
রাইত পোহাইলে ট্যাকার কাম।
ট্যাকা কৃষ্ণ বড় কৃষ্ণ আধুলি বলরাম।
সিকি দুয়ানি হইল শ্রীদাম সুদাম।

সমস্বরে হেসে উঠল বেদেনীরা !

ছব্রখান গলায় গোকুল বৈরাগী বলল, "তোমরা আইজ বহর ছাড়বা এইখান থিকা, কী বাইদ্যা দিদিরা ?"

এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল আসমানী। সে বলল, "হ, ভোর রাইতে হামরা বহর ছাড়ুম। তিন দিন হইয়া গেল, তিন দিনের বেশী একখানে হামাগো

থাকনের নিয়ম তো নাই। কিন্তুক হামাগো বহর ছাড়নের লগে তুমার কোন্ কাম বৈরাগী ঠাকুর ?”

“কাম আছে। সেই জন্যেই তো ইদিলপুরের হাট থিকা এই হাটুরে নৌকা ধইর‍্যা তোমাগো বহরে আসলাম বুড়ি বাইদ্যানী। আমারে মেঘনা নদীর পারে সুজনগঞ্জের বন্দরে এট্টু নামাইয়া দিয়া যাইও। নিবা আমারে তোমাগো বহরে ?”

আসমানী বলল, “নিমু, নিচ্চয় নিমু। নৌকায় উইঠ্যা আসো বৈরাগী ঠাকুর।”

“আসো, আসো।” চারপাশ থেকে বেদেনীরা শোরগোল করে উঠল।

হাটুরে নৌকাটা থেকে বেবাজিয়া বহরে উঠে এলো গোকুল বৈরাগী।

এ নৌকার পাটাতন থেকে সমস্ত কিছুই দেখলো, শুনলো আর বুঝলো শঙ্খিনী। কিন্তু গোকুল বৈরাগীর কাছে এসে বসবার কোন সাড়াই জাগছে না মন থেকে। কোন উৎসাহই পাচ্ছে না নাগমতী বেদেনী। একবারেই নিস্পৃহ হয়ে গিয়েছে সে। এতটুকু ভাবান্তর হচ্ছে না তার।

আকাশভরা অন্ধকারের নীচে চুপচাপ বসে রইল শঙ্খিনী।

একুশ

বিকেল থেকেই মেজাজটা বড় খুশি খুশি হয়ে রয়েছে বড় ভুঁইয়া সাহেবের। ফুর্তির আমোদে মৃদু মৃদু শিস্ দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দাড়ির প্রান্ত পরিপাটি করছেন। গোঁফ দু'টি পাকিয়ে পাকিয়ে আদর করছেন। মেয়েদের মত হাতের পাতায় মেহেদির রঙ মেখেছেন। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সেই রঙের জলুস দেখছেন বার বার। আর দেখতে দেখতে মোটা ঠোঁটে খুশির আশনাই জ্বলে জ্বলে উঠছে।

বিকেল পেরিয়ে সন্ধে। আর সেই সন্ধে থেকেই সাজসজ্জার পালা শুরু হয়েছে।

ঘরের মধ্যে দু' দুটো হ্যাজাক জ্বলছে। ঝকঝকে আলোতে শ্রাবণের সব অন্ধকার বাইরে ফেরারী হয়েছে। সামনে বিশাল একখানা আয়না নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন খুবসুরত বাঁদী। একটা বান্দা পায়ের নাগরা আয়নার মত চকচকে করে তোলার পুণ্য কাজে ধ্যানজ্ঞান সব সঁপে দিয়েছে। জিভ দিয়ে নাগরা জুতোর চামড়া ভিজিয়ে সামানে বুরুশ চালাচ্ছে বান্দাটা। একজন কাবুলি কুর্তার ফিতে বাঁধছে। আর একটি বান্দা জরিদার পাজামাটা সামলাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। সব মিলিয়ে রীতিমত একটা এলাহি আয়োজন।

ভাবগতিক দেখে মনে হয়, যেন দিগ্বিজয়ে বেরুবার আগে প্রস্তুত হচ্ছেন মধ্যযুগের নবাবজাদা। কিন্তু কালটা মধ্যযুগও নয় আর নবাবজাদাও স্বয়ং আলাউদ্দীন খিলজী কী চেঙ্গিস খাঁও নন। ব্যক্তিটি নেহাতই নাগরপুর গ্রামের

বড় ভুঁইয়া সাহেব। নৌবহরের বদলে একখানা কাঁঠাল কাঠের চারমাল্লাই ভাসালেই তাঁর চলবে। অনেক দূরের পথ নয়, রয়নাবিবির খালে বেবাজিয়া বহরটি পর্যন্ত তাঁর দৌড়। সড়কি ঢালের ঝনঝনা নয়, মাত্র কয়েকটা কাঁচা টাকার বাজনা দিয়ে তাঁর দিগ্বিজয়ের সাধ। কোন ভূখণ্ড জয়ের বাসনা নেই বড় ভুঁইয়ার মনে, একটি খরযৌবনা বেদেনীর দেহ আজ রাতটির জন্য একান্ত করে পেলেই তাঁর চলবে। শঙ্খিনী নামে একপিণ্ড সুন্দর নারীমাংসকে লালসার আগুনে ঝলসে ঝলসে একটু একটু করে স্বাদ নেবেন বড় ভুঁইয়া সাহেব।

অন্দর মহলে তিন তিনটি বিবি সশরীরে বর্তমান। তাদের ইন্দ্রিয়গুলি বড় প্রখর। কেমন করে যেন তারা টের পেয়েছে, ভুঁইয়া সাহেব একটি বেদেনী-দেহের টানের তাড়নায় বেবাজিয়া বহরে যাবেন। টের পেয়েই সাজঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল তিনজনে।

পয়লা বিবি জাফরানি বোরখা খুলে বেসর ঝাঁকাল, "তোমার মতলব কী? বেবাজিয়া মাগীর কাছেই যদি যাইবা, তবে আমাগো শাদী করছিলা ক্যান? জবাব দাও।"

দোসরা বিবিটি কোমরে পৈছা দুলিয়ে চিৎকার করে উঠল, "সাবধান, উই বেবাজিয়া পেত্নীর কাছে যাইতে পারবা না।"

তেসরা বিবি তীক্ষ্ম গলায় গর্জাল, "উই বেবাজিয়া বহরে যাওনের আগে মোহরানার কাগজ আন। আগে আমাগো তালাক দাও।"

গুনগুনিয়ে খুশির একটি শিসকে জিভের ওপর কাঁপাচ্ছিলেন ভুঁইয়া সাহেব। বিবিদের দেখে শিস বন্ধ হলো। শরিফ মেজাজটা বদখত হয়ে গেল। তবু আশ্চর্য শান্ত গলায় ভুঁইয়া সাহেব বললেন, "তাই দিমু। তোগো সবাইরে তালাকই দিতে হইব। যা, এখন ভাগ্।"

"কি, তালাক দিবা!" গর্জে উঠে তিনটি বিবিই ভুঁইয়া সাহেবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারপর কেঁদে, কঁকিয়ে, হল্লা বাধিয়ে, কামড়ে আঁচড়ে বড় ভুঁইয়াকে ফালা ফালা করে একটা প্রলয় বাধিয়ে ফেলল।

বড় ভুঁইয়া এবার হুঙ্কার ছাড়লেন, "এই বান্দারা, বিবি তিনটারে ধানের গুদামে নিয়া তালা দিয়া রাখ্।"

বাইরে থেকে কয়েকজন বান্দা ছুটে এলো ঘরে। পলকপাতের মধ্যে বারোজন বিবি তিনটাকে টেনে-হিঁচড়ে ধানের গুদামে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দিল।

আবার নিশ্চিন্ত মনে শিস্ দিতে লাগলেন বড় ভুঁইয়া। নিরুদ্বেগ শান্তিতে সাজগোজের পালা চলতে লাগলো।

জরিদার পাজামা, শেরওয়ানী, মাথায় ঝুটা মুক্তা বসানো নানার আমলের লাল টুপি। পায়ে ঝকঝকে নাগরা। একটা আস্ত আতরের শিশিই ঢেলেছেন চাপদাড়িতে। চোখেব কোলে সুর্মার স্থূল রেখা। বিকেল থেকে এ পর্যন্ত তিন বোতল বিলিতি মদ গিলেছেন। সুরারসের প্রভাবে আদি রঙ জ্বলে গিয়ে চোখ দুটো রক্তাভ দেখাচ্ছে। নেশাটা শঙ্খিনীর যৌবনের কল্পনায় মিশে

একটা অজগরের মত মগজের মধ্যে পাক খেতে লাগলো। অস্থির হয়ে উঠলেন বড় ভুঁইয়া।

ধানের গুদাম থেকে ভয়ঙ্কর শব্দ আসছে। তিনটি বিবি দেওয়াল আর কপাটের ওপর সমানে ঝাপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, দাপাদাপি করছে, মাতামাতি বাধিয়েছে।

শিস থামিয়ে চকিত হলেন বড় ভুঁইয়া। তবে কী ধানের গুদাম ভেঙে বিবিরা বেরিয়ে আসবে ? বেবাজিয়া বহরে যাওয়ার পথটি আটকে দাঁড়াবে ? একটি মাত্র মুহূর্ত। তারপরেই আশ্বস্ত হলেন বড় ভুঁইয়া সাহেব। মনে পড়ল, মাসখানেক আগে বেশ মজবুত টিন আর গরান কাঠ দিয়ে তিনি গুদামটা বানিয়েছেন। অন্ততঃ অন্দরমহলের বিবিদের ফুলের শরীরে এমন তাগদ নেই, যা দিয়ে গুদাম ভাঙা যায়। অতি বিচক্ষণ মানুষ ভুঁইয়া সাহেব। নিজেই নিজেকে তারিফ করলেন। তারপর অখণ্ড মনোযোগে বোতাম আটকাতে লাগলেন।

কিন্তু দিগ্বিজয়ে যাওয়ার আগেই অঘটন ঘটলো।

একটা ছোকরা বান্দা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের মধ্যে এসে বললো, “বড় ভুঁইয়া ছাহাব, এক্কেবারে সর্বনাশ হইয়্যা গেছে।”

লাল চোখ দুটো তুললেন বড় ভুঁইয়া। সেই চোখের ওপর একজোড়া ভ্রূ কাঁকড়া বিছার মত বেঁকে গেল। বড় ভুঁইয়া বললেন, “কী আবার হইল ? কী রে শয়তানের বাচ্চা ?”

“মহব্বত ভাইরে সাপ কাটছে।” প্রবল আতঙ্কে ছোকরা বান্দাটার বুকখানা দ্রুততালে ওঠানামা করছে।

লাল চোখ দুটো ধক্ ধক্ জ্বলতে লাগলো ভুঁইয়া সাহেবের। মনে হলো, আগ্নেয় চোখ থেকে ভীষণ বিরক্তি ঠিকরে বেরুচ্ছে।

বর্ষার রাতের আয়ু অনেকটা বেড়েছে। এর মধ্যেই সমস্ত নাগরপুর গ্রামখানা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে এক টুকরো ফ্যাকাশে চাঁদ উঁকি দিয়েছে। কয়েকটি বিবর্ণ তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়ালেন বড় ভুঁইয়া সাহেব। পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে, তাঁরই অন্দর মহলের উঠানে কারা যেন শোরগোল বাধিয়ে দিয়েছে।

একটু পরেই যুগীপাড়া, মুধাপাড়া, ধাওয়া আর কামারদের তল্লাট—গ্রামের সব কিনার থেকেই হল্লা ভেসে আসতে শুরু করল। ইতিমধ্যে আতঙ্কিত কণ্ঠের ঢেউ-এ ঢেউ-এ খবরটা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে, মহব্বতরে সাপে কাটছে। হায় মা বিষহরি ! সবই তোমার মর্জি।”

কান খাড়া করে সমস্ত কিছুই শুনলেন বড় ভুঁইয়া।

ছোকরা বান্দাটা বলল, “এখন কী করুম ভুঁইয়া ছাহাব ?”

গর্জন করে উঠলেন ভুঁইয়া সাহেব, “চুপ বান্দীর বাচ্চা বান্দা। একেবারে জানে শ্যাষ কইরা ফেলুম।”

অন্যদিন হলে এক লাফে উঠানে গিয়ে নামত বান্দাটি। কিন্তু এই মুহূর্তটি একেবারেই আলাদা। এই মুহূর্তটির ওপর মহব্বতের মরা বাঁচার বরাত দুলছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নির্ভয় গলায় বান্দাটি বলল, "একটা কিছু ব্যবস্থা না করলে মহব্বত ভাইরে আর বাঁচানই যাইব না।"

নিজের দিকে একবার তাকালেন বড় ভুঁইয়া। এত সাজ-সজ্জা, আতর-মেহেদি-সুর্মার এই ঢালাও উৎসব, সন্ধে থেকে সাজগোজের পেছনে এত মেহনত, দিলভরা এত ফুর্তি—সব যেন একটা ফাটা ফানুসের মত চুপসে গেল। সব বরবাদ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আক্রোশ পড়ল ছোকরা বান্দাটার ওপর। এই শয়তানটাই তো বেয়াড়া দুর্ঘটনার খবর এনে খুশি খুশি মেজাজটাকে একেবারে বিস্বাদ করে দিয়েছে।

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন বড় ভুঁইয়া, "যা ঐ বেবাজিয়া মাগীগো ডাক দিয়া আন। ঝাড়ফুঁক করুক। বিষ নামাউক। মহব্বত ইবলিশটারে ইট্টু পরে সাপে কামড় দিলে কোরান শরিফ কী বদখত হইয়া যাইত? মহব্বতটার যেমুন আক্কেল নাই, সাপটারও তেমুন নাই। সাপে কাটনের আর সময় পাইল না!"

সমানে গজরাতে লাগলেন বড় ভুঁইয়া সাহেব।

একটু পরেই রয়নাবিবির খালে বৈঠার ছপ্ ছপ্ আওয়াজ উঠল। ভুঁইয়া বাড়ির তিনজন বান্দা বেবাজিয়া বহরে চলেছে।

সমস্ত নাগরপুর গ্রামখানা বর্ষার ঘুম ঝেড়ে জেগে উঠেছে। ধানবন চিরে চিরে অজস্র কোষাডিঙি এগিয়ে আসছে ভুঁইয়া বাড়ির দিকে। কেউ হারিকেন জ্বালিয়ে এসেছে, কেউ পাটকাঠির মশাল। আলোয় আলোয় শ্রাবণ-রাত্রির অন্ধকার চকিত হয়ে উঠেছে। প্রচুর হল্লা, প্রচণ্ড শোরগোল। নানান গলায় নানান প্রশ্ন।

একজন বলল, "এমন সব্বনাশ ক্যামনে হইল?"

"কোন্ জাতের সাপে কাটলো?"

"বিষ উঠেছে কতখানি?"

সকলে ভীরু কণ্ঠে শুধু জিজ্ঞাসাই করছে। জবাব দেবার কেউ নেই। রয়নাবিবির খালটা আর দু পাশের জলেডোবা ধানক্ষেত নানান মানুষের কোলাহলে উচ্চকিত হয়ে উঠছে। অবিরাম জলকাটার শব্দ শোনা যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে চারপাশ থেকে দুর্নিরীক্ষ্য আকাশের দিকে চিৎকার উঠে যাচ্ছে, "জয় মা বিষহরি! জয় মা। সবই তোমার মর্জি মা।"

"জয় মা মনসা, এই দুনিয়াদারী বাঁচাও। দুধকলা দিয়ে পূজা মানলাম।"

ভুঁইয়া বাড়ির ঘাটলায় নৌকা ভিড়িয়ে সকলে পাড়ের মাটিতে উঠে এলো। এই মুহূর্তে সমস্ত বিভেদ, সকল বৈষম্য আর বিসংবাদ একপাশে ছুঁড়ে ফেলে পাশাপাশি এসে দাঁড়াল জলবাঙলার মানুষেরা। এখানে কুল-শীল, জাতি-গোত্রের প্রশ্ন নেই। হিন্দু-মুসলমানের বাছবিচার নেই। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একবিন্দু-অমৃতের জন্য, একটি সঞ্জীবনী মন্ত্রের জন্য হাত বাড়িয়ে

দিয়েছে সকল মানুষ।

"জয় মা বিষহরি।"

"জয় মা মনসা।"

অন্দর মহলের উঠানে এসে জড় হয়েছে মানুষগুলো। হারিকেন, কুপী আর মশালের আলোতে অন্দর মহলটা যেন দিনমান হয়ে উঠেছে।

উঠানের মাঝখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে মহব্বতকে। তার গালের দু'কষ বেয়ে নীল রঙের ফেনা ঝরছে।

কোষডিঙিটা বেদেবহরে ভিড়িয়ে একটি বান্দা চেঁচিয়ে উঠল, "বাইদ্যা দিদিরা, শিগ্‌গীর বাইর হও।"

বাইরের পাটাতনে এসে দাঁড়াল আসমানী, "কী হইছে?"

"আমরা ভুঁইয়া বাড়ির বান্দা। মহব্বত ভাইরে সাপে কাটছে। শিগ্‌গীর আসো বুড়ি বাইদ্যানী।" থর থর গলায় বলল বান্দাটি। সারাটি দেহ তার কাঁপছে।

"সব্বনাশ। জয় মা বিষহরি।" আর্তনাদ করে উঠল আসমানী।

একটু পরেই বেদেবহর থেকে আসমানী, ডহরবিবি, রাজাসাহেব আর শঙ্খিনী ভুঁইয়া-বাড়ির অন্দর মহলে এসে উঠল।

মহব্বতের দেহটির চারপাশে গ্রামের মানুষগুলো ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। বেদেনীদের দেখে তারা দূরে সরে গেল।

শঙ্খিনী দেখল, উঠানের ঠিক মাঝখানে একটা মাদুরে মহব্বতকে শোয়ানো হয়েছে। তার মুখ দিয়ে ভলকে ভলকে নীলচে রঙের গাঁজলা বেরিয়ে আসছে। সারা দেহের যত্রতত্র নতুন কাপড় ছিঁড়ে বাঁধন দেওয়া হয়েছে। হাতে পায়ের শিরাগুলি পাকিয়ে পাকিয়ে ফুলে উঠেছে।

আসমানী বলল, "শরীলের (শরীরের) কুথায় সাপে ছোবল দিছে?"

"তা তো জানি না।" একটি বান্দা সম্মুখে এলো, "আন্দাজে বানু (বাঁধন) দিছি।"

কোন কথা বলল না আম্মা আসমানী।

বড় ভুঁইয়া সাহেব বহরে যাওয়ার সাজগোজের মধ্যেই বেরিয়ে এলেন। শঙ্খিনীকে দেখামাত্র মগজের মধ্যে সেই অপরূপ নেশাটা চাড়া দিয়ে উঠল। সামনের দিকে এগিয়ে এলেন তিনি। তারপর বিগলিত গলায় বললেন, "আরে ইদিকে আস দেখি ডানাকাটা হুরী। তোমার কাছে যাওনের লেইগ্যাই সাজগোজ করতে আছিলাম। হে-হে, কেমুন বে-আক্কেল দেখ, মহব্বত শয়তানটারে সাপে কাটনের আর সময় বুঝলো না! আসো, আসো দেখি আমার কাছে।"

পাশ থেকে উগ্র গলায় ধমকে উঠল আসমানী, "চুপ করেন ভুঁইয়া সাহেব। অখন রসরঙ্গের সময় না।"

এই মুহূর্তটা, যখন সাপের ছোবলের মধ্য দিয়ে বিষহরির কোপ এসে পড়েছে একজনের ওপর, তখন বিন্দুমাত্র বেয়াদপি করে না বিষবেদেরা।

তাদের বিশ্বাস, এই মুহূর্তে এতটুকু অশুচি ভয়ংকর অপরাধের। আর সেই অপরাধের অনিবার্য ফলাফল কল্পনা করতে শিউরে ওঠে বেবাজিয়ারা। বেদেরা জানে, বিষহরির রোষের আগুনে সুখী আর সহজ মানুষের পৃথিবী পলকে ছারখার হয়ে যাবে।

দেবীর কোটি কোটি অনুচর ছড়িয়ে রয়েছে দিকে দিকে। তাদের সঙ্গে নিমেষে নিমেষে শুভদৃষ্টি হয়। সপ্তনাগ, কালনাগ, উদয়নাগ, চন্দ্রবোড়া, কালচিতি—তাদের কত নাম, কত না বাহার! কারো দেহে সোনালী রেখা আঁকা, কারো মাথায় মণি পদ্ম, কারো কালো রঙের ওপর সাদা চক্রচিহ্ন। কারো ফণায় শঙ্খ, কারো ফণায় পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে। অসীম স্নেহে সকলকেই বিচিত্র ভূষণে সাজিয়েছেন দেবী বিষহরি। তাঁর একটিমাত্র নির্দেশে এই সব অনুচরেরা একসঙ্গে বিষ ঢালতে শুরু করবে। বেবাজিয়াদেব বিশ্বাস, নদী-খাল-বিল সেই গরলধারায় কালীদহ হয়ে যাবে। বাতাস বিষভাবে জর্জরিত হয়ে উঠবে। সেই গরল সমুদ্রের অতলে রুদ্ধশ্বাস হয়ে তলিয়ে যাবে মানুষের সাধ-সোহাগের দুনিয়া। মাটির ওপর থেকে দেবীর একটি ইঙ্গিতে জীবন মুছে যাবে।

ভাবতে ভাবতে চমকে উঠল আসমানী। দুটো পাংশু হাত যুক্ত কবে কপালে ঠেকাল সে, "জয় মা বিষহরি! গুণাহ্ হইলে ক্ষমা কইরো।" তারপব বড় ভুঁইয়ার দিকে তাকিয়ে নীরস গলায় বলল, "অখন কোন বেতবিবত কথা কইবেন না ভুঁইয়া ছাহাব। অখন হামরা ঝাড়ফুঁক করুম। জয় মা বিষহরি!"

বড় ভুঁইয়ার মুখে চোখে একটা কুশ্রী ভ্রূকুটি ফুটে বেরুল, "দেখ বাইদ্যা সুন্দরীরা, যদি বান্দাটারে বাঁচাইতে পার! বান্দাটারে সাপে কাটছিল, ভালই করছিল। এট্টু পরে কাটলে কী এমুন ক্ষতি হইত!"

গজ গজ করতে করতে সমানে আপসোস করতে লাগলেন বড় ভুঁইয়া।

সহসা শঙ্খিনী বলল, "আম্মা, হামি মন্তর পড়ুম। ঝাড়ফুঁক কবুম।"

"ঝাড়ফুঁক করবি তো কর না। এই বর্ষার রাইতে তা হইলে হামি বাঁচি।"

আসমানীর বুকে স্বস্তির বাতাস উঠল। শ্রাবণের এই রাত্রে হিসাবহীন বয়সের এই অথর্ব দেহটাকে মেহনত করাতে বড়ই মায়া লাগে। সে তো পাশেই রইল, শঙ্খিনী না পারলে অবশ্য তাকেই ঝাড়ফুঁক করতে হবে। বিষ নামাবাব মন্তর আওড়াতে হবে।

একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল রাজাসাহেব। একেবারে চুপচাপ, একেবাবেই নির্বাক। এবার সে বেশ তৎপর হয়ে উঠল, "না, না, তুই না শঙ্খিনী। উই ডহরবিবি ঝাড় ফুঁক করুক।" রাজাসাহেবের ভাবভঙ্গি থেকে একরাশ উদ্বেগ ঝরল। মহব্বতের সাপে-কাটার মধ্যে একটা অনিবার্য আভাস পেয়েছে সে। আর সঙ্গে সঙ্গে দেহ-মনের ইন্দ্রিয়গুলি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছে।

এবার ফুঁসে উঠল শঙ্খিনী। চোখের মণি দু'টি থেকে ফুলকি ঝরতে লাগলো তার, "হ, হামিই ঝাড়ফুঁক করুম। হামিই মন্তর পড়ুম। তুই চুপ

মার রাজাসাহেব।"

আর কোন কথা বলল না রাজাসাহেব। শুধু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আসমানী তীক্ষ্ম গলায় চেঁচাল, "সব সইর‍্যা যান। এইবার ঝাড়ফুঁক শুরু হইব। কাচা দুধ দুই মালসা, নয়া পাতিল, নয়া কাপড় একখান আর দক্ষিণ দুয়ারী ঘরের ভিত থিকা মুঠা ধুলা লাগব। দুইটা গেটে কড়িও আনতে হইব। তরাতরি (তাড়াতাড়ি) করেন।"

জিনিসগুলো সংগ্রহের জন্যে দিগ্বিদিকে ছুটে গেল বান্দারা।

উঠানের মাঝখানে মহব্বতের দেহটি শোয়ানো। তার শিয়রের পাশে এসে বসল শঙ্খিনী। মহব্বতকে দেখতে দেখতে সেই গোপন পরামর্শটির কথা মনে পড়ল। ভাবনার মধ্য দিয়ে একটি সুখের শিহরন কেঁপে গেল তার। একটু পরেই মহব্বতকে নিয়ে চরসোহাগীর দিকে পাড়ি জমাবে শঙ্খিনী। বেবাজিয়া বহরটা দুঃস্বপ্নের মত পেছনে পড়ে থাকবে।

একখণ্ড বিষপাথর নিয়ে মহব্বতের উরুর নীচে রেখে দিল শঙ্খিনী। সাপে না কাটলে শরীরের ওপর বিষপাথর আটকে বসে না। আসমানীরা কোন রকম সন্দেহ করে বসে, সেই আশঙ্কায় কালো পাথরের টুকরোটি উরুর নীচে রেখে দিয়েছে সে।

বিড় বিড় করে মন্তর পড়তে পড়তে মহব্বতের চারপাশ ঘুরতে লাগলো শঙ্খিনী। মাঝে মাঝে তার মুখের ওপর ঝুঁকে ঝাড়ফুঁকের রীতি মেনে তিনটি ফুঁ দেয় শঙ্খিনী আর ফিস্ ফিস্ গলায় বলে, "কী বাদশাজাদা, কত আরাম করতে আছ!"

বিষ কাটালীর পাতা খেয়ে গাঁজলা উঠেছে অনেক। আর সেই গাঁজলার মধ্যে মাথাটা রেখে নিথর হয়ে পড়ে ছিল মহব্বত। শঙ্খিনীর কথা শুনে পিট পিট করে চোখ দুটো মেলল সে। একটা প্রচণ্ড ফুঁ দেবার অছিলায় তার মুখের ওপর আরো খানিকটা ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো শঙ্খিনী। তারপর বিড় বিড় গলায় বলল, "হায় রে খোদা এ আবার কোন্ বেকুব পুরুষ। চোখ বোজ, চোখ বোজ বাদশাজাদা।"

শঙ্খিনীর মন্ত্রপড়ার উৎসাহ দেখে খুশিতে বুড়ি আসমানীর চোখজোড়া চক্ চক্ করে ওঠে। ক'টা দিন ধরে মেয়েটার কী যেন হয়েছিল! অবশ্য দেহ মনে যৌবনের রস আর রঙ ধরলে এমন একটু আধটু হয়েই থাকে। তারও কী হয় নি? নির্ঘাত হয়েছে। কত নিঃসঙ্গ রাত্রে তার বুকের মধ্যেও মাতলামি জেগেছে। ঘর বাঁধবার নিবিড় স্বপ্নে বেদেবহর ছেড়ে কতবার পালিয়ে যাবার সাধ হয়েছে তার। আচমকা, আজকের এই ঝিমিয়ে-আসা রক্তের আয়নার ছায়া ফেলে একটি জোয়ান পুরুষের মুখ। তার নাম শাজাহান। চাটগাঁ, নোয়াখালি কী খুলনা—কোথায় যে তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল, আজ আর মনে নেই আসমানীর। তার যৌবনের সেই প্রথম পুরুষটি কবে অজস্র রতিক্ষুব্ধ রাত্রিতে বহু পুরুষের জটলায় হারিয়ে গিয়েছে। তবু প্রায় ভুলে-আসা গানের রেশের মত কোন কোন সময় তার চৈতন্যের মধ্যে নড়ে চড়ে বেড়ায় শাজাহান। এই

শাজাহানই একদিন তাকে ঘর বাঁধবার মন্ত্র দিয়ে ফুসলাতে চেয়েছিল। কেন যেন শাজাহানকে মনে পড়লেই বুকের মধ্যেটা মোচড় দিয়ে ওঠে আসমানীর। ধমনীর ওপর রক্তের তাড়না অসহ্য লাগে।

কিন্তু পর মুহূর্তেই মনটাকে কঠিন বাঁধনে বেঁধে ফেলে আসমানী। তারা বেবাজিয়া। ঘরেব স্বপ্নে তাদের গুণাহ্ হয়; সেই গুণাহের কোন ক্ষমা নেই। সঙ্গে সঙ্গে একটা চকিত ছায়ার মত শাজাহান মনের কোন অন্ধকার বিবরে অদৃশ্য হয়ে যায়। আসমানী ভাবল, তারই মত শঙ্খিনীর মনে আকুলি-বিকুলি লেগেছিল। যতই মাতলামি লাগুক, আসলে শঙ্খিনীও নাগমতী বেদেনী। তার যৌবনের মাতামাতি নিশ্চয়ই এই একাগ্র মন্ত্র পড়া আর ঝাড়-ফুঁকের আড়ালে থেমে গিয়েছে। ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা প্রসন্ন হলো আসমানীর।

পাশ থেকে রাজাসাহেব বলল, "আম্মা, শঙ্খিনী কেমুন যেন করতে আছে! তুই দ্যাখস না?"

নানান ভাবনার নেশায় ঢুলছিল আসমানী। রাজাসাহেবের কনুইর গুঁতো খেয়ে চমকে উঠল সে, "চুপ, হারামজাদা জিন—"

আর কোন কথা বলল না রাজাসাহেব। মনভরা আক্রোশ নিয়ে পাশে বসে বসে শুধু ফুলতে লাগলো।

ইতিমধ্যে গেঁটে কড়ি, মালসা, কাঁচা দুধ আর দক্ষিণ দুয়াবী ঘরের ভিত থেকে ধুলো নিয়ে এসেছে বান্দারা।

শঙ্খিনী মন্ত্রপড়া ধুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে মহব্বতের গায়ে। কিন্তু মহব্বত একেবারেই নির্বিকার। এতটুকু নড়াচড়া পর্যন্ত করছে না।

একবার ডহরবিবি মহব্বতের দিকে এগিয়ে এসেছিল। মহব্বতকে ছোঁয়ার আগেই ত্রস্তে তাকে সরিয়ে দিয়েছে শঙ্খিনী।

চারপাশে নাগরপুর গ্রামের অজস্র মানুষ ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটি শব্দ করছে না কেউ। তাদের ভীরু ভীরু মুখচোখের ওপর হারিকেন আর মশালের আলো পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

মহব্বতের গায়ে একখানা হাত রেখে শঙ্খিনী বলল, "এ বিষ নামানো জবর কষ্ট আম্মা। দারুণ সাপে কাটছে।" তারপরেই নিঝুম গলায় বিড় বিড় করে বলল, "এ কী সে বিষ, একেবারে কালনাগিনীব পিরিতের বিষ!"

একপাশে একটা জলচৌকির ওপর বসে রয়েছেন বড় ভুঁইয়া। বিষের কথাটা তার কানে ঢুকেছিল। আতঙ্কে খাড়া হয়ে বসলেন তিনি। তারপর এলোমেলো গলায় বসলেন, "কীসের বিষ? কোন্ সাপের বিষ?"

থতমত গলায় শঙ্খিনী বলল, "চক্রচূড়া সাপের।"

অনেকটা সময় ধরে টেনে টেনে ঝাড়ফুঁক করলো শঙ্খিনী। কিন্তু মহব্বতের সারা শরীরে নিস্পন্দ ভাবটির বিন্দুমাত্র তারতম্য ঘটলো না। কেবল মুখ থেকে বিষকাটালীর নীল গাঁজলা বেরিয়ে আসতে লাগলো ভলকে ভলকে।

আচমকা শঙ্খিনীর মুখচোখ আশ্চর্য গম্ভীর হয়ে উঠলো। সে বলল, "হামি শ্যাষ চেষ্টা করুম আম্মা। কাটা-ঘায়ের রুগীবে নৌকায় তুলতে হইব।

জলে জলে ঘুইর‍্যা ঝাড়ফুক করুম।"

কাটা-ঘায়ের রুগীকে নৌকায় তুলে জলে ভাসতে ভাসতে বেদেদের শেষ ঝাড়ফুঁক চলে। বেদেদের বিশ্বাস, অহিভূষা মনসা এতে তুষ্ট হয়ে কোন অনুচর পাঠিয়ে মৃত্যুবিষ তুলে আনেন। ভেলায় ভাসতে ভাসতে বেহুলা যে প্রক্রিয়ায় লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে এনেছিল ঠিক সেই প্রক্রিয়াটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের ঝাড়ফুঁক আর মন্ত্র-তন্ত্রের মধ্যে ধরে রেখেছে বেবাজিয়ারা। তাই শেষ ঝাড়ফুঁকটি বেদেনীরাই করে থাকে। এতে পুরুষ বেদের কোন অধিকার নেই। আর এই শেষ প্রক্রিয়ায় যদি সাপে-কাটা মানুষ বেঁচে না ওঠে তা হলে দুনিয়ার কোন বিষবেদেই তার বিষ নামাতে পারে না।

নৌকায় কাটা-ঘায়ের রুগীকে তুলবার আগে দীক্ষাগুরুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে নিতে হয়। তার আশীর্বাদে বাসনা সিদ্ধ হয়।

আসমানীর কাছে এসে শঙ্খিনী বলল, "আম্মা তুমি হামারে কও, হামি উরে ডিঙিতে তুলি; তারপর ঝাড়ফুক করি।"

"তুই কী পারবি শঙ্খ? এই পেরথম (প্রথম)। আর কোনদিন তো ডিঙিতে বইস্যা মন্তর পড়স নাই!" আসমানীর গলায় শংকার সুর ফুটলো, "না হয় হামিই এই শ্যাষ ঝাড়ফুকটা করি।"

"হামি যুয়ান মাগী; তুমি বুড়া মানুষ। হামি থাকতে তুমি ক্যান গতরটারে মেহনত করাইবা! তা ছাড়া কোনদিন করি নাই বইল্যা কী শেষ ঝাড়ফুকটা করতে হইব না! শিখতে হইব না! হামি বেবাজিয়া মাগী। তুমি কও আম্মা, হামি শ্যাষ ঝাড়ফুকটা করি।" কাতর গলায় বলল শঙ্খিনী।

মনটা ভারী খুশি হয়ে গিয়েছে বুড়ি আসমানীর। যতই ঘর বাঁধার সাধ থাক, আসলে শঙ্খিনী বিষবেদেনীর বাচ্চা। শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে বেবাজিয়া রক্তই বইছে তার। খুবই শুভ লক্ষণ। ঝাড়ফুঁক করতে করতে, মন্ত্র পড়তে পড়তে শঙ্খিনী আবার তার বেবাজিয়া সত্তায় ফিরে এসেছে।

আসমানী বলল, "রুগীরে ডিঙিতে তোল্। খুব সাবধান হইয়া ঝাড়ফুক করবি। মনে যেন বেতরিবত মতলব না থাকে। বিষহরির গোসা যেন না আইস্যা পড়ে হামাগো উপর। খুব সাবধান।"

"ঠিক আছে।"

কিছু বলবার জন্য রাজাসাহেব গলাটা শকুনের মত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার আগেই একখানা কোষডিঙিতে তোলা হলো মহব্বতকে। শঙ্খিনী গেঁটে কড়ি, কাঁচা দুধের মালসা আর বিষপাথর নিয়ে পাটাতনে উঠল।

শুধু তারা দু'জন। যাকে সাপে কেটেছে আর যে ঝাড়ফুঁক করবে, এই দু'জন ছাড়া ডিঙিতে আর কেউ থাকতে পারবে না। এ নিয়মের ব্যতিক্রম হবার উপায় নেই।

আসমানীর ধমক খেয়ে বড় ভুঁইয়া সাহেব সেই যে জলচৌকির ওপর জাঁকিয়ে বসেছিলেন, আর ওঠেন নি। এবার গুটি গুটি পায়ে তিনি ঘরের

মধ্যে চলে গেলেন। তারপর বিছানায় গিয়ে ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন।

স্রোতের খেয়ালে কোষডিঙি এগিয়ে চলল।

ভুষো কালির মত অন্ধকার। বর্ষার জ্যোৎস্না খানিকটা ভৌতিক রহস্যের সৃষ্টি করেছে। বনমাদার আর হিজল পাতার ফাঁকে ফাঁকে নীল জোনাকির দীপালী।

কোষডিঙিটা ধানবন পেছনে রেখে, পাটক্ষেত ডিঙিয়ে মেঘনার দিকে এগিয়ে চলেছে। আর জলেডোবা ধানবনের মধ্য দিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে ডিঙিটার দিকে তীক্ষ্ম নজর রেখেছে রাজাসাহেব।

এক সময় রয়নাবিবির খাল পেরিয়ে অথৈ মেঘনায় এসে নামলো শঙ্খিনীর কোষডিঙি। অতল মেঘনা—উদ্দাম, উত্তাল। যতদূর নজর চলে, চিহ্ন নেই, দিক-দিশারী নেই। কূল নেই। বাঁও নেই।

ধানবন থেকে মেঘনায় নামলো রাজাসাহেব। কুমীর আছে, কামট আছে। তাদের মহিমা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন সে।

আচমকা, একান্তই আচমকা কান দুটো চমকে উঠল রাজাসাহেবের, মেঘনার পাড়ে দাঁড়িয়ে চোখ দুটো একটা ভয়ংকর খুয়াব দেখল।

কোষডিঙির পাটাতনে বসে উচ্ছল গলায় শঙ্খিনী বলছে, "ওঠো গো বাদশাজাদা, শয়তানরা পিছে পইড়্যা রইছে। আর ডর নাই। রাতারাতি চরসোহাগী যাইতে হইব। ওঠো, বৈঠা ধরো।"

আশ্চর্য! সাপে-কাটা মহব্বত পলকপাতের মধ্যে পাটাতনে উঠে বসেছে। দেখতে দেখতে, শুনতে শুনতে রাজাসাহেবের মনে হলো, ধমনীতে আর রক্তের তাড়না বাজছে না। শিরায় শিরায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে জীবনের স্পন্দন একেবারেই থেমে গিয়েছে। চেতনা লোপ পেয়েছে তার।

যে সন্দেহটা তিল তিল করে মনের ওপর একটা কালো পর্দা হয়ে ঝুলছিল, তা যে এমন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে, সে কথা কী জানতো রাজাসাহেব?

মেঘের জটলা ছিঁড়ে চাঁদটা বেরিয়ে আসতে পারছে না। কেমন এক ধরনের ভৌতিক আবছায়া মেঘনার ঢেউ-এ ঢেউ-এ দোল খাচ্ছে।

শঙ্খিনীর কোষডিঙিটা দুলতে দুলতে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। দূর থেকে তার স্বর ভেসে আসছে। সে স্বরে খুশির খুশবু ফুটছে, "বাদশাজাদা, ভেলার উপর ভাইস্যা ভাইস্যা মা বিষহরির দোয়ায় বেহুলা পাইছিল তার লখাইরে। হামি পাইছি হামার লখাইরে। জয় মা মনসা, এই সাপে-কাটার ছলনার লেইগ্যা দোষ ধরিস না মা।" বলতে বলতে যুক্ত কর কপালে ঠেকাল শঙ্খিনী।

একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি খেয়ে দেহমনের নিষ্ক্রিয় ভাবটা ঝরে গেল রাজাসাহেবের। নিমেষে রয়নাবিবির খালে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। তারপর একটা তীব্রগামী ফলুই মাছের মত জল কেটে কেটে ভূঁইয়া বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

আরো, আরো জোরে, সমস্ত উত্তেজনা, সমস্ত শক্তি দু'টি হাতের পেশীতে সংহত করে সাঁতার কাটছে রাজাসাহেব।

বাইশ

রাজাসাহেবের মুখে সমস্ত কিছু খুঁটিনাটি শুনে একেবারে আর্তনাদ করে উঠল আসমানী, "এইটা আবার কী কইতে আছিস, কী রে হারামজাদা জিন ? সাপে-কাটা রুগী এর মধ্যে উইঠ্যা বসছে ?"

একপাশে দাঁড়িয়ে সমানে হাঁপাচ্ছিল রাজাসাহেব। তিন বাঁক জল সাঁতার কেটে উজিয়ে আসতে প্রচণ্ড পরিশ্রম হয়েছে। ক্লান্ত একটা কুকুরের মত আধহাত জিভ বেরিয়ে পড়েছে।

শ্বাসটানা গলায় রাজাসাহেব বলল, "তবে আর কী কইতে আছি আম্মা, তারা এতক্ষণে চরসোহাগীতে ভাইগ্যা গেল বুঝি। আর কোনদিন এদিকে আসবো না। কী হইব আম্মা ? উপায় কী ?"

মহব্বতকে নিয়ে শঙ্খিনী সেই যে কোষডিঙিতে উঠেছিল, সেই থেকে বড় ভুঁইয়া সাহেব ঘরের মধ্যে ধরাশায়ী হয়ে ছিলেন। এতক্ষণ আর তাঁর সাড়া পাওয়া যায় নি। খবরটা শুনে বিকট গর্জন করে তিনি বাইরে এলেন, "মহব্বত বান্দরের প্যাটে এত রসের প্যাচ! হায় খুদা—এমন রঙ্গও তুমি দেখাও! হারামজাদা বান্দাটারে পাইলে একেবারে তাজাই গোরে পাঠামু।" এমন একটা পবিত্র কাজ তাঁর পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব নয়, সেটা প্রমাণ করার জন্যই হিংস্র মুখখানায় একটা ভয়াল ভ্রূকুটি ফুটিয়ে তুললেন।

নিরুপায় ঘোলাটে চোখে বড় ভুঁইয়ার দিকে তাকালো আসমানী, "তা হইলে কী উপায় হইব? উপায়টা কী? শঙ্খিনীরে যে বেবাজিয়া বহরে ফিরাইয়্যা আনতেই হইব। না হইলে বিষহরির গোসা আইস্যা পড়ব।"

বড় ভুঁইয়া আশ্বাস দিলেন, "ডরের কী আছে বুড়ি বাইদ্যানী! আমি সব ব্যবস্থা করতে আছি। তোমার যেমুন শঙ্খিনীরে দরকার, আমারও তেমুন মহব্বতেরে দরকার। আমার নানা নগদ তিন টাকা ছয় পয়সা দিয়া মহব্বতের মায়েরে খরিদ কইর‍্যা আনছিল। অত সহজে কী দখল ছাড়া যায়! মাগনা ছাইড়্যা দিমু মহব্বতেরে? তেমুন শেখের ঘরে আমার জন্ম না বুড়ি বাইদ্যানী।"

একই দরকারের, একই দাবীর সরলরেখায় এসে মিলিত হয়েছে দু'জনে। শঙ্খিনীকে ফিরে পেতে হবে আসমানীর। মহব্বতকে চাই বড় ভুঁইয়ার।

ওপর থেকে অসীম কসরতে, বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে উঠানে নেমে এলেন বড় ভুঁইয়া। আর নেমেই হুংকার ছাড়লেন, "এই জসীম, এই হালিম, এই তমিজ —তোরা ছিপ নোকা দু'খান বাইর কর। ভোর হওনের আগে শয়তান দুইটারে যদি ধইর‍্যা আনতে না পারস, তা হইলে তোগো সবাইরে জবাই করুম।

খুব সাবধান।”

পলকের মধ্যে ছিপ নৌকা নামিয়ে আনলো বান্দারা। তারপর বারোটা বৈঠা হাতে নিয়ে এক একটা নৌকায় বারো জন করে উঠলো। নাগরপুর গ্রামের কয়েকজন উৎসাহী মানুষ এমন একটা উত্তেজক মুহূর্তে বান্দাদের সঙ্গে বৈঠা ধরেছে। সকলের সঙ্গে রাজাসাহেবও ছিপ নৌকায় উঠে বসল। তাদের চোখে চোখে একটা নির্মম প্রতিজ্ঞা জ্বলছে, তাদের বৈঠার ফলাতে একই শপথ ঝকমক করছে। ভাবগতিক দেখে মনে হয়, এতবড় দুনিয়ার আসমান-জমিন যদি একাকার করেও ঢুঁড়তে হয়, তবু তারা হটবে না। যেমন করেই হোক ভোর হবার আগেই বর্ষার মেঘনা থেকে শঙ্খিনী আর মহব্বতকে খুঁজে নিয়ে আসবেই।

একটু পরে তীরের মত ছিপ নৌকাদুটো রয়নাবিবির খাল ধরে মেঘনার দিকে মিলিয়ে গেল। আর অন্দরমহলের উঠানে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বুড়ি আসমানী, ডহরবিবি এবং নাগরপুর গ্রামের অজস্র মানুষ। আর একটা খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত ফুলতে লাগলেন বড় ভুঁইয়া!

রাত্রির শেষ প্রহরে যখন পুবের আকাশে এক আস্তর অস্পষ্ট রঙের ছোপ ধরল, ঠিক সেই সময় ভুঁইয়াবাড়ির ঘাটলায় ছিপ নৌকা দু’খানা ভিড়ল। শঙ্খিনী আর মহব্বতকে দু’টি নৌকার খোলে কাছি দিয়ে বেঁধে আনা হয়েছে।

সারা রাত্রি উঠানের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত একটা আহত জানোয়ারের মত পাক খেয়ে ফিরেছেন বড় ভুঁইয়া। আর মাঝে মাঝে ঘরে গিয়ে ঢোকে ঢোকে নির্জলা মদ গিলে এসেছেন। চোখ দু’টি টকটকে লাল। মনে হয়, দু-পিণ্ড রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে।

উঠানের ওপর পাক খেতে খেতে সারাটা রাত বড় ভুঁইয়া সাহেব অথৈ ভাবনার মধ্যে হাবুডুবু খেয়েছেন। সে ভাবনার তল নেই, বাঁও নেই। কিছুতেই তিনি ঠিক সমাধানে পৌঁছতে পারেন নি। কেমন করে, কোন্ ভোজবাজিতে এতখানি দুঃসাহস সঞ্চয় করল মহব্বত? তাঁর থাবার মধ্য থেকে শঙ্খিনী নামে একটি খুবসুরত শিকারকে ছিনিয়ে নিয়ে উধাও হবার শক্তি কোথায় সে পেল? ভাবতে ভাবতে আর নির্জলা দেশী মদের প্রভাবে মগজটা যেন বিকল হয়ে গিয়েছিল তাঁর। ইতিমধ্যে শঙ্খিনী আর মহব্বত, দু’জনকেই কাছিবাঁধা অবস্থায় নৌকা থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। বান্দারা দেহ দু’টি বড় ভুঁইয়ার পায়ের সামনে ইনাম দিল। দু’জনের শরীরে অজস্র আঘাতের চিহ্ন। পরিষ্কার বোঝা যায়, ধরা পড়ার আগে রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

রাজাসাহেব এক কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার হাত বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত ঝরছে। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। জয়োল্লাসে একেবারে ডগমগ হয়ে রয়েছে। খুশি খুশি গলায় সে বলল, “কী কমু ভুঁইয়া ছাহাব, কী কমু আম্মা, সারাটা মেঘনা একেবারে তোলপাড় কইর‍্যা ফেললাম। কিছুতেই কী শয়তান দুইটা আসতে চায়! এই দ্যাখেন, কেমুন এট্টা কামড় বসাইয়া দিছে উই শঙ্খিনী।” বলতে বলতে ডান হাতখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে

দিল রাজাসাহেব।

আসমান কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন বড় ভূঁইয়া, "কী রে মহব্বত, কাছিমের বাচ্চা! পলাইয়া যাওনের জবর মতলব! তোরে আইজ কুত্তা দিয়া খাওয়ামু।"

কাছাকাছি এগিয়ে এসে মহব্বতের পাঁজরে প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে দিলেন বড় ভূঁইয়া। হৃৎপিণ্ডটা কোঁত্ করে উঠল তার।

কাতর শব্দ করে উঠল শঙ্খিনী, "উয়ারে মারতে আছেন ক্যান ভূঁইয়া ছাহাব। মারলে হামারেই মারেন। উয়ার কোন দোষ নাই; হামিই উয়ারে নিয়া গেছিলাম!"

"পিরিত মব্বত দেখি উথলাইয়া উঠে নাগরের লেইগ্যা। কিন্তুক রসবতী বাইদ্যানী, একটা ব্যাপারে আমার বড় ধন্দ লাগছে। ধন্দটা মিটাইয়া দাও দেখি। আমার থিকা আমার বান্দারে তোমার মনে ধরল ক্যামনে?" খ্যাক খ্যাক শব্দ করে হেসে উঠলেন বড় ভূঁইয়া।

কোন জবাব দিল না অশ্রুমতী শঙ্খিনী। কান্নার দমকে দমকে শরীরটা ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো তার।

খানিকটা চুপচাপ।

এক সময় আসমানী বলল, "এইবার হামরা বহরে যাই ভূঁইয়া ছাহাব। আইজ হামরা এইখান থিকা চইল্যা যামু!"

"আইজই যাইবা?" চমকে উঠলেন বড় ভূঁইয়া।

"হ। তিন দিন হইয়া গেল। তিন রাইতের বেশি এক জায়গায় থাকনের উপায় নাই। জলপুলিস আইস্যা ধইর‍্যা নিয়া যাইব। উঠি গো ভূঁইয়া ছাহাব।"

জলবাঙলায় একটি কানুন আছে। বেবাজিয়া বহরকে দু'রাত্রির বেশি এক জায়গায় থাকতে দেওয়া হয় না। এর ব্যতিক্রম মানেই অনিবার্য ফাটক বাস। আর ফাটক সম্বন্ধে ভয়ংকর একটা ধারণা আছে বেবাজিয়াদের।

অসহায় গলায় বড় ভূঁইয়া বললেন, "তা হইলে তোমাদের বহরে যামু ক্যামনে?"

"এইবার আর হইল না। এই জনমে আবার যদি দেখা হয়, তা হইলে যাইয়েন। চলি গো ভূঁইয়া ছাহাব।"

শঙ্খিনীকে সঙ্গে নিয়ে খালের ঘাটের দিকে চলে গেল বেবাজিয়ারা। বুকফাটা চীৎকারে আর্তনাদ করে উঠল শঙ্খিনী।

অসহায় আক্রোশে ফুলতে ফুলতে বড় ভূঁইয়া ভাবলেন। অনেক ভাবনা। সে ভাবনার জ্বালায় সমস্ত চৈতনা জ্বলছে। একমুঠো কাঁচা টাকা দিয়ে শঙ্খিনীর যে খুবসুরত দেহটা তিনি বায়না করেছিলেন, সেটা এমন করে থাবার মধ্যে এসেও যে ছিটকে যাবে, তা কী তিনি কল্পনাও করেছিলেন? আক্রোশটা একটু একটু করে ক্ষোভ আর রোষের রূপ নিল। সেই ক্ষোভ আর রোষ রক্তের কণায় কণায় ফুঁসতে লাগলো। নিরুপায় রাগে হাতের মুঠি পাকিয়ে

আসতে লাগল তাঁর। মনে হলো, এই মুহূর্তে হত্যা পর্যন্ত করতে পারেন তিনি।

খালের ঘাট থেকে বেবাজিয়াদের নৌকা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

আর উপায় নেই। শঙ্খিনীর সুঠাম তনুটি ঘিরে দেহসুখের যে কল্পনাটি একটা রঙিন ফানুসের মত তিনি ফুলিয়ে তুলেছিলেন, এই মুহূর্তে সেটা ফেটে চৌচির হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। বেবাজিয়ারা আর এখানে থাকবে না। আজই বহর ভাসিয়ে কোন একদিকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। সহসা দেহভোগ, রতি, রিপু সম্বন্ধে একান্ত নিস্পৃহ বনে যাবার চেষ্টা করলেন বড় ভুঁইয়া। কোরান্ শরীফের দু-একটা পবিত্র 'সুরা' আওড়াতেও কসুর করলেন না। কিন্তু কোন প্রবোধ, কোন সান্ত্বনাতেই আসান পাওয়া যাচ্ছে না। রক্ত-চোখে নীচের দিকে তাকালেন বড় ভুঁইয়া। কুণ্ডলী পাকিয়ে পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে মহব্বত। আচমকা সব রোষ, সব ক্ষোভ, সব রাগ এসে পড়ল তার ওপর। মেজাজটা বারুদের মত দপ্ করে জ্বলে উঠল। নাগরাপরা পা দিয়ে লাথির পর লাথি চালাতে লাগলেন বড় ভুঁইয়া।

প্রথম দিকে কোঁত্ করে গোটাকয়েক শব্দ করেছিল মহব্বত। এখন সেই শব্দও থেমে গিয়েছে।

একটু পরেই শঙ্খিনীর ঘরবাঁধার সকল সাধ আর স্বামী-সন্তান, প্রেম-প্রীতি দিয়ে ঘেরা সুন্দর স্বপ্নটি দলে, পিষে, তার মধুর কামনা-বাসনার ভ্রূণটিকে হত্যা করে বেবাজিয়া বহরে ফিরে এলো আসমানীরা।

পাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠল আসমানী। সে চিৎকারে বাতাস চিরে চিরে গেল, "এই গহর, এই ছলিম, এই খালেদ, এই রাজাসাহেব—তুরা সব বহর ছাইড়্যা দে। বাদাম তোল। আর ইখানে থাকা যাইব না। আইজের মধ্যে মেঘনা পাড়ি দিয়া কালাবদরে গিয়া পড়তে হইব। সেই খেয়াল থাকে যেন।"

কিছুক্ষণের মধ্যে পাঁচখানা বিশাল বেদেনৌকার বহর রয়নাবিবির খালের খরধারায় দুলতে দুলতে মেঘনার দিকে ভেসে চলল। নাগরপুরের মাটিতে দু'দিনের নিশ্চল জীবনের পালা সাঙ্গ হলো। আবার ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলা। কোন নিরুদ্দেশের ঠিকানায়, কোন বেনামী বন্দরের অভিসারে এই যাত্রা শুরু হলো, তা এই মুহূর্তে বলতে পারবে না বেবাজিয়ারা।

শঙ্খিনীকে নিয়ে পানহা ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল আসমানী। কী আশ্চর্য! কী বিস্ময়! রাগে তার গলার শিরাগুলি সাপের মত ফুলে ফুলে উঠল না। চোখ দু'টো দু টুকরো অঙ্গার হয়ে জ্বলল না। হাতের মুঠি দু'টি উত্তেজনায় পাকিয়ে গেল না। এমন কী তীক্ষ্ণ গলায় গর্জন পর্যন্ত করলো না আসমানী।

শঙ্খিনীর দেহটা কাঁপিয়ে, ঝাঁপিয়ে, দুলিয়ে, অস্থির করে, মথিত করে একটা হু-হু কান্নার উৎক্ষেপ ফুঁসে ফুঁসে বেরিয়ে এলো। তার পিঠের ওপর একখানা হাত বিছিয়ে দিল আসমানী। তার হাতের স্পর্শে কত স্নেহ, কত শান্তি।

এই স্পর্শ একেবারেই নতুন। এর আগে এমন করে আর কোনদিনই মমতা ঢালে নি আসমানী। সমস্ত শরীরটা থরথর করে উঠল শঙ্খনীর।

শান্ত গলায় আসমানী বলল, "সামনের দিকে দেখ শঙ্খ।"

সামনের সপ্তনাগের চূড়াচক্রে বিষহরির মূর্তি। দেবী ভীষণা, অহিভূষণা। তাঁর এক চোখে অপার বরাভয়, অন্য চোখে কী ভয়াল ক্রূরতা!

আসমানী আবার বলল, "ক্যান মিছামিছি গিরস্থী (গৃহস্থী) মানুষের লগে পিরিত করতে গেছিলি? উয়াগো লগে হামাগো বনে না। উয়াগো লগে ঘর বান্ধনও যায় না। দেখলি তো, ঘর বানতে (বাঁধতে) পারলি না।"

কান্নাভরা গলায় শঙ্খনী বলল, "তুমরাই তো হামাগো ধইর‍্যা আনলা। তুমরাই তো হামার ঘরটা বান্‌তে (বাঁধতে) দিলা না।"

"হামরা কে? বিষহরিই তো দিল না। হামাগো মধ্য দিয়া বিষহরি তার মর্জিমত কামটা করাইয়্যা নিল। বিষহরি চায় না তুই গিরস্থী (গৃহস্থী) হইস। হামরা তুরে কী আটকাইতে পারি! হামাগো ক্ষ্যামতা কতটুকু? সবই বিষহরির ইচ্ছা।"

আচ্ছন্ন গলায় শঙ্খনী বলল, "তুমি তো একদিন কইছিলা, হামারে শাদী দিবা। তুমি দাও নাই। হামি তাই তো সোয়ামী জুটাইলাম। তুমি ক্যান হামাগো ফিরাইয়্যা আনলা? হামরা তো আসতে চাই নাই।"

রুক্ষ স্বরে আসমানী বলল, "চুপ শঙ্খ, এইটা 'পানহা ঘর' ইখানে ঘরের কথা কইবি না। বেতরিবত মতলব করবি না। হামাগো লেইগ্যা ঘর না। ঘর হামাগো সইবো না।" তীক্ষ্ম চোখে শঙ্খনীর দিকে তাকালো আসমানী।

এখানে মনের এতটুকু অশুচি সর্বনাশ ডেকে আনবে। দুনিয়া জোড়া বেবাজিয়া সংসার ছারখার হবে। উচ্ছন্নে যাবে। বিষহরি মূর্তির দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠল শঙ্খনী। তবু কেন যেন মন শাসন মানছে না। কেন বুকের মধ্যেটা যেন উথল-পাথল হচ্ছে।

শঙ্খনী বলল, "না আম্মা, বেতরিবত মতলব আর করুম না। কিন্তুক এট্টা কথার জবাব দাও দেখি।"

"কী কথা?"

"বেবাজিয়ারা ঘর বান্‌তে (বাঁধতে) গেল বিষহরির গোসা হয় ক্যান?"

"সেই কেচ্ছা শুনবি?"

"শুনুম।"

"তবে শোন্। জয় মা বিষহরি!" যুক্ত কর কপালে ঠেকাল আসমানী। চোখ দুটো বুজে গিয়েছে। বিড় বিড় করে কী যে দেখছে সে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

আর আসমানীর দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছে শঙ্খনী।

উপকাহিনী

আর একটি কাহিনীর ওপর থেকে যবনিকা উঠে গেল। এ কাহিনী যুগ যুগ ধরে শ্রুতিপথে স্মৃতিপথে বেদের জীবনে বয়ে আসছে। এ কাহিনী আসমানী তার নানীর কাছে শুনেছে; সেই নানী আবার শুনেছে তার নানার কাছে। আজ শুনছে শঙ্খিনী। হয়ত উত্তরকালের বেবাজিয়ারা শঙ্খিনীর কাছে শুনবে।

বেবাজিয়া মনের অদৃশ্য পাতায় পাতায় এ কাহিনী কিংবদন্তীর মত জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

কত বর্ষ আগে, ধূসর অতীতের পরপারে কোন্ অনির্দিষ্ট দিনটিতে বেবাজিয়ারা এই জলবাঙলায় এসেছিল, সে হদিস আসমানীর নানী, কী সেই নানীর নানা, কী তারও কোন প্রাক্পুরুষ দিয়ে যেতে পারে নি। কবে, কোন্ তারিখটিতে তাদের জীবনে বিষহরির নির্দেশ এসে পড়ল, তাও বেবাজিয়াদের অজানা। যখনই বেবাজিয়াদের সেই ক্ষণগুলির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, তখনই একটা দুর্নিরীক্ষ্য কালের দিকে, সন-তারিখের হিসাবহীন একটা ধু ধু অতীতের দিকে তারা আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

একসময় আসমানীর কাহিনী শুরু হলো।

অনেক, অনেকদিন আগে বড় বড় নদী, হলদে সমুদ্র আর বালুময় ঊষর মরু পাড়ি দিয়ে মাঝে মাঝে সেই মরুভূমির খেজুরকুঞ্জে জিরিয়ে জিরিয়ে তাদের প্রাক্পুরুষেরা এই জলবাঙলায় এসেছিল। আকাশের এমন আশ্চর্য নীল, দিগন্তভরা এমন অঢেল সবুজ, বিল আর নদীভরা ঢেউ-এর এমন কলতান এক মুহূর্তে তাদের সব অবসাদ, দীর্ঘ চলার সমস্ত ক্লান্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছিল। মুগ্ধ চোখ মেলে সেই সব মানুষগুলি দেখেছিল আকাশ নদী বন মাঠ আর শুনেছিল নানা রঙের, নানা পাখির গান। তাদেরই অভ্যর্থনায় উৎসব শুরু করে দিয়েছে যেন সমস্ত প্রকৃতি। নতুন মানুষের সাড়া পেয়ে, নতুন জীবনের যাদুকাঠির ছোঁয়ায় সমস্ত দেশটা আনন্দিত হয়ে উঠল। হরিয়াল ডাকল, বাঘ গর্জাল, নদীর জলে কুমীর-কামট লেজ ঝাপটাল, সমস্বরে খাটাশেরা শোরগোল করল।

ধরে নেওয়া যাক সেই সব প্রাক্পুরুষদের কারো নাম হোমরা, কারো মুণ্টা, কারো সঙ্গা। এমনি অনেক, অজস্র। আসমানীর গল্পের প্রয়োজনে তারা যথাসময়ে দেখা দেবে। তাদের ভাষা দুর্বোধ্য, তাদের স্বভাব একান্তভাবেই তাদের নিজস্ব। উত্তরপুরুষেরা তাদের মুখে এ কালের ভাষা দিয়ে কিংবদন্তী বানিয়েছে।

দলপতির নাম হোমরা। নদীর পারে নধর ঘাসের ওপর সে শ্রান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিল। তারপর ক্লান্ত গলায় বলল, "পশ্চিম দেশ থিকা হামরা

আসলাম। কত দেশ দেখলাম, কত নদী, সাগর পাহাড় মরুভূমি দেখলাম, কিন্তুক এমন তোফা দেশ হামরা কুথাও দেখি নাই। ইখানেই হামরা থাকুম। তুদের কী মতলব?”

অপরূপ এই দেশটা শত শত বাহু বাড়িয়ে এক নিমেষে যেন সকল মানুষগুলোকে জড়িয়ে ধরেছে। খুশি খুশি গলায় সকলে শোরগোল করে উঠল, “ঠিক আছে সন্দার। হামরা ইখানেই থাকুম।”

“সারাটা জনম খালি ইখানে-উখানে ঘুইর‍্যাই বেড়াইলাম। মনে আছে তুদের, কী রে?” জিজ্ঞাসু নজরটা সকলের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল হোমরা।

একটি যুবতী মেয়ে সামনে এগিয়ে এলো। ঊর্ধ্বদেহে কোন আবরণ নেই! কোমর থেকে ঊরু পর্যন্ত একটা জীর্ণ হরিণের ছাল জড়ানো রয়েছে। মাথার চুল রুক্ষ। বাঁকা গ্রীবাদেশকে বেষ্টন করে সুডৌল বুকের ওপর নেমে এসেছে বুনো পাখির হাড়ের মালা। কানে কড়ির গয়না, পায়ে হলদে হাড় বেঁকিয়ে পরেছে। যুবতীর নাম মুণ্টা, দলপতি হোমরার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল সে।

উচ্ছল গলায় মুণ্টা বলল, “সেই মরুভূমি, সেই লাল নদী, উট আর ঘোড়ার পিঠে উইঠ্যা খালি ইখান থিকা উখানে ঘুইর‍্যা বেড়ান—সব, সব মনে আছে সন্দার। উই সব আর ভালো লাগে না। ইট্টু জিরাইতে সাধ হয়। এই দেশটা বড় ভালো, বড় সোন্দর। ইখান থিকা হামরা আর কুথাও যামু না।”

মানুষগুলি হোমরাকে ঘিরে গোলাকার হয়ে বসে ছিল। তারা সমস্বরে সায় দিল, “হ, হ, হামরা ইখান থিকা যামু না।”

তারা জানে মুণ্টার সিদ্ধান্তের ওপর কোন কথাই বলবে না হোমরা। মুণ্টার নিটোল যৌবন আর রূপের জলুসের কাছে দেহমন সঁপে দিয়েছে সে। আর মুণ্টাও নিতান্ত অবলীলায় হাস্যে লাস্যে আর যৌবনের ঠমক-ঠসকের রশি দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলেছে।

অবসাদে চোখদুটো বুজে আসছে হোমরার। তবু পরম উৎসাহে সে বলল, “ঠিক আছে। আর ঘুইর‍্যা বেড়ামু না। এখানেই হামরা ঘর বানামু।”

চলমান জীবনে এই প্রথম বিশ্রামের আশ্বাস; এই প্রথম শিকড় ফেলার প্রস্তুতি। ঘর-গৃহস্থালি পাতার উৎসব। বিচিত্র আনন্দে সকলে ভরপুর হয়ে গিয়েছে। হোমরার কথাগুলি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে সকলে জয়ধ্বনি করে উঠল, “হো সন্দার হো তুর জবর ভালো হইব। জবর ভালো।”

গোটা কয়েক উট আর ঘোড়াও নিয়ে এসেছে হোমরারা। তাদের গলা থেকে পাকানো লতার বাঁধন খুলে দেওয়া হয়েছে। ঘাসের সমুদ্রে তারা মুখ গুঁজে দিয়েছে। এমন সুস্বাদু ফলার তাদের জীবনে আর আসে নি! কোনদিকে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। সরস ঘাসের পাতাগুলো নিবিষ্ট মনে চিবিয়ে চলেছে তারা। এতদিন সেই মরুভূমিতে নীরস খেজুর পত্তা আর হলদে রঙের শুকনো ঘাস চিবিয়ে রসনা থেকে স্বাদবোধ চলে গিয়েছিল। চারিদিকে চনমন দৃষ্টিতে তাকালো প্রাণীগুলো। যতদূর নিরীখ চলে, শুধু ঘাস। অফুরন্ত

ঘাস। সারা জীবনে এত ঘাস খেয়ে ফুরনো যাবে না। আনন্দে মশগুল হয়ে রয়েছে প্রাণীগুলো। এই জায়গাটা তাদেরও পছন্দসই।

এক সময় হোমরার চারপাশ থেকে সকলে উঠে সামনের নদীটার দিকে চলে গিয়েছে। মানুষগুলির কোমরে বাঘ কী হরিণের ছাল জড়ানো। তাদের তামাটে দেহের ওপর রোদ পড়ে ঝক্‌ঝক্ করছে। হাতের থাবায় এক ধরনের বর্শা জাতীয় অস্ত্র ধরা রয়েছে। অজানা দেশ। কিছুতেই বিশ্বাস নেই। জীবনের পথচলায় নদী-সমুদ্র, মরু-পাহাড় পাড়ি দিতে হয়েছে তাদের। অনেক বিপদ, অনেক বিপাক, অনেক ভয়ঙ্করের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মৃত্যুর সঙ্গে তাদের পাঞ্জা কষতে হয়েছে। কোথায় যে অপঘাত ওৎ পেতে রয়েছে, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই।

সকলেই চলে গিয়েছে। শুধু একটা গন্ধমাতাল পতঙ্গের মত হোমরার চারপাশে ঘুর ঘুর করছে মুণ্টা।

আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। সামনে কলস্বনা নদী, আর মাথার ওপরে বিশাল একখানা আকাশ। আর সেই আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে অজানা পাখি চক্কর দিচ্ছে।

বিশাল একখানা হাত বাড়িয়ে মুণ্টার চিকন কোমরটাকে জড়িয়ে ধরল। তারপর বুকের কাছে টেনে আনল। এই নতুন দেশটা হোমরার রক্তে রক্তে অদ্ভুত এক দোলা দিয়েছে। নরম, নিভাঁজ স্তনভার—একেবারে নিজের বুকে চেপে ধরল হোমরা। গভীর আবেশে চোখ দুটো বুজে এলো মুণ্টার।

জড়িত স্বরে হোমরা বলল, "এইবার হামরা ঘর বান্ধুম মুণ্টা। এই দেশটা ক্যামন যেন নেশা ধরাইয়্যা দিছে।"

"হ সদ্দার, আর হামরা ঘুইর‍্যা বেড়ামু না।'

"সাধে কী আর ঘুইর‍্যা বেড়াইছি হামরা! পেটের জ্বালায়, খাবারের খোঁজে ইখানে সিখানে ঘুরতে হইছে। মনে হয়, এই দেশে খাবার পাওয়া যাইব। আর হামরা দেশে দেশে, পথে পথে ঘুরুম না।"

আরো নিবিড়, আরো নির্মম আকর্ষণে মুণ্টার কোমল শরীরটাকে বুকের মধ্যে গুটিয়ে আনল হোমরা।

সকলের সামনে জীবনের আদিম লীলা চালাতে এদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই। সেই সব পেছনে ফেলে-আসা কর্কশ দেশগুলির পরিবেশে এতকাল শরমের কোন বালাই ছিল না।

কিন্তু এখানে, এই অপরূপ দেশটায় চারপাশের মাঠ বন নদী আকাশ প্রান্তর কেমন এক শান্ত শ্রীতে ভরে রয়েছে। সমস্ত শরীরে মজ্জায় অস্থিতে মেদে শোণিতে কী এক লজ্জার শিহরন খেলে গেল মুণ্টার। এই অনুভূতিটা তার কাছে একেবারেই নতুন। মুণ্টার মনে হলো, মরু-পাহাড়ের উগ্র রুক্ষ দেশ থেকে জীবনের আদিমতাগুলোকে এখানে নিয়ে আসা উচিত নয়। এখানে সেগুলি একান্ত বেমানান। এই সুন্দর দেশটা সঙ্কোচ দেয়; লজ্জা আর কুণ্ঠায় শরীরকে আড়ষ্ট করে তোলে।

মুণ্টার সঙ্কোচ এই মুহূর্তে হোমরার মধ্যে সঞ্চারিত হলো। ধীরে ধীরে হোমরার হাতের বেষ্টনী থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিল মুণ্টা। তারপর ফিস্‌-ফিস্‌ গলায় বলল, "ছাড়্‌ সন্দার, আবার উয়ারা আইস্যা পড়ব।"

কোন কথা বলল না হোমরা। মুণ্টার এই সুন্দর সঙ্কোচটি অনুভব করতে করতে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে তার কথায় সায় দিল।

মুণ্টা বলল, "এই দেশটা কেমন জানি! জবর শরম ধরাইয়া দেয়। হামার বুক ঢাকনের লেইগ্যা হরিণের ছাল দিবি সন্দার।"

"দিমু।"

দু'জনে দু'জনকে দেখলো। কেউ আর কিছু বলল না।

একটু পরেই ধারালো হাতিয়ার দিয়ে সামনের নদীটা থেকে গোটা কয়েক বড় বড় মাছ ফুঁড়ে নিয়ে এলো সঙ্গা আর বয়ছা। তাদের পেছন পেছন বাকী মানুষগুলো হল্লা করতে করতে এলো। হোমরার পায়ের কাছে মাছগুলো নামিয়ে রেখে সকলে শোরগোল করে উঠল, "হো হো হো সন্দার। ইটা জবর খাসা দেশ। হামরা ইখানে থাকুম। আর কুথাও যামু না।"

মাছগুলোর নাম সেদিনকার হোমরারা জানতো না।

পলকে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়ে ফেলল মানুষগুলো। শুকনো ডাল-পালা সংগ্রহ করে আনলো জনকয়েক। তারপর নদীর পারে দাউ দাউ করে অগ্নিকুণ্ড জ্বলে উঠল। আঁশসুদ্ধ মাছগুলোকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিল সঙ্গারা। তারপর প্রচণ্ড শব্দ করে চেঁচাতে লাগলো।

আগুনের কুণ্ডটা ঘিরে নারীপুরুষে সমানে হল্লা করছে। নাচছে। হাসছে। কাঁদছে।

একটুক্ষণের মধ্যেই মাছগুলো অর্ধেক ঝলসে গেল। চক্ষের নিমেষে নাচ থামিয়ে আগুনের কুণ্ডটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষগুলো। তাদের চোখগুলো ক্ষুধার খুশিতে উত্তেজনায় ঝক্‌মক্‌ করছে।

আধপোড়া মাছগুলো কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সাবাড় করে ফেলল হোমরারা।

আকণ্ঠ মাছ গিলেছে। জনকয়েক ঘাসের বিছানায় গড়াগড়ি খেতে লাগলো। যারা প্রচণ্ড উৎসাহী, তারা হাতিয়ার বাগিয়ে নতুন শিকারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

অগ্নিকুণ্ডটার পাশে একটি অর্ধনগ্ন নারীদেহ বসেছিল। তার নাম ভায়লা। পেটের জ্বালা মিটাবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের আর একটা আদিম প্রবৃত্তিতে উন্মাদ হয়ে গেল সে। যারা গড়াগড়ি দিচ্ছিল, তাদের একজনের কাছে এসে হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল ভায়লা।

মরুভূমি কী পাহাড়ের দেশে এতকাল হয়ত শুকনো খেজুর কী খানিকটা উটের মাংস নইলে বুনো ফল জুটেছে। জীবনে এত বেশি খাওয়া আর কোন দিনও হয় নি। ইচ্ছামত পোড়া মাছ খেয়ে এখন দুপুরের এই খরশান রোদে

মানুষগুলো হাঁসফাঁস করছে।

ভায়লা যে পুরুষটির হাত ধরে টানাটানি করছিল, এবার সে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল, “কী মতলব তুর? হাত ছাড়্। ভাগ্—”

অসঙ্কোচে ভায়লা তার দাবির কথা জানালো। এতটুকু জড়তা নেই। বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। গলাটা এতটুকু কাঁপল না, আড়ষ্ট হলো না।

এক ঝট্কায় ভায়লার থাবা থেকে হাত ছাড়িয়ে পাশ ফিরে শুতে শুতে লোকটা ভেংচে উঠল, “হামি পেটের ভারে মরতে আছি। আর শয়তানীটা আসছে ফুর্তির মতলবে। যা, যা ভাগ—”

আদিম মানবীর চোখে আগুন জ্বলে উঠল, “তুই তবে পারবি না সঙ্গা, হামারে খুশি করতে পারবি না?”

“না না, পারুম না।” বিরক্ত গলায় গজ গজ করতে করতে উঠে বসল সঙ্গা, তারপর ভায়লার চুলের গোছা পাকিয়ে ধরে অনেক দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারও পর একান্ত নির্ভাবনায় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ল।

আকণ্ঠ মাছ খাওয়ার পরিশ্রমে কেমন যেন নেশা নেশা লাগছিল সঙ্গার। আপনা থেকেই চোখের পাতা বুজে এলো তার।

আচমকা চিৎকার করে উঠল সঙ্গা। আগুনের কুণ্ডটা থেকে এক টুকরো জ্বলন্ত কাঠ এনে তার পিঠের ওপর আঘাত বসিয়ে দিয়েছে ভায়লা। ভায়লা—আদিম মানবীর চোখ দুটো ধক্ ধক্ করে জ্বলছে।

জ্বলন্ত কাঠের আঘাতে সঙ্গার পিঠ থেকে এক খাবলা মাংস উঠে গেল। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে নদীর জলে লাফিয়ে পড়ল সঙ্গা। আর জ্বলন্ত কাঠের খণ্ডটা নিয়ে একটা শ্বাপদের মত তাকে তাড়া করে এলো ভায়লা। সঙ্গার চিৎকার শুনে হিংস্র গলায় সে হাসতে লাগলো, “হিঃ-হিঃ-হিঃ—”

কোন অদৃশ্য যাদুকরী আকাশের গায়ে রঙের কুহক বুলিয়ে চলেছে। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল। এখন বেলাশেষ। সারাটা দিন ধরে আকাশের গায়ে কেবল রঙ বদলের পালা।

একটা উঁচু টিলার ওপর বসে সামনের নদীটার দিকে দুটো আবিষ্ট চোখ ছড়িয়ে দিয়েছিল মুণ্টা। তার পাশে বসে রয়েছে হোমরা।

মুগ্ধ গলায় হোমরা বলল, “আকাশটা জবর সোন্দর। তাই না?”

মুণ্টা বলল, “হ। শোন্ সন্দাব, একটা কথা হামি ভাবতে আছি। বুঝলি?”

“কী কথা?” আগ্রহে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল হোমরা।

“এই টিলাটার উপুর তুই আর হামি ঘর বান্ধুম (বাঁধবো)। আর কেউ ইখানে থাকব না। বাকী সকলে ঘর বানুবো (বাঁধবো) উই নদীর পারে। কেমন? খাসা হইব না?” দুটো পিঙ্গল চোখ তুলে হোমরার দিকে তাকালো যাযাবরী মুণ্টা।

হোমরা সর্দার মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিল, "হ, খুব খাসা হইব। তুর পছন্দটা জবর সোন্দর।"

একটু পরেই আকস্মিক কোলাহলে চকিত হয়ে উঠল হোমরা আর মুংটা। নদীর কিনার থেকে একটা উন্মাদ তুফানের মত তাদেরই দিকে হো হো করে ছুটে আসছে দলের বাকী মানুষগুলো। কাছে এসে হোমরা আর মুংটার চারপাশে গোলাকার হয়ে বসল সকলে। তারা অনেক ফল নিয়ে এসেছে। লাল, হলুদে, সবুজ, কালো—নানা রঙের অজস্র ফল। সকলে মিলে হাত চালিয়ে হোমরার সামনে ফলগুলি স্তূপাকার করলো। এটা নিয়ম। এর ব্যতিক্রম মানেই নির্মম দণ্ড ডেকে আনা।

দলের মধ্য থেকে একটি লোক উঠে দাঁড়াল। তার নাম বয়ছা। সে বলল, "আরো অনেক ফল আছে সন্দার। হামরা সারা জনম খাইয়্যা শেষ করতে পারুম না। বড় খাসা, বড মিঠা। খাইয়্যা দেখ সন্দার!"

একটা লাল রঙের ফলে কামড বসিয়ে দিল হোমরা। ফলটা পেকে রসভারে টসটস করছে। হোমরার গালের কষ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রস ঝরে পডছে। একটা মিষ্টি গন্ধে সকলের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আমোদিত হলো। নতুন ফল, রসনা ভরে মধুর আস্বাদ নিতে নিতে হোমরা বলল, "গাছে এই ফল আর আছে রে বয়ছা?"

"অনেক আছে সন্দার।"

"ঠিক আছে। কাইল আবার আনবি।" বলেই চোঁ চোঁ করে ফলটা চুষতে লাগলো হোমরা।

এই দেশ, এই নদী, এই মাছ, এই ফল ফসল—একটা বিচিত্র আবিষ্কারের আনন্দে মাতাল হয়ে উঠেছে মানুষগুলো।

একটু পরেই হোমরা সর্দার সকলের মধ্যে ফলগুলি ভাগ-বাটোয়ারা করে দিল। আনন্দে-আহ্লাদে হল্লা করতে করতে খেতে শুরু করল মানুষগুলি। ভায়লার জ্বলন্ত কাঠের আঘাতে পিঠ থেকে এক খাবলা মাংস উঠে গিয়েছিল, সে-সব অগ্রাহ্য করে সঙ্গাও এখন শোরগোল বাধিয়েছে।

নদীর ওপারে ঘন বনের আড়ালে বেলাশেষের সূর্যটা একসময় মিলিয়ে গেল। প্রাক্-সন্ধ্যার আবছায়া নামল।

চুপচাপ বসে মানুষগুলো সেদিকে তাকিয়ে ছিল। নদীটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। তার ওপর দিয়ে রাশি রাশি পাখির ঝাঁক উড়ে আসছে। অনেক, অজস্র। নানা রঙের, নানা আকৃতির। পাখায় পাখায় তাদের অবসাদ। তবু সারাদিন পর নীড়ে ফেরার ব্যগ্রতায় আরো, আরো জোরে ডানা নাড়ছে তারা।

সামনের গাছগুলি লাল মঞ্জরীতে ছেয়ে গিয়েছে। সেই গাছের ডালপালায় কয়েকটি পাখি এসে বসল। ছোট বাসা থেকে বেরিয়ে কিচির মিচির করতে করতে বাচ্চাগুলো বেরিয়ে এলো। তারপর পক্ষিণী-মার কাছে সারাদিনের সোহাগ জানালো। ঠোঁটে, পালকে, পায়ে ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে

তাদের আদর করলো পাখি-মা।

চারপাশের বনভূমি পাখির অবিচ্ছিন্ন কূজনে চকিত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ পরে নতুন মানুষগুলিকে সন্দিগ্ধ চোখে দেখতে দেখতে নীড়ে গিয়ে ঢুকলো পাখিরা। সঙ্গে সঙ্গে তাদের কলতান থেমে গেল।

অকারণ আনন্দে গান শুরু করল মানুষগুলি :

'হো-হো হিতাং ঘিতাং,
হো-হো ধিতাং ধিতাং
হো-হো সন্দার,
হো-হো ভত্তা, ভত্তা—
হো-হো খামু হামি।
হো-হো খাবে ভামি।'

একসময় রাত্রি গহন হলো, গভীর হলো, নিবিড় হলো। আকাশে চাঁদ দেখা দিল। তার মায়া ছড়িয়ে পড়ল নীচের পৃথিবীতে। সামনের নদীটাকে বড় অবাস্তব মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে একটা অপরূপ স্বপ্নের মত।

এই মুহূর্তে মানুষগুলি ভুলে গেল, কত দূরে, সেই ইতস্তত বিক্ষিপ্ত খেজুর গাছের নীচে আচক্রবাল মরুভূমি ছড়িয়ে রয়েছে। ভুলে গেল, কত ফারাকে সেই পাহাড়ী উপত্যকা কী নিবিড় অরণ্য রয়েছে। এমন সব রাত্রিতে দল বেঁধে বুনো ঘোড়া, উট কী অন্য কোন জানোয়ার শিকারে তারা বেরুত। মাংস না আনলে উদর পূর্তি হবে কী দিয়ে? ক্ষুধা—জীবনের প্রথম জৈবিক দাবিটা ছাড়া তাদের চোখের সামনে সে সব দিনে আর কিছুই ছিল না।

কিন্তু এই মুহূর্তে ক্ষুধার বাইরে, হিংসা হিংস্রতার বাইরে জীবনের অন্য একটা বোধ আছে বলেই মনে হলো তাদের। তারা অনুভব করলো, এই দেশের মায়ায়, এই দেশের কুহকে আর রূপে একটু একটু করে তাদের জন্মান্তর হচ্ছে। এমন একটা আশ্চর্য দিন, এমন একটা আশ্চর্য রাত তাদের জীবনে এর আগে কোনদিনই আসে নি।

মুণ্টা আরো একটু ঘন হয়ে বসল হোমরার পাশে। ভায়লা নিবিড় হয়ে এসেছে সঙ্গার কাছে। ফিস ফিস গলায়, দুর্বোধ্য ভাষায় হয়ত বলছে, "তখন পোড়া কাঠ দিয়া পিটাইছিলাম বইল্যা কী গোসা হইছিল?"

নারী-পুরুষেরা পাশাপাশি বসেছে। মাঝখানে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। সেই কুণ্ড থেকে আগুনের আভা তাদের মুখের ওপর পিছলে পিছলে যাচ্ছে।

খানিকটা পর ঘাসভরা বিছানায় পৃথিবীর আদিম বাসর রচিত হলো। পাশাপাশি সকলে শুয়ে পড়েছে।

কিন্তু আজ আর সেই মরু-পাহাড়ের দেশের মত উন্দামতা নয়, নয় উলঙ্গ ব্যভিচার। আকণ্ঠ পোড়া মাছ খেয়ে, নতুন দেশের প্রেমে শরমে সংকোচে একাকার হয়ে যাযাবর মানুষগুলো প্রেমিক হয়ে উঠেছে।

সকাল হয়েছে। নদীর পারের ঘাসবন থেকে অর্ধনগ্ন মানুষগুলি উঠে বসেছে। একটি নিখুঁত, নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের মধ্য দিয়ে রাত্রিটা কাবার হয়ে গিয়েছে।

হোমরা সেই উঁচু টিলাটার ওপর জাঁকিয়ে বসে রয়েছে। তার পাশে মুণ্টা। মানুষগুলো চারপাশে গোলাকার হয়ে বসলো।

কাল রাত্রি থেকে মেজাজটা খুব খুশি হয়ে রয়েছে হোমরার। বুকের কাছে নিবিড় হয়ে শুয়ে মুণ্টা তাকে সুন্দর একটি খবর দিয়েছিল। সেই থেকে আনন্দে উল্লাসে সকল চৈতন্য ভরপুর হয়ে গিয়েছে। মুণ্টার গর্ভে সন্তান এসেছে। হোমরার সন্তান। হোমরার পৌরুষ মুণ্টার গর্ভে একটি প্রাণের ভ্রূণের মধ্যে স্বীকৃত হয়েছে।

উচ্ছল গলায় হোমরা বলল, “তুরা শোন, হামাগো মুণ্টার ছোয়া হইব। অখন হামরা আর কুথাও যামু না। ইখানেই থাকুম। সেই যে পশ্চিম দেশে ডালপালা দিয়া ঘর বানাইতে দেখছিলাম, তুরাও সেই রকম ঘর বান্‌তে (বাঁধতে) শুরু কর।”

“মুণ্টার ছোয়া হইব, ছোয়া হইব।”

চারপাশ থেকে মানুষগুলি শোরগোল করে উঠল। পৃথিবীর মাটিতে নতুন জন্ম আসছে, এ উৎসব তো মানুষের জীবনে আদিম।

একটু পরেই দু'দলে ভাগ হয়ে গেল মানুষগুলো। একদল দূরের বনের দিকে চলে গেল। আর একদল ধারালো হাতিয়ার নিয়ে সামনের নদীটার দিকে গেল। মাছ মারার নেশায় পেয়েছে তাদের।

একজন প্রচণ্ড উৎসাহী, তার নাম ওখুল্লা, অতিকায় একটা মাছের সন্ধানে নদীতে নেমে পড়েছে। মেঘের মত রঙ মাছটার, সারা গায়ে চোখা চোখা কাঁটা। লোকটার মতলব ছিল, একাই মাছটাকে মেরে দলপতিকে ইনাম দেবে। কিন্তু ওটা যে আদৌ মাছ নয়, এই নদীর দেশ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ মানুষটি তা জানতো না।

একটা প্রবল ঝটকায় ওখুল্লাকে দলা পাকিয়ে মাঝ নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই আজব প্রাণীটা। আরও কয়েকজন কোমর সমান জলে নেমেছিল। প্রাণের প্রাথমিক তাগাদায় তারা লাফিয়ে উঠে দাড়াল। তারপর সকলে মিলে হল্লা করে উঠল।

মাঝ নদী থেকে ওখুল্লার বিকট চিৎকার সমস্ত পরিবেশটাকে বিষণ্ণ করে তুলল। এক সময় নদীর অতল তলায় তলিয়ে গেল ওখুল্লা। আর নতুন মানুষগুলির মধ্য থেকে একজন কমলো।

কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত। এক সময় পারের মানুষগুলির বিচলিত ভাবটা কাটলো। ধারালো অস্ত্র নিয়ে আবার মাছের তল্লাস করতে লাগলো তারা। অমন কত মানুষ তাদের দল থেকে সাবাড় হয়েছে। পাহাড়ে জঙ্গলে সেই বিরাট ডোরাকাটা জানোয়ারগুলো নিমেষে তাদের কতজনকে চোখের সামনে থেকে কামড় দিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তারপর তাদের পাত্তা আর মেলে নি। কতবার

যে এমন ঘটনা ঘটেছে তার হিসাব নেই। লেখাজোখা নেই। তবে মেঘরঙের ঐ প্রাণীটাকে মানুষগুলো ভুলল না। ভবিষ্যতে মোলাকাতের বাসনা রইল।

একটু পরেই নিবিড় জঙ্গলের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল মানুষগুলি। অনেক, অনেকদিন পর প্রথম বিশ্রামের দিন এসেছে। শেষ হয়েছে অনিশ্চিত জীবনের। জন্মাবধি অবিরাম পথচলার পালা চুকেছে। উল্লাসে সকলে হল্লা করছে। আর হাতিয়ারের আঘাতে বন লুটিয়ে পড়ছে।

এক সময় গাছের ডালপালা কেটে টানতে টানতে নদীর পারে এনে স্তূপাকার করলো বয়ছারা। ঘর বাঁধার সরঞ্জাম জোগাড় করতে করতে সকলে শ্রান্ত হয়ে পডেছে।

দুপুরের বোদ ঝকমক করছে। সামনেব নদীটা খরস্রোতে বইছে। আকাশে চক্র দিচ্ছে নানারঙের পাখি।

কালকের মত আজও আধপোড়া মাছ আর ফল দিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পালা চুকলো। শোরগোল করে, অসংলগ্ন পায়ে আগুনের কুণ্ডটার চারপাশে নেচে মানুষগুলো আনন্দ করলো।

তারপরেই শুরু হলো ঘর বাঁধার কাজ। যাযাবর মানুষের প্রথম জনপদ একটু একটু করে জন্ম নিতে লাগলো নদীর পারে।

তামাটে খসখসে দেহ। সেই দেহ বেয়ে ঘাম ছুটেছে মানুষগুলির।

পাহাড় মরু আর সমতলের দেশ পাড়ি দিয়ে এখানে আসতে আসতে কোথায় যেন হোমরারা দেখেছিল! কোথায় দেখেছিল, তা আজ আর মনে নেই। নাম-না-জানা দেশটায় মানুষেরা ছোট ছোট ঘর তুলেছে। লতাপাতার ছাদ দিয়েছে, গাছের ডাল খণ্ড খণ্ড কেটে কেটে দেওয়াল বানিয়েছে। সেদিন গ্রাহ্যও করে নি হোমরারা। কিন্তু তারা কী ভাবতে পেরেছিল, এই অপরূপ দেশটায় এসে তাদেরও পথ চলা শেষ হবে! অনিশ্চিত জীবন-যাত্রা ঝেড়ে ফেলে একদিন তাদেরও ঘরে আশ্রয় নিতে হবে।

মাপজোখের হিসাব নেই। অনভিজ্ঞ মানুষগুলি এক এক জায়গায় চারটে করে গাছের ডাল পুঁতেছে, ওপরে পাতার ছাদ দিয়েছে। মোটা মোটা লতার বাঁধন দিয়ে দেওয়াল বানিয়েছে।

সকলেই কাজ করছে। এমনকি দলপতি হোমরা আর মুণ্টাও বাদ যায় নি। নতুন দেশের মাটিতে, জীবনের প্রথম জনপদে চারটি দেওয়াল আর একটি চাল দিয়ে ঘিরে যে আদিম গৃহকোণ রচিত হলো, তার মধ্যে জন্ম নেবে মুণ্টার সন্তান! যাযাবরীর গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হবে প্রথম গৃহীমানুষ। বিচিত্র এক আনন্দে চমকে চমকে উঠছে মুণ্টা। অতীত জীবনে এই আনন্দের অভিজ্ঞতা নেই তার।

শ্রান্তিতে খুশিতে মানুষগুলো মশগুল হয়ে ছিল। হল্লা করছিল। হাসছিল। সেই সঙ্গে লতার বাঁধন দিচ্ছিল কেউ, কেউ চাল ছাইছিল। কেউ ডালপালা খণ্ড খণ্ড করছিল।

এক সময় সুন্দর একটি বিকেল হলো।

কয়েকটি ঘর পুরোপুরি বানানো হয়েছে। বাকীগুলোর আধাআধি কাজ বাকী পড়ে রয়েছে। মানুষগুলো ঘাসবনের ওপর বসে পড়ল। তারপর অপটু অনভিজ্ঞ হাতে গড়া অর্ধ সমাপ্ত জনপদটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেল।

বেলাশেষের রঙ সোনালী হয়েছে। রাশি রাশি পাখি উড়ে চলেছে নদীর ওপর দিয়ে। তীরতরুর পাতায় পাতায় দিনান্তের রোদ ঝলমল করছে।

ঠিক এমনি সময় ঘটে গেল ঘটনাটা।

বড় বড় গাছের দেহে ফোকর করে ডোঙা বানানো হয়েছে। এমনি একটা ডোঙা এসে ভিড়ল নদীর কিনারে। ডোঙা থেকে দুটো মানুষ উঠে এলো। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া জটপাকানো চুল, মুখময় দাড়ি গোঁফ। কোমর থেকে পাতালতা দিয়ে বোনা ঘাগরা ঝুলছে। দেহের কালো রঙে রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে কেমন একটা রুক্ষতার ছাপ পড়েছে।

মানুষ দুটো পারের মাটিতে উঠেই থমকে দাঁড়ালো। তাদের দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে গিয়েছে। চোখের পাতা একেবারেই নড়ছে না। আশ্চর্য। কোন মুল্লুক থেকে তাদের দেশে এই সব আগন্তুক এলো। দেখতে দেখতে দৃষ্টিটা তীক্ষ্ণ হলো। আর সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে চারদিক ঘুরপাক খাওয়াতে খাওয়াতে একেবারে চমকে উঠলো তারা। শুধু নতুন মানুষই আসে নি। ঘরবাড়ি বানিয়ে একেবারে স্থায়ী বন্দোবস্ত করে ফেলেছে এর মধ্যে।

মানুষ দুটি জনপদের দিকে তাকালো। তারপর লাল লাল দাঁত বের করে দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলল। তাদের মুখের ওপর ক্রুদ্ধ উত্তেজনা ফুঁসতে লাগলো। নিরোম ভ্রূর নিচে কুটিল ক্রূর চোখ জ্বলে উঠলো।

ইতিমধ্যে হোমরারা মানুষ দুটিকে দেখে ফেলেছে। একটি নিস্তব্ধ মুহূর্ত পার হলো। তারপরেই ঘাসবন থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল হোমরারা। তাদের রক্তে রক্তে কী এক আদিম প্রেরণা জ্বলে জ্বলে উঠছে। হাতের থাবায় ধারালো হাতিয়ার। তার ফলায় ফলায় মৃত্যুর শপথ জ্বলছে। আদিম প্রাণের বিজ্ঞানে হত্যার চেয়ে অমোঘ সত্য আর নেই।

নিমেষে প্রচণ্ড চিৎকার শুরু হয়ে গেল, 'হো-ও-ও-ও-ও'—সে চিৎকারে সামনের সুন্দর নদী, ঘন বন আর বেলাশেষের আকাশ শিউরে উঠল। হোমরারা নদীর পারে সেই মানুষ দুটির দিকে ছুটে চলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে ডোঙাটার ওপর উঠে বসলো মানুষ দুটো। তারপর একটা দ্রুতগামী মাছের মত জল কেটে কেটে মাঝ নদীতে এগিয়ে চলল ডোঙাটা।

মনের আক্রোশে পারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সমানে চেঁচাতে লাগলো হোমরারা। এই নদীতে সাংঘাতিক একটা জানোয়ার আছে। সারা গায়ে চোখ চোখা কাঁটা। ওখুল্লাকে ঝাপটা মেরে নিয়ে গিয়েছে সকাল বেলায়। তার মহিমা সম্বন্ধে সকলেই সচেতন। তাই আর কেউ জলেই নামলো না।

নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ডোঙাটাকে স্থির করে রাখলো মানুষ দু'টি। তার পর ক্রুর দৃষ্টিতে পারের আগন্তুকদের দেখতে লাগলো। ভায়লা, মুণ্টা, সঙ্গাদের পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। তাদের তামাভ দেহের সরস যৌবন দৃষ্টিকে কেমন লোলুপ করে তোলে। সুগঠিত বুক, বাঘ কী হরিণের ছালের নীচে সুডোল নিতম্ব, কুতকুতে পিঙ্গল চোখ—সব মিলিয়ে নতুন দলটার নারীদেহের সম্পদ আছে। লোভে লালসায় আর অদ্ভুত এক জ্বালায় মাঝ নদীতে দু'জোড়া চোখ জ্বলতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পর নদীর ওপারে অদৃশ্য হয়ে গেল ডোঙাটা।

বেলাশেষের রঙ নিভে গেল।

ইতিমধ্যে নদীর কিনার থেকে মানুষগুলো আবার এসে হোমরার চারপাশে ঘন হয়ে বসেছে। তাদের ধারণা ছিল, এই অপরূপ দেশে কোন মানুষই নেই। এ দেশের মাটি তাদের স্পর্শই প্রথম পেল। কিন্তু ধারণাটি কত ভ্রান্ত! কত মিথ্যে! একটা বিচিত্র উত্তেজনা সকলের চোখে-মুখে আর অঙ্গ-ভঙ্গিতে থমথম করছে।

শঙ্কিত গলায় হোমরা বলল, "তুরা শোন; হামার মনে হয়, উয়ারা আবার আসবো। খুব সাবধান।"

"হ হ।" মাথা নেড়ে সকলে সমস্বরে সায় দিল।

"একটা কাম করলে কেমুন হয়?" সামনের দিকে তাকালো দলপতি হোমরা।

"কী কাম সর্দার?"

"উই শয়তানগো আস্তানাটা খুইজ্যা (খুঁজে) বাইর করতে হইব। তুরা কী কইস?"

সঙ্গা বলল, "তা হইলে তো উয়াগো মত ডোঙা বানাইতে হইব। তা না হইলে নদী পার হমু কেমনে?"

বুকের ওপর প্রচণ্ড এক চাপড় মেরে গর্জে উঠলো হোমরা সর্দার, "ত বানাবি রে ইবলিশের বাচ্চা। কাইল থিকা সকলে ডোঙা বানাইতে শুরু কর।"

"হো-হো-হো—" চারপাশ থেকে মানুষগুলো ভয়াল গলায় চিৎকার করে উঠল।

একটা আসন্ন দুর্যোগের আভাসে স্নায়ুগুলো প্রখর হয়ে উঠেছে সকলের। অবশ্য এই দুনিয়ার কোন দুর্যোগ কী কোন করাল ভ্রূকুটিকেই পরোয়া করে না এই মানুষগুলি। বেপরোয়া, ভয়ঙ্কর আর দুর্দান্ত প্রাণী এরা। মৃত্যু এদের শায়েস্তা করতে পারে না। এদের পায়ের নীচে অনেক বিক্ষুব্ধ মরু, অনেক উদ্ধত পাহাড়ের চূড়া মাথা নামিয়ে পথ করে দিয়েছে।

হোমরা আবারও বলল, "আইজ রাইতে হামরা সজাগ থাকুম। উয়ারা যদি আবার আসে! খুব সাবধান শয়তানের বাচ্চারা।"

সন্ধ্যা গেল, রাত্রি নামলো। আকাশে গোলাকার একখানা চাঁদ দেখা দিল।

জ্যোৎস্নার আলোতে তীরতট আর সামনের নদী আশ্চর্য মায়াবতী হয়ে উঠল।

এপাশে এক সারি বুনো গাছ। ডালে দড়ি দিয়ে উট আর ঘোড়াগুলিকে বেঁধে রাখা হয়েছে। মাঝখানে আগুনের কুণ্ডলী জ্বলছে। লকলকে আগুনের শিখা উঠছে আকাশের দিকে।

বয়ছা, সঙ্গা, এমনি আরো কয়েকজন হাতিয়ার বাগিয়ে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। বাদবাকী সকলে এমনি নিবিড় ঘুমে ঢলে পড়েছে। একটানা ঢাকের বাজনায় নিস্তব্ধ রাত্রি চকিত হয়ে উঠল।

এক সময় চাঁদ ডুবলো। শেষ রাত্রির আবছায়ায় চার কিনার অস্পষ্ট হয়ে গেল। সারা রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়ে সঙ্গাদের ঘোর ঘোর ঢুলুনি লেগেছে। চোখের পাতা ঘুমের ভারে জড়িয়ে জড়িয়ে আসতে শুরু করেছে।

আর এমনি সময় তীক্ষ্ম আর্তনাদ করে উঠে বসল হোমরা। তার আর্তনাদে শেষ রাত্রির আবছায়া যেন ফালা ফালা হয়ে গেল। সকলের ঘুম ছিঁড়ে গেল। ঘাসবনের বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে বসলো মানুষগুলি।

সন্ত্রস্ত গলায় সকলে বলল, "কী হইছে সন্দার ?"

হোমরা কোন জবাব দিল না। প্রায় নিভে আসা কুণ্ড থেকে আগুনের রক্তিম আভা এসে পড়েছে তার মুখের ওপর। চোখ দুটো অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠেছে। মনে হয়, বিস্ফারিত চোখের মণি চৌচির করে এখনই রক্তের ফোয়ারা ছুটবে। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল এলোমেলো। কোমরের বাঘছালের বাঁধন খুলে গিয়েছে। ভয়ংকর দেখাচ্ছে হোমরাকে। বিড় বিড় করে সমানে কী যেন বকে চলেছে সে।

এতক্ষণে মুণ্টাও উঠে বসেছে। ভীরু গলায় সে বলল. "কী হইল তুর ? কী রে সন্দার ?"

এবারও কোন উত্তর দিল না হোমরা। চার দিকে একবার অস্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে নদীর পারে গিয়ে বসলো সে। তারপর অসংলগ্ন গলায় বিড় বিড় র বকতে লাগলো।

মাঝ রাত্রিতে বিচিত্র এক স্বপ্ন দেখেছে হোমরা। বিশাল সাপের ফণায় বসে রয়েছেন এক ভীষণা দেবীমূর্তি। তাঁর সারা শরীরে সাপের অলংকার। হোমরাকে এক ভয়াল নির্দেশ দিয়েছেন দেবী। এই ঘরের মায়া, এই জনপদের মোহ পরিত্যাগ করে দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে তাঁর মহিমা প্রচার করতে হবে। এই দুনিয়ার প্রতিটি রক্তমাংসের প্রাণে প্রাণে তাঁর 'আটন' বানিয়ে দিতে হবে।

প্রথমে প্রতিবাদ করেছিল হোমরা। ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে উঠেছিল. "হামি পারুম না, হামি পারুম না। সারা জনম ইখানে-উখানে ঘুইর‍্যা বেড়াইতে আছি। আর পারি না। আর পারুম না। কিছুতেই না।"

কালনাগিনীর মণিপদ্মে অধিষ্ঠিতা সেই দেবীমূর্তি। এবার তাঁর কণ্ঠ থেকে অনুনয় ঝরে পড়েছিল, "তোকে পারতে হবে হোমরা। তোকে আমি বর দেব। সব পাবি তুই। কিছু অভাব থাকবে না তোর।"

"না, না, হামি পারুম না।"

কোথায়, কোন ঊষর মরুপথে, পাহাড়ের চড়াই-উতরাইতে ঘুরে বেড়িয়েছে যাযাবর। এতকাল ঘরের ঠিকানা ছিল না। আজ অনিশ্চিত পথ-চলা শেষ হয়েছে। এই অপরূপ দেশ, এই মোহিনী নদী, দূরের মায়াবতী বনানী রন্ধ্রে রন্ধ্রে গৃহী জীবনের এক সুন্দর সাধের বীজাণু ছড়িয়ে দিয়েছে। এখান থেকে চলে যাবার আর সাধ্য নেই।

দেবীর কণ্ঠে রোষ ফুঁসে উঠেছিল, "সাবধান হোমরা, আমার কথা অমান্য করলে তোরা ধ্বংস হয়ে যাবি। পৃথিবীর সব পাপ, সব বিষই আমার অনুগত, আমার অনুচর। আমাকে অগ্রাহ্য করলে তোদের কারুকে জীবন্ত রাখবো না। এখনও সাবধান—"

অহিভূষণা দেবী হোমরার কাছাকাছি আরো অনেকটা এগিয়ে এসেছেন। তাঁর সারা দেহে রাশি রাশি সাপের ফণা ক্রুদ্ধ গর্জন করে চলেছে। এই পৃথিবীকে বিষে বিষে নীল করে দেবার নির্দেশ এসেছে কী?

আচমকা খুয়াবটা ছিঁড়ে গিয়েছিল। ভয়ে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠে বসেছিল হোমরা। দ্রুত তালে নিঃশ্বাস উঠছে, নামছে।

আর একটা দিন পার হলো।

পরের রাত্রেও সেই একই স্বপ্ন দেখলো হোমরা। তেমনি চিৎকার করতে করতে ঘুম থেকে উঠে বসলো। তারপর সারা দিন কারো সঙ্গে একটি কথাও বলল না। শুধু রক্তাক্ত চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঠিক তেমনি ভঙ্গীতেই বিড় বিড় করে বকতে লাগলো।

অন্যান্য সহচরেরা ভীরু পায়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ালো। ফিস্ ফিস্ গলায় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলল। দলপতির এমন দুর্লক্ষণ দেখা দিলে তাদের কী গতি হবে? একটা অশুভ আশংকায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল মানুষগু

এ দেশের রূপ দেখে মজেছিল তারা। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এ দে কুহকিনী, এ দেশ সাংঘাতিক এক ডাইনী। নানা কুহক ছড়িয়ে এ দেশ তাদে বশীভূত করে ফেলেছে। এ দেশ থেকে রেহাই পাবার কোন উপায়ই ত নেই।

তার পরের দিনও মনের সঙ্গে সমানে যুদ্ধ চললো হোমরার। আবার স্বপ্নে দেখা দিলেন দেবী। প্রথমে অনুনয়, পরে ক্ষোভ, ক্রোধ—কোন কিছু দিয়েই হোমরাকে জয় করা সম্ভব হলো না। অবশেষে দেবীর কণ্ঠ কুপিত হলো। দৃষ্টি থেকে আগুন ঠিকরে বেরুতে লাগলো। সারা দেহে বিষবতী নাগিনীর ফণারা গর্জে উঠলো। দেবী বললেন, "আমার মাহাত্ম্য প্রচার করতেই হবে হোমরা। আমার কথা তুই শুনলি না। সারা জীবন তোকে কষ্ট পেতে হবে।"

তৃতীয় রাত্রির স্বপ্ন থেকে দেবী অদৃশ্য হলেন।

এই তিন দিনে মনের মধ্য থেকে অনেকটা শক্তি সঞ্চয় করেছে হোমরা। একটা স্থির সিদ্ধান্তের বিন্দুতে পৌঁছেছে সে। স্থির কণ্ঠে সে দেবীকে প্রত্যাখ্যান করল। এই দেশের মাটিতে, এই দেশের প্রথম জনপদে তার আর

মুণ্টার সন্তান জন্ম নেবে। এখান থেকে কোথায়ও যাবে না তারা। আর তারা ঘুরে বেড়াবে না।

খুশি খুশি মনে পরের দিন সকালে উঠে বসলো হোমরা। মন থেকে, চেতনা থেকে রাত্রির স্বপ্নকে নিঃশেষে মুছে দিয়েছে সে। কিন্তু উঠেই একটা ভয়ংকর সত্যের মুখোমুখি হলো হোমরা। মুণ্টা নেই।

সকলে মিলে নদীর কিনার, ঝোপ-ঝাড়, ঘন বন, প্রতিটি অন্ধিসন্ধি তোলপাড় করে ফেলল। কিন্তু কোথাও নেই মুণ্টা। কোথায়ও তাকে পাওয়া গেল না। শুধু বাতাসে বাতাসে, নদীর ঢেউ-এ ঢেউ-এ, জলে-স্থলে, আকাশে অন্তরীক্ষে একটা প্রাণফাটা হাহাকার বেজে চলেছে। এ হাহাকারের সমাপ্তি নেই।

মুণ্টা নেই। কোথায়ও নেই।

'পানুহা ঘরে'র মধ্যে বসে এক বিচিত্র উত্তেজনায়, অদ্ভুত এক শিহরনের মধ্যে শঙ্খিনী চমকে উঠেছিল। রুদ্ধ গলায় সে বলল, "তারপর কী হইল ?"

আসমানী হাসলো, "তার পরের কথা আর একদিন শুনিস। আইজ সন্ধ্যা পার হইয়া গেছে।"

নিষ্পলক চোখে আসমানীর দিকে তাকালো শঙ্খিনী। তার মুখ দেখে মনে হয়, পরের কাহিনী শোনার জন্য সে উন্মুখ হয়ে থাকবে। ব্যগ্র হয়ে থাকবে।

আকাশে মেঘের ঘনঘটা। চারপাশে বর্ষার রাত্রি নামছে। অন্ধকার নিবিড় [illegible]।

পালের পাখায় সোঁ-সোঁ বাতাস গর্জে চলেছে। একটানা। যতিহীন। সে [illegible]নর শেষ নেই। বিরাম নেই।

জল [illegible]টে এগিয়ে চলেছে বেবাজিয়া বহর। সামনেই মেঘনার সীমানা দিয়ে [illegible] সূচনা। পদ্মা! কি শুভ্র তার বিস্তার! কী ব্যাকুল তার